Y 993
1.10.

কারদীয়া

শিক্ষক

৬১ | সম্পাদক - শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী | তৃতীয় সংখ্যা

বুধারেশ
ও. আর. সি. এল. লিঃ

শারদীয়া সংখ্যা
মূল্য—১৲

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীসমীর রায় চৌধুরী, **শিক্ষক প্রেস**, ৬১, বালিগঞ্জ প্লেস
কার্য্যালয়—৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা ১৯, ফোন : পি, কে ১৮৭৪

সুরুচিসম্পন্না
মেয়েরাই
জানেন
কেশপ্রসাধনে
ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল
অপরিহার্য্য
ইমকল্যাণ ওয়ার্কস লিঃ কলিকাতা-৪

ডাক্তারদেরও পছন্দ

পিউরিটি বার্লি

কারণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সেরা শস্য থেকে
এই বার্লি তৈরি তো হয়ই, তা ছাড়া,
এর পেছনে আছে ১৫১ বছরব্যাপী
পেষাই-এর অভিজ্ঞতা।

অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিমিটেড পোস্ট বক্স ৬৬৪, কলিকাতা - ১

AH

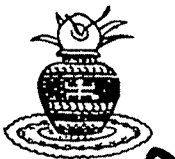

পূজা মাঙ্গলিক

সব চাইতে আজকের দিনে সকলের অন্তর ছাপিয়ে উঠছে কাউকে কিছু দেওয়ার আনন্দ। সকল দেওয়ার শ্রেষ্ঠ দেওয়া,—শত্রুকে ক্ষমা, প্রতিপক্ষকে সহিষ্ণুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি, সন্তানকে সৎদৃষ্টান্ত, পিতাকে শ্রদ্ধা, মাতাকে সন্তানের চরিত্র-গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা,—আর প্রিয়পরিজনকে পূজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার হিন্দুস্থানের বীমাপত্র।

দানের আনন্দ একান্ত ভাবেই আপনার, আর আপনাকে সেবা করবার আনন্দ আমাদের।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড।

৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩

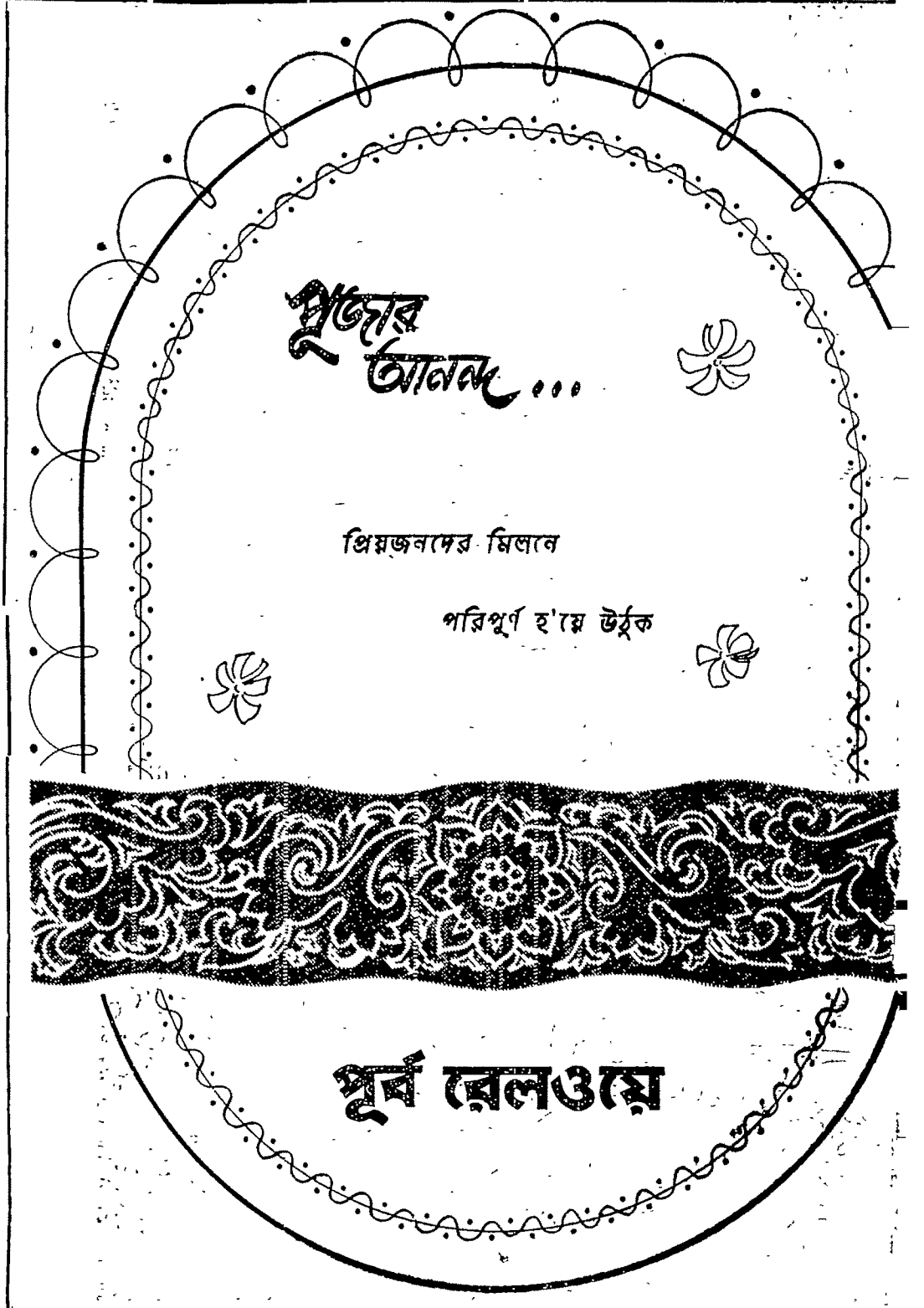
পূজোর আনন্দ...
প্রিয়জনদের মিলনে
পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠুক
পূর্ব রেলওয়ে

"কৃষ্ণা"

ঝর্ণা কলমে লিখিবার উৎকৃষ্টতম কালি

কারণ :—

(১) ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইন্‌ষ্টিটিউটের (ভারতীয় মান নির্দ্ধারক প্রতিষ্ঠানের)
Specification No. IS : 220—1950
পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক বহু ব্যবহৃত।

(৩) যে কোনও শ্রেষ্ঠ বিলাতী কালির সমকক্ষ।

(৪) ভারতীয় শ্রমে ও মূলধনে তৈয়ারী।

(৫) শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ছাত্র, ছাত্রীর অপরিহার্য্য সঙ্গী।

১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত—

দি বেঙ্গল মিসলেনী লিমিটেড

কর্ত্তৃক

১৭৪ নং মাণিকতলা মেন রোডের কারখানায় প্রস্তুত,
কলিকাতা-১১

ক্লাসিক প্রেস

(স্থাপয়িতা—৺অবিনাশচন্দ্র সরকার)

কলিকাতার অন্যতম প্রাচীন
প্রতিষ্ঠাশালী নির্ভরযোগ্য
ছাপাখানা

এখানে সকল রকম ইংরাজী ও বাংলা বই, ম্যাগাজিন, ক্যালেণ্ডার, জব ওয়ার্কস ও ছবি প্রভৃতি সুন্দর এবং নিখুঁতভাবে সুলভমূল্যে ছাপা হয়।

২১, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র—আশ্বিন, (শারদীয়া সংখ্যা) ১৩৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু—	৯৯
দুর্গতিনাশিনী (পদ্য)—শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	১০০
এস মা (পদ্য)—নীলরতন দাশ	১০০
শারদীয়া দুর্গোৎসব— শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১০১
শিক্ষা ব্যবস্থা ও জীবন সম্পর্ক— শ্রীমণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	১০৩
প্রথম পাঠ—কণা সেনগুপ্ত	১১০
শিক্ষা ও সমাজ সমস্যা—শান্তি —বার্টাণ্ড রাসেল	১১৩
বংশগতি ও পরিবেশ—অধ্যাপক শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ	১১৯
বোধনের বাঁশী (পদ্য)— শ্রীআদিত্য নাথ সাহিত্যশাস্ত্রী	১২২
জনহিতে আণবিক শক্তির ব্যবহার—	১২৩
হরিবাগের মুক্তি—শ্রীজনরঞ্জন রায়	১২৯
মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষার স্থান— শ্রীকে, এম মুন্সী, অনুবাদ—শ্রীঅনীতা বসু	১৩১
ফাঁকি (গল্প)—শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৬
পরিদর্শক ও শিক্ষক—শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৪০
অন্তরাল (গল্প)—শ্রীমিনতি নাথ	১৪৪
মানব সভ্যতায় উদ্ভিদবীজের প্রসার— অধ্যাপক শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন	১৪৮
খনি (গল্প)—শ্রীগাণ্ডীব	১৫১
কবিতার প্রতি বিতৃষ্ণা— কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	১৫৫
মৌরসী মকরারী স্বত্ব (গল্প)—শ্রীঅনীতা বসু	১৫৮
কবিতা	
শিক্ষকের চিন্তা—শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক	১৬২
শিলায়ন—শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর	১৬৩
সোমনাথ—শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়	১৬৪
প্রশ্ন—শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৫
শিক্ষক—শ্রীঅনিল কুমার রায়	১৬৫
বিজয়া—শ্রীবিশ্বমঙ্গল দাশশর্ম্মা	১৬৬
আকাংখা—শ্রীরণজিৎ কুমার রায় চৌধুরী	১৬৬
কোথা তুমি তথা গত—শ্রীশশাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী	১৬৭
হে মহাকাল—শ্রীজ্যোতি কুমার	১৬৮
আকাশ-সাধনা—শ্রীমুরারী মোহন বিশ্বাস	১৬৯
পঃবঙ্গে কারিগরী শিক্ষালাভের সুযোগ ও সুবিধা	১৭০
বিস্তম্ভক (গল্প)—শ্রীশচীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—	১৭৫
শোক-শান্তি (পদ্য)—শ্রীনারাশ পাত্র	১৮২

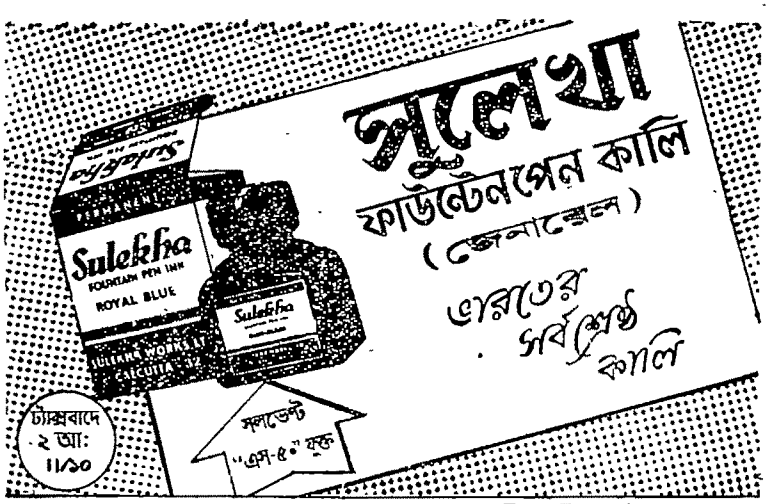

সুলেখা ও আর্কস লিমিটেড

কলিকাতা : দিল্লী : বোম্বাই : মাদ্রাজ

উৎসবের দিনে

ফিলিপস্ এর রেডিও

আপনার ঘর আনন্দ মুখরিত করে তুলবে

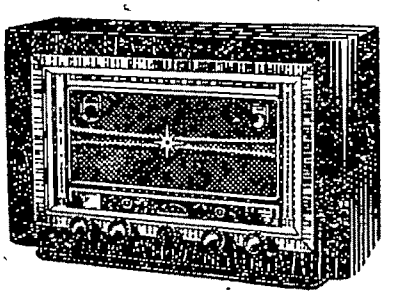

বি এল্ ৭৩৫ এ, এসি ১০ ভালব্, ৬ ওয়েব-রেঞ্জ ব্যাপক ব্যাণ্ড্ স্প্রেড্ ৮৯৫৲ টাকা

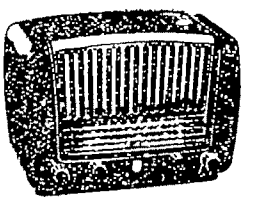

বিসি এ ৪১৬ এ/ইউ-এসি কিংবা এসি/ডিসি ৩৬৫৲ টাকা

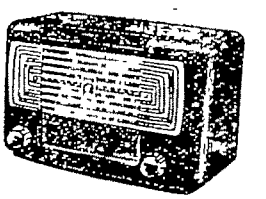

বিসি এ ৩২৬ বি, ড্রাই ব্যাটারী ২৬৫৲ টাকা

মেম্বারস্ অব দি রেডিও ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া

PSPH 80

লক্ষ্মী ঘি

বিশুদ্ধ দুগ্ধজাতদ্রব্য
পবিত্র ও পুষ্টিকর

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৬, মহাত্মাজীর স্ট্রীট • কলিকাতা
ফোনঃ ব্যাঙ্ক ৭২৪৩

আমরা দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি ও পূজার সাদর সম্ভাষণ জানাই

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলা দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না সেও আমাদের চিন্তার বিষয়।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ব-পরিচয় ১৷৷০

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পূজা পার্বণ ৩৲ বাঁধাই ৪৲

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২।০

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস ২৲

সুরেন ঠাকুর

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২।০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

পদার্থবিদ্যার নবযুগ ৩৲

ব্যাধির পরাজয় ১৷৷০

শ্রীনির্মলকুমার বসু

হিন্দুসমাজের গড়ন ২৷৷০

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারতদর্শনসার ৩।০

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

আহার ও আহার্য ১।০

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণতত্ত্ব ২।০

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের কথা ১৷৷০

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

হিউয়েনচাঙ ২৷৷০

বাঁধাই ৩৲

বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষৎ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থ আমাদের নিকট পাওয়া যায়। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা পাঠানো হয়।

বিশ্বভারতী

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

কমল আননের কোমল প্রসাধন

১। সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে।
২। ব্রণ ও মেছেতার দাগকে মিলিয়ে দিয়ে ত্বক্‌কে কমনীয় করে।
৩। Aseptic Conditionsএ প্রস্তুত।

বিঃ দ্রঃ—নূতন Packing দেখিয়া কিনিবেন, অপর পক্ষে পুরাতন Packing খুলিয়া মাল যাচাই করিয়া কিনিবেন। সাবধান, জাল মাল কিনিয়া প্রতারিত হইবেন না।

পূর্ব্বের সুগন্ধ বজায় রাখিয়া প্রস্তুত করা হয়।

গুপ্তধন

বহু বছর থেকে মানুষ তার ঐকান্তিক চেষ্টায় অনেকানেক "গুপ্তধন" আবিষ্কার করেছেন ও করছেন—মাটি খুঁড়ে, পাহাড়ে উঠে, সমুদ্রের তলায় গিয়ে, পুরাণো পাঁজি পুঁথি ঘেটে, গবেষণাগারে রাতদিন খেটে খেটে কতই না শ্রম স্বীকার করেছেন। সেইরূপ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রেও রোগারোগ্য কল্পে বহু নূতন তথ্য ও ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র গবেষণার অভাবে যথাপূর্ব্বং তথা পরং অবস্থায় পড়ে আছে। আনন্দের বিষয়, ডাঃ শীল, গত ২৫ বৎসর যাবৎ তাঁহার ঐকান্তিক গবেষণার ফলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রেও কথঞ্চিৎ "গুপ্তধনের" সন্ধান পেয়েছেন, যাহার ফলে সাধারণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও বাত, সায়েটিকা, ফাইলেরিয়া, ডায়েবিটীস্, প্যাষ্ট্রিক্ ও ডিওডিনাল আল্‌সার প্রভৃতি বহু জটিল ও দুরারোগ্য রোগ সহজেই আরোগ্য করতে সমর্থ হবেন। ডাঃ শীলের "হোমিও ইন্‌জেকসন ও স্পেসিফিক চিকিৎসা" নামক পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাবেন। মূল্য বাংলা অথবা হিন্দি ৩৲ টাকা, ইংরাজি ২৷৷০ টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

অনুসন্ধান করুন :—

দি হোমিও রিসার্চ এণ্ড ফার্ম্মাসিউটীক্যাল ওয়ার্কস

৬৬।১, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা—২৫

আনন্দময়ীর আগমনে

সূর্য্যনগরে প্রতিষ্ঠিত ৩নং ঢাকেশ্বরী মিলস্ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিচিত্র বস্ত্রসম্ভার লইয়া আপনাদের আমন্ত্রণ জানাইতেছে।

এই মিলের তৈরী কাপড় ইতিমধ্যেই বাজারে বিশেষ সমাদরে লাভ করিয়াছে।

ঢাকেশ্বরীর কাপড়

সুন্দর

মজবুত

ও সস্তা

দি ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লিঃ

শ্রীসূর্য্যকুমার বসু

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ম্যানেজিং এজেণ্টস

রেজিঃ অফিস ঃ ৪১নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৬

ফ্যাক্টরী ঃ ৩নং মিল—পোঃ সূর্য্যনগর জিলা-বর্দ্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)

১নং ও ২নং মিল—নারায়ণগঞ্জ (পূর্ব্ব পাকিস্তান)

হিন্দু মিউচুয়াল

লাইফ এসিয়োরেন্স লিঃ

অভাবনীয় সাফল্য

৩১-১২-৫১'র পঞ্চবার্ষিকী ভ্যালুয়েশন অতিশয় সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পরিচালনা করিয়া বিপুল উদ্বৃত্ত দেখা দিয়াছে। নানাখাতে বহুল পরিমাণ রিজার্ভ রাখিয়াও ডিরেক্টারগণ সমস্ত বীমাকারীগণকে (৩১-১২-৫১'তে যাঁহাদের পলিসি চালু আছে তন্মধ্যে দাবী প্রদান করা হইলেও) আজীবন ও মেয়াদী বীমায় পাঁচ বৎসরে হাজারে নিম্নরূপ লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন—

১৫৲ (৩১-১২-৪৬'র পর যে সমস্ত পলিসি হইয়াছে)
১০৲ (৩১-১২-৪৬'র পূর্বে যে সমস্ত পলিসি হইয়াছে)

নিম্নতম প্রিমিয়ামের উপর এই লভ্যাংশ ভারতীয় জীবন বীমার ইতিহাসে অতুলনীয়।

এজেন্সীর জন্য আজই আবেদন করুন

হেড অফিস—হিন্দু মিউচুয়াল হাউস
১৪, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলি { ফোন ব্যাঙ্ক ৫৩৮৯ / গ্রাম—কন্‌ষ্ট্রিবিউট,

কি

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স লিঃ

৩৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

একটি উন্নতিশীল জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান।

সংগঠন অফিস

পুর্ণিয়া অফিস—ভাট্টাবাজার, পুর্ণিয়া
আসাম ,, —নওগাঁও, আসাম
এলাহাবাদ ,, —৬৯, লিডার রোড, এলাহাবাদ
মাদ্রাজ ,, —৫৩বি, সেকেণ্ড লাইন বিচ, মাদ্রাজ।

বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম
ইয়ার বুক

শ্রীশিশির আচার্য্য চৌধুরী

সম্পাদিত

বাংলা বর্ষলিপি

মূল্য ২৷৷০

সংস্কৃতি বৈঠক
কলিকাতা—২৯

মিল্‌কাইট্‌

বার ও বল

খাঁটী সাবান, ভেজাল নাই

কাপড় জামা দুধের মত ফর্সা করে।

বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্‌ লিঃ
৭নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

উৎসব অনুষ্ঠানে

ক্যালকেমিকোর অপরিহার্য্য অঙ্গরাগ

কান্তা — মনোমুগ্ধকর সুরভিসার, পরিবেশ আমোদিত করে।

লাবণি স্নো — দিনের প্রসাধনে লাবণি স্নো মুখের ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়।

লাবণি ক্রীম — রাত্রে লাবণি ক্রীম ব্যবহারে চর্ম নরম ও মসৃণ হয়।

মলয় — চন্দন সাবান—শরীর স্নিগ্ধ রাখে ও চিত্ত প্রসন্ন করে।

ক্যাষ্টরল — মধুর সুগন্ধি কেশ তৈল। কেশশ্রী অপরূপ উৎকর্ষ লাভ করে।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা—২৯

শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের কয়েকখানি সেরা বই

ছবি ও পড়া

(১ম শ্রেণীর)

অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী

অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবশ্যপাঠ্য ছবির বই ,

(অনুমোদিত ২২ টি, বি, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫০)

মূল্য—৸৹

সচিত্র শিক্ষা-মঞ্জরী

(২য় শ্রেণীর)

অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী

ছবি ও পড়ার মতই অনিন্দ্যসুন্দর ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

(অনুমোদিত ২২ টি, বি, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫০)

মূল্য ৸৹

স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও সামাজিক শিক্ষা

(৩য় শ্রেণীর জন্য)

অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুমোদিত নূতন বুনিয়াদী সিলেবাস অনুসারে লিখিত। ১৲

পৃথিবী ও প্রকৃতি

(৪র্থ শ্রেণীর ভূগোলবিজ্ঞান)

অধ্যাপক শ্রীদেবকুমার মিত্র

(২২ টি, বি, ২৯।১১।৫০ এ অনুমোদিত)

৯১ খানি চিত্রে সুসজ্জিত। মূল্য ১।৹

পুরাতন ভারত

(৩য় শ্রেণীর ইতিহাস)

নূতন বুনিয়াদী সিলেবাস অনুসারে লিখিত।

অধ্যাপক শ্রীসুনীল কুমার বসু

মূল্য ৸৹ আনা।

ভারত পরিচয়

(৪র্থ শ্রেণীর ইতিহাস)

শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী

অসংখ্য চিত্রযুক্ত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

মূল্য ১৲

আমাদের পরিবেশ

(৩য় শ্রেণীর ভূগোল-বিজ্ঞান)

শ্রীসুকুমার ঘোষ, এম-এস-সি

গল্পের মত সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতিতে লিখিত

চিত্তাকর্ষক শ্রেষ্ঠ পুস্তক

মূল্য ১৲

পৌরশিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ প্রণীত

(৪র্থ শ্রেণীর জন্য)

দুরূহ বিষয়গুলি সহজ, সুন্দরভাবে লিখিত,

একমাত্র নির্ভরযোগ্য পুস্তক।

মূল্য ১।৹

সচিত্র শিক্ষা সোপান (২য় শ্রেণীর)—ডাঃ সুনীল রায় চৌধুরী, এম-এ, পি-এইচ-ডি

(অনুমোদিত ৮টি, বি, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৫২।

শিক্ষক পাবলিশিং হাউস

প্রধান কার্য্যালয় ঃ—৩১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯

শাখা ঃ—১৮।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।

এবার পূজোয়

আপনার প্রিয়জনকে

ডানলোপিলো

উপহার দিন

রবারের ফেনা জমিয়ে তৈরি আশ্চর্য আরামদায়ক বিছানার গদি, বালিশ ও কুশন

DPX 45

ডায়াপেপ্‌সিন

হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্য করা উচিত। ডায়াপেপ্‌সিন সেই কার্যই করিবে। পাকস্থলীর কার্য কতক পরিমাণে ডায়াপেপ্‌সিন বহন করিবে এবং খাদ্যের সারাংশ লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বল লাভ করিবে ও তখন খাদ্য হজম করা আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপ্‌সিন ঠিক ঔষধ নহে, দুর্বল পাকস্থলীর একটী প্রধান সহায়মাত্র।

ইউনিয়ন ড্রাগ

কলিকাতা

সহজে ফেরৎ পাবার সুযোগ রেখে
ভাল সুদে টাকা খাটাবার উপায়—
আমাদের

৩ বৎসর মেয়াদী ক্যাস্ সার্টিফিকেট

কেনা

- পূর্ণ মেয়াদান্তে বার্ষিক শতকরা ৩৲ টাকার উপর সুদ পাওয়া যায়।
- ৬ মাসান্তে যে কোন সময় টাকা তুলতে পারা যায়।
- ৫০৲ টাকা বা তার যে কোন গুণণীয়ক পরিমাণ 'ক্যাস্ সার্টিফিকেট' কেনা যায়—কোন উর্দ্ধসীমা নির্দ্দিষ্ট নাই।
- আমাদের সেবা ও তৎপরতা সর্ব্বদাই পাবেন।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস: ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

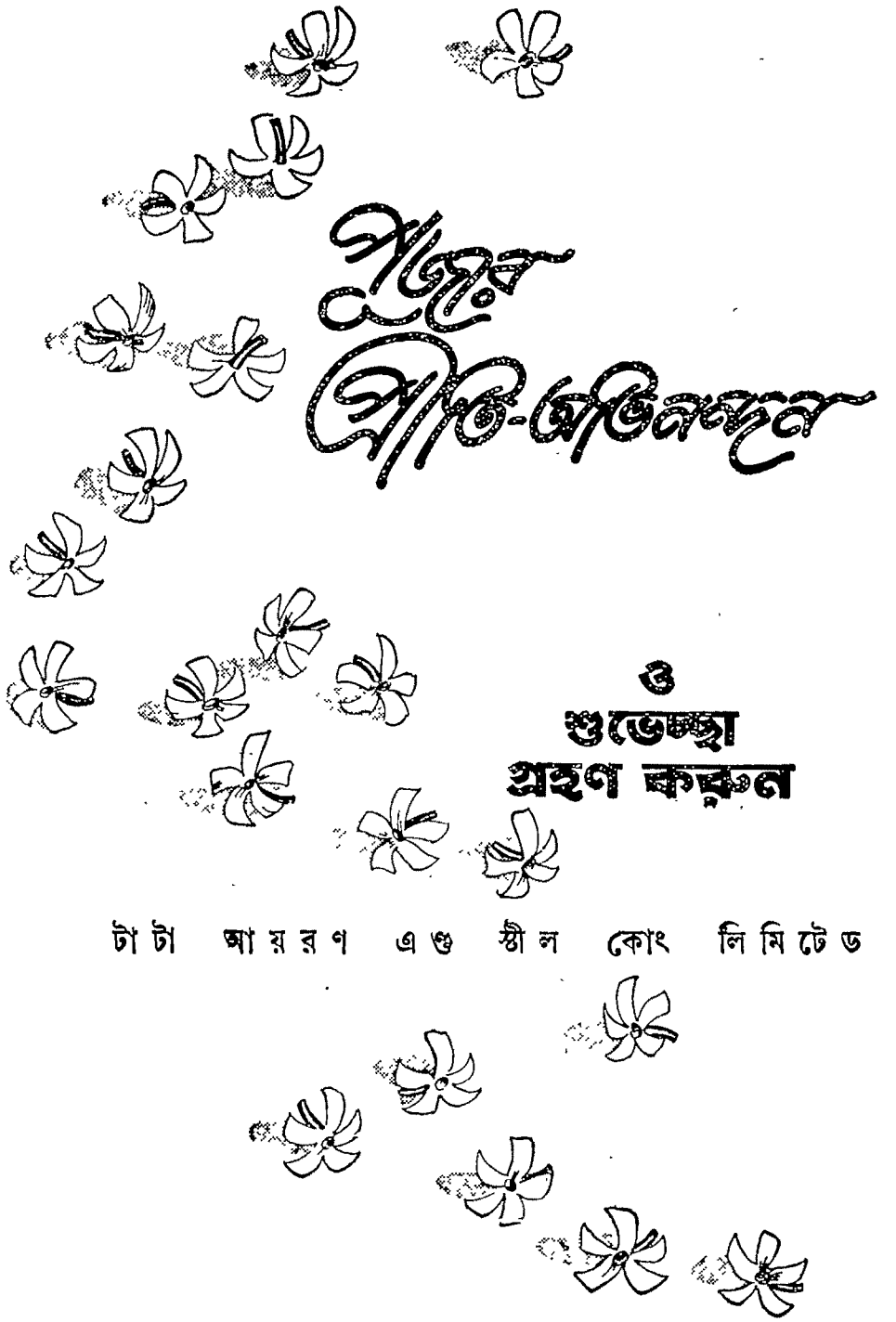

টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোং লিমিটেড

TN 3888

LET US SELECT YOUR PAINT

3 Coverall Paint for all

4 PROTECTALLS Will protect corrugated sheets.

2 FERRALLS Prevents corrosion under tropical condition of high temperature and humidity.

5 SILVALLS Lustre, Decoration & Protection combined in one.

1

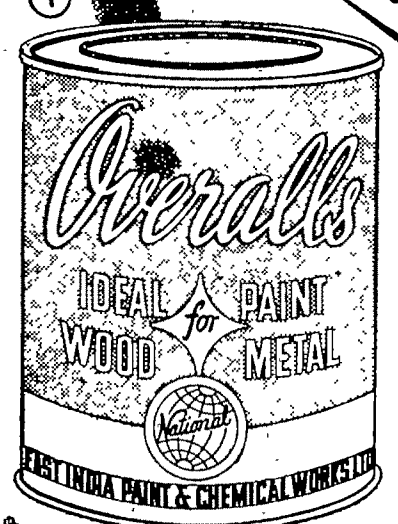

EAST INDIA PAINT & CHEMICAL WORKS LTD.

CALCUTTA - SILIGURI - MADRAS

ঢাকেশ্বরী পেপার ডিপো

৬৬।২, হ্যারিসন রোড
কলিকাতা-৯

সকল রকম দেশী, বিলাতী কাগজ, পেপার বোর্ড, ছাপাইবার কালি ও লিখিবার সরঞ্জাম আমদানীকারক ও বিক্রেতা।

সহর ও মফঃস্বলের যাবতীয় অর্ডার অতি সযত্নে সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

বার্কমায়ার ব্রাদার্স লিঃ

ষ্টিফেন হাউস
৪, ডালহাউসী স্কোয়ার ইষ্ট্
কলিকাতা

শাখাসমূহ ঃ ১২, রামপাট রো, ফোর্ট, বোম্বাই।
রেস কোর্স রোড, কইম্বেটর।

কলকারখানা পরিচালনার জন্য হেষ্টিংস হেয়ার ও কটন বেল্টিং এবং বর্ষার জল হইতে রক্ষার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত ত্রিপল ও অন্যান্য ক্যানভাসের দ্রব্যাদি ব্যবহার করুন।

হিন্দু ফ্যামিলি এন্যুয়িটি ফাণ্ড লিঃ

প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর
ইং ১৮৭২

এই ফাণ্ডের বীমা গ্রহণ করিয়া আপনার প্রিয়জনকে শারদীয়া পূজার উপহার দিন।

বোনাস

আজীবন বীমা—১৫৲ } প্রতি হাজার টাকায়
মেয়াদী বীমা—১২৲ } প্রতি বৎসর

হিন্দু ফ্যামিলি বিল্ডিংস
পি-১৩ মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা—১

পূজা কনসেসন

সস্তা দরে মোটা ও মিহি রকমারি ধুতি, শাড়ী, মার্কিণ ছিট ও থান ধুতি পাওয়া যায়।

—একমাত্র খুচরা বিক্রেতা কেন্দ্র—

৬৬, ভুপেন বোস এভিনিউ
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

দি
বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স্ লিমিটেড

পি, কে, চৌধুরী—চেয়ারম্যান

দুর্য্যোগের অন্ধকার রাত্রে পথিকের
অকৃত্রিম বন্ধু

দীপ্তি হারিকেন

বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত, মজবুত, দীর্ঘকাল স্থায়ী
অথচ সুলভ।

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইনডাষ্ট্রীস লিঃ
৭৭, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শ্বাস ও কাশরোগে
আশু ফলপ্রদ

কাসাবিন

বহুদিন সর্দ্দি, কাশি, হাঁপানি প্রভৃতি কষ্টকর উপসর্গে ভুগিয়া যাঁহারা ক্লান্ত ও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন, কয়েক সপ্তাহ নিয়মিত কাসাবিন সেবনে তাঁহারা আশাতিরিক্ত উপকার লাভ করিবেন এবং পুনরায় নিশ্চিন্ত আরামে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সমর্থ হইবেন।

সর্বত্র পাওয়া যায়

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই :: কানপুর

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা !
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা ।

—রবীন্দ্রনাথ

আপনার প্রিয়জনের হাতে শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ উপহার
মেট্রোপলিটানের একটি বীমাপত্র তুলে দিয়ে
দেবীপূজাকে সার্থক ক'রে তুলুন ।

দি

মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

॥ ৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ ॥

SERVING THE COUNTRY FOR
MORE THAN TWO DECADES !

The Nation's Best.

THE BENGAL ELECTRIC LAMP WORKS LTD.
CALCUTTA.

Puja Sankha

শিক্ষক

সম্পাদক—মহীতোষ রায় চৌধুরী ₹ 36,168 সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুনীল রায় চৌধুরী

৮ম বর্ষ] আশ্বিন, পূজা সংখ্যা ১৩৬১ [৩য় সংখ্যা

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

যে দেবী সর্ব্ববিশ্বে লক্ষ্মী অর্থাৎ সম্পদ ও শ্রীরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে॥
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

আনন্দময়ী মায়ের শুভাগমনে আপনার অবকাশের দিনগুলি আনন্দোজ্জ্বল হউক। আমাদের প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন।

যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনারূপে প্রসিদ্ধ, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠাত্রী, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

হে দেবী, আপনি সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপা, সর্ব্বাভিষ্ট সাধিকা, একমাত্র শরণযোগ্যা ত্রিভুবন জননী ও শুদ্ধ-সত্ব প্রধানা। হে নারায়ণী, আপনাকে প্রণাম।

হে দেবি, আপনি শরণাগত, দীন ও আর্ত্তগণের পরিত্রাণ-পরায়ণা, তাহাদের সর্ব্বাপৎনাশিনী এবং সকলের দুঃখনাশিনী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

দুর্গতিনাশিনী

চিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

আদ্যাশক্তি আদিমাতা—সর্ব্বাভরণবিভূষিতা,
অয়ি মা চিৎ-স্বরূপিনী—সদানন্দসংস্থিতা,
জগৎকারণ, সৃজন, পালন-শক্তি কি তোর পুঁথির পাতে,
মহামায়ার রূপে তোমার মায়া-নৃত্য পৃথ্বীটাতে ?
মঙ্গলা তোর মঙ্গলে কৈ
তট-তটিনীর বক্ষ-অর্থে ?
শস্য শ্যামল প্রকৃতি কৈ শস্যে অতুল সুসজ্জিতা ?
আদ্যাশক্তি আদিমাতা—সর্ব্বাভরণবিভূষিতা !

বিশ্বময়ী হ'য়েও তবু নিত্য বিশ্ব-অন্তরালে ?
ছল্-চাতুরী রাখ্ ফেলে তোর—আয় হেসে দিক্‌চক্রবালে !
ঐ চরণের নূপুরধ্বনি আজকে আবার উঠুক্ বেজে
গগন-ভুবন মাতাল করি' তোমার মোহন স্বর্গ ভোজে।
নিশির সিক্ত শিশির আনো,
শ্যামল আঁচল শস্যে টানো,
বিকচকুসুম-গন্ধবহে অনিন্দ্য মা বিনিন্দিতা !
আদ্যাশক্তি আদিমাতা—সর্ব্বাভরণবিভূষিতা !

দুর্গতিনাশিনি মা গো দুর্গতিতে বঙ্গ কাঁদে
দুঃখ-দৈন্য-দৈত্য-দানার অসহ আবদ্ধ-ফাঁদে।
রোগের শোকে পথ্য নাহি—নাহি ঔষধ, জীবন-ভীতি,
কেমন ক'রে সইব বলো ? সইব তপ্ত দিনের রীতি ?
অন্ন নাহি, বস্ত্র নাহি,
শুষ্ক কণ্ঠে দাও মা চাহি,
শক্তিহীনের, ভাগ্যহীনের বলবে কি মা জীবন ঘৃণা ?
আদ্যাশক্তি আদিমাতা—সর্ব্বাভরণবিভূষিতা !

অত্যাচারীর হও যদি মা তুমি দশপ্রহারিণী,
তাহার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি তোমার দেখাও দেখি—স্বরূপ চিনি !
যেমন কোমল—কঠোর তেমন, কটাক্ষ মৃণ্ময়াধারে
অনাচার ও অত্যাচারীর হানুক্ বুকে হুহুঙ্কারে !
ধ্বংসাতুরা আবার জাগো',
ধ্বংস করো তাদের মা গো,
দলুজদলন সাধ্যি তোমার—আমরা ব'বেক বুঝি কি তা' ?
আদ্যাশক্তি আদিমাতা—সর্ব্বাভরণবিভূষিতা !

ধন্য হউক্ বঙ্গভূমি আজকে তোমার করাল রণে,
ছুটুক্ ভাবের রক্তধারা নূতন সৃজন-আচরণে।
যাক্ দূরে যাক্ হিংসা কুটিল—কলুষ ও পাপ সর্ব্বনাশী,
পুণ্যতোয়া কৃপা-গঙ্গা আসুক্ তব স্বর্গ-হাসি।
উঠুক্ ফুটে মিলন-গীতি,
দিব্যজ্ঞানে দিব্য-প্রীতি,
ভক্তি-অর্ঘ্যে নমস্তুভ্যং নমঃ তোমায় সমাদৃতা।
আদ্যাশক্তি আদিমাতা—সর্ব্বাভরণবিভূষিতা !

এস মা

শ্রীনীলরতন দাশ

'শরৎ-রাণী মা ! সুরলোক ত্যজি' এস, এস'—ডাকে ধরণী,
আকাশ গঙ্গা সাজায়ে রেখেছে শুভ্র মেঘের তরণী।
সিনান করিয়া অরুণ কিরণে
হরিত হিরণ জড়িত চরণে,
এস মা, অঙ্গে অপরাজিতার সুনীল বসন পরিয়া,—
এস শিউলী ও বন-কেতকীর গন্ধে ভুবন ভরিয়া।

হংসবলাকা শুভ্রমালিকা গাঁথিছে সোনালী গগনে,
বেণুবনে বাঁশি তব আগমনী বাজায় পুণ্য লগনে।
আল্‌তা পরাতে চরণ যুগলে
রক্ত শালুক ফুটিয়াছে জলে,
তোমারে ব্যজন করিতে চমরী কাশের চামর দুলায়ে,—
সহকার শাখা শ্যামল পত্রে কত না কেতন দুলায়ে !

চাঁদতারা আঁকা নীলের চাঁদোয়া আস্‌মান দিবে টাঙায়ে,
চন্দনা শ্যামা বন্দনাগান তোমারে দিবে মা শুনায়ে।
ধূলি কাদা যদি লাগে তব পা'য়
শিশিরের জল ধুয়ে দিবে তায়,—
রুপালী রৌদ্র শুকাইয়া দিবে ধরার সিক্ত সরণী,—
'শরৎ রাণী মা ! সুরলোক ত্যজি' এস, এস—ডাকে ধরণী !

শারদীয়া দুর্গোৎসব

— শ্রীযতীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্বাস্তু সমস্যায় সঙ্কটাপন্ন, আধি-ব্যাধি ও দুঃখ-দারিদ্র্যে, ক্লিষ্ট, বিধ্বস্ত বিভিন্ন, বিশীর্ণ, অথচ বহুজনাকীর্ণ, এই বঙ্গদেশে শরৎঋতুর পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই ঋতুতে বাঙ্গলার জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে শারদ-লক্ষ্মীর প্রফুল্লশ্রী নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্যে ও প্রাচুর্য্যে পরিস্ফুট হয়। নদনদী, তড়াগ তটিনী ও সরিৎ সরোবর বর্ষাবারি পুষ্ট হইয়া কানায় কানায় জল পূর্ণ থাকে। তাহাদের বক্ষে বিবিধ বিচিত্র বিকশিত কুমুদ-কহ্লারের অপূর্ব্ব শোভা, মৃদু-সঞ্চরণ নীল মরাল-মরালীর নর্ম্ম-ক্রীড়া। স্থলে বিকশিত কাশ-কুসুমের এবং অজস্র শ্বেত শেফালিকার প্রাচুর্য্যে প্রান্তর-প্রাঙ্গন আস্তীর্ণ। মাঠে মাঠে হরিতবর্ণ পক্ষধান্য শীর্ষের মনোরম ঐশ্বর্য্য, তৃণ-গুল্মলতা পাদপের পত্র-পল্লব এবং ফল-ফুলে বন-ভূমি সুশোভিত। অন্তরীক্ষে,-নীল নভোমণ্ডলে হর্ষণ-লঘু ক্ষুদ্র, শুভ্র সঞ্চরণশীল মেঘ খণ্ডের নিম্নে উড্ডীয়মান্ শ্বেত বলাকা শ্রেণীর বিচিত্র গতাগতি। ফলতঃ শরতে সবই শুভ্র, সবই স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কবি তাই এই শারদ লক্ষ্মীকে আবাহন জানাইয়াছেন,—

এস গো শারদ লক্ষ্মী।
তোমার শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্ম্মল নীল পথে,
এস ধৌত শ্যামল আলো ঝলমল,
বনগিরি পর্ব্বতে;
এস মুকুট পরিয়া শ্বেত শতদল,
শীতল শিশির ঢালা।

কবি কালিদাসের ভাষায়,—

সম্পন্নশালি-নিচয়াবৃত-ভূতলানি।
স্বস্থ-স্থিত প্রচুর-গোকুল-শোভিতানি।
হংসৈঃ সসারসকুলৈঃ প্রতিনাদিতানি।
সীমান্তরাণি জনয়ন্তি নৃণাং প্রমোদম্॥

অর্থাৎ আজ গ্রামের সীমান্তভাগের দিকে চাহিয়া প্রাণ জুড়াইয়া যাইতেছে—দেখ, দেখ, ক্ষেত্র হইতে আহৃত শালিধান্যস্তূপে ভূতল একেবারে আবৃত হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য গো কেমন সুস্থ হৃদয়ে পরিপুষ্ট দেহে দলে দলে চারিদিক আলো করিয়া বিরাজ করিতেছে এবং সারস ও হংসরাজির কলরবে সীমান্তভাগ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কে এমন আছে অন্তরে এই সৌন্দর্য্যে যার হৃদয় না বিমোহিত হয়?

কালিদাসের যুগ বহুদিন অতীত হইয়াছে। স্বর্ণপ্রসূ ভারত বর্ষ ও সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাঙ্গালার আজ নিদারুণ অঙ্গহানি ও গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। দেশ হ্রস্ব ও খর্ব্ব হইলেও, নিসর্গের শোভার বিশেষ হানি হয় নাই; এবং দুঃখ-ক্লেশ প্রপীড়িত জন সাধারণের সেই বাঙ্গালী-সুলভ ভাব ও ভক্তিপ্রবণতার হ্রাস ঘটে নাই। শরতের প্রারম্ভে শারদ লক্ষ্মী ও শারদীয়া দুর্গার শুভাগমনে বাঙ্গালীর কোমল-হৃদয় আশা-আকাঙ্খা ও আমোদ-প্রমোদের আসন্ন সম্ভাবনায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে। বৎসরান্তে মহাদেবী মহামায়া আসিবেন, মাত্র তিন দিনের জন্য, কন্যা রূপে পিত্রালয়ে। এই বাৎসল্য ভাবটি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার ভাবপ্রবণ প্রাচীন কবিগণ যে কবিতা প্রস্রবন প্রস্ফুরিত করিয়াছেন তাহা অতি চমৎকার। এই সঙ্গীতগুলি 'আগমনী' নামে সুপ্রসিদ্ধ। সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন ইহার প্রবর্ত্তক। শরতের প্রারম্ভে এই মধুর গীতগুলির করুণসুরে বালক বালিকা ও শ্বশুরগৃহে অবস্থিত কিশোরী ও যুবতী বধূগণের হৃদয়ের নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিবার আকুল আকাঙ্খা জাগিয়া উঠে, অনুপস্থিত কন্যাগুলিকে দেখিবার নিমিত্ত অমিত স্নেহবৎসল মাতা পিতার হৃদয়-মন ও উৎসুক ও উৎকণ্ঠিত হয়। এই মমত্ব ভাবটি বাঙ্গালী জাতি যেমন মনে-প্রাণে অনুভব করে, অন্য

কোন জাতি তদ্রূপ করিতে পারে কি না সন্দেহ। এই সঙ্গীতের সুমধুর ধ্বনি শুনিলে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের এবং এমন কি, প্রৌঢ় প্রবীণ শিক্ষক মণ্ডলীর হৃদয় ও পুলকিত হয়। আসন্ন পূজাবকাশের অবসরের আনন্দ, বিরাম ও বিশ্রামের সহিত এমন ভক্তি-বিলাসের সুযোগ-সুবিধা অতি বিরল। তাই তাহাদিগের মনের মধ্যে তাহারা শুনিতে পায়।

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে, বাজে গভীর শঙ্খ ধ্বনি,
আকাশ-বীণার তারে তারে, জাগে তোমার আগমনী।

কিন্তু পূজা কেবল আনন্দ-উপভোগ কিংবা কলকোলাহলের নিমিত্ত নহে। ভক্তি-উপচারে, পত্র-পুষ্প ফল-মূল, দধি-দুগ্ধ ও বিবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা মায়ের আবাহন, অর্চ্চনা ও আরাধনা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের নিমিত্ত। পূজা আমরা কেন করি? নিশ্চিত, পুণ্য লাভের নিমিত্ত। পুণ্য লাভ করিলে কি হয়? আমরা ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করিতে পারি। আমরা গৃহী, পিতা মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া সংসারধর্ম্ম পালন করি সুতরাং আমাদের বহুদ্রব্যের নিত্য প্রয়োজন। আমরা যদি সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি তাহা হইলে, জগৎজননী জগদীশ্বরীই আমাদের সর্ব্ব অভাব মোচন করেন। মা আমাদের কল্পতরু। তাঁহার নিকট আমরা অকপট ভাবে যাহা কিছু প্রার্থনা করি তিনি তাহা পূরণ করেন—অবশ্য যদি আমাদের সেই প্রার্থনার উপযোগী সাধনা থাকে। সাধনা দ্বারা আমরা অপরিসীম শক্তি-সামর্থ্য ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অর্জ্জন করিতে পারি। সাধনার অর্থ, অনুশীলন—সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া ফল মূল খাইয়া যোগ তপস্যা কিংবা কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন নহে। কোন ছাত্র যদি সারা বৎসর পড়াশুনা না করিয়া পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে খুব ঘটা করিয়া জাঁকজমকের সহিত মায়ের পূজা করে, তাহা হইলেও তাহার পক্ষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। কারণ, ফাঁকি দিয়া কিংবা ষোড়শোপচারে পূজা করিবার প্রলোভন দেখাইয়া মায়ের প্রসাদ লাভ করা যায় না। আমাদের অকপট আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ব্যতীত তাঁহার অন্য আকাঙ্খা নাই। আমাদের সর্ব্ব অভাব পূরণ করিবার নিমিত্ত মা সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমাদিগকে দান করিতে তাঁহার কোন কৃপণতা নাই। তাঁহার অদেয় কিছুই নাই। সর্ব্বদা তিনি আমাদিগকে সর্ব্বস্ব, এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার জন্য উন্মুখ। কিন্তু, তিনি আমাদিগকে যে কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি দিয়াছেন, যে সকল চিত্ত-বৃত্তি ও কর্ম্ম-কুশলতা দিয়াছেন, আমাদিগকে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া সব কিছু অর্জ্জন করিতে হইবে। উপযুক্ত পরিশ্রম করিলে উপযুক্ত ফল প্রাপ্তি ঘটিবে, তাহার অন্যথা হইবে না। কায়-মনোবাক্যে আমরা যাহা পাইতে চাই সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার জন্য আমাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা করিতে হইবে। তাহা হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তবে মনে যেন হিংসা দ্বেষ পাপ না থাকে, কাহারও কোন অনিষ্ট চিন্তা মনে যেন স্থান না পায়। আমি যদি প্রার্থনা করি, মা আমার পুত্রটি যেন পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করে এবং আমার প্রতিবেশীর বা শত্রুর পুত্রটি কৃতকার্য্য না হয়,—তাহা হইলে, মা কখনই আমার সে প্রার্থনা পূরণ করিবেন না। কারণ, শত্রু, মিত্র দীন দুঃখী, মূর্খ পণ্ডিত, ধনী নির্ধন সকলেই তাঁহার সন্তান, সকলের প্রতি, তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য সমানই ইতর বিশেষ নাই। ইতর বিশেষ ঘটে, আমাদের নিজ নিজ কর্ম্মফলে। আমরা যে যেরূপ কর্ম্ম করি, সে সেইরূপ ফলভোগ করি। সৎকর্ম্মের সুফল, অসৎকর্ম্মের কুফল অবশ্যম্ভাবী। শুদ্ধ চিত্তে, পবিত্র ভাবে, অনুশীলনই আমাদের কার্য্য। কাহার ও অনিষ্ট চিন্তা যেন মনকে স্পর্শ না করে। চাই,—বিশ্বাস ও নির্ভরতা, ভাব ও ভক্তি এবং গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা। কিন্তু কবি কালিদাস রায়ের কথায়—

কোথা সে ভক্তি যার টানে তুমি আসিবে ধরার পরে?
কোথা সে শক্তি? শক্তির পূজা হবে কোন্ উপচারে?
কোথা সে নিষ্ঠা? কোথা সে আকুতি?
কোথা আত্মার সে তেজো-বিভূতি?
কোথা সে তোমার আসন-কমল মানসের সরসীতে?

(পর পৃষ্ঠার নীচে দেখুন)

শিক্ষাব্যবস্থা ও জীবন সম্পর্ক

শ্রীনীলনাথ মুখোপাধ্যায়

সুদূর অতীতে এক দিন মানুষ তাহার জীবনের প্রয়োজনেই সন্তানের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইতর প্রাণীরা আজও জীবনের প্রয়োজনেই তাহার সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে, তবে সেটা হয়ত মানুষের মত আত্ম—সচেতন ভাবে হয়না, অথবা একটা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-তত্ত্বের নির্দ্দেশ অনুসারে হয় না, এই পর্য্যন্ত। তাহা হইলে আজ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে জীবন-সম্পর্কিত করিবার জন্য প্রশ্ন উঠিয়াছে কেন? বর্ত্তমানের শিক্ষা-ব্যবস্থাটা কি জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য একটা সৌখীন বিলাসিতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে? অনেকেরই ধারণা তাই। অনেকেই বলেন, আজ যে শিক্ষা আমাদের দেশে চলিতেছে, তাহা হইতেছে ইংরাজের সওদাগরী অফিসে সুলভ কেরাণী তৈয়ারি করিবার জন্য এবং আমাদিগকে আমাদের কালো চামড়ার তলে তলে মেকী ইংরাজ তৈয়ারী করিবার জন্য সেকালে সাহেবের অপচেষ্টা মাত্র।

কিন্তু এই শিক্ষাই ত এতদিন ধরিয়া আমাদের জীবনকে সাহায্য করিয়াছে। এই শিক্ষা দিয়াই আমরা শুধু যে বঙ্গ দেশে ও বঙ্গেতর ভারতবর্ষে কেরাণী উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষক অধ্যাপক প্রভৃতি হইয়াছি তাহা নহে, এই বিলাতি শিক্ষার দৌলতেই আমরা বার্ক্, শেরিডন্, পড়িয়াছি, ফরাশী বিপ্লবের কথা, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা, ম্যাৎসিনী গ্যারিবল্ডির জীবন কথা পড়িয়া দেশাত্মবোধে অনুপ্রেরণা পাইয়াছি, ভাষা ও মতবাদের সাম্যে নিখিল ভারতবাসী একত্র মিলিত হইয়াছি, কংগ্রেস তৈয়ারি করিয়াছি, বন্দেমাতরম গাহিয়াছি, কারার কক্ষে, ফাঁসির মঞ্চে দুঃখ বরণ করিয়াছি, এবং স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। দেশকে যাঁহারা জাগাইয়া গিয়াছেন, অনাদৃত দেশ মাতৃকাকে যাঁহারা চিনাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার জয়গান যাঁহারা গাহিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় কৃষ্টিকলার গৌরবকে যাঁহারা নূতন ভাবে দর্শন ও প্রদর্শন করিয়াছেন, —সেই রামমোহন, বঙ্কিম, তিলক, গোখেলে, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই এই ইংরাজী শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল। দেশের পরাধীনতার শিকল যাঁহারা ভাঙ্গিয়াছেন, সেই বরেণ্য নেতৃ-বৃন্দ, সেই মহাত্মা গান্ধী হইতে জহরলাল, সুভাষচন্দ্র, আর বীর সভারকর হইতে জিন্না, শ্যামাপ্রসাদ পর্য্যন্ত সকলেই এই বিলাতি শিক্ষার ফল। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মধ্যে হয়ত একটু আধটু সংস্কৃত প্রভৃতি শিক্ষা ছিল, কাহারও মধ্যে আবার প্রত্যক্ষ ভাবে তাহাও ছিল না। বিলাতি শিক্ষাই তাঁহাদিগকে জীবনের পথে চরম সার্থকতা দিয়াছিল।

(১০২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তবু তিনি আসেন সন্তানের প্রতি অপরিসীম মমতা বশতঃ, "শারদ-গগনে, কমল কাননে, গিরি নদী অটবীতে, বঙ্গের শ্যাম প্রান্তর ভরি." তাঁহার অশেষ কৃপা। তিনি করুণাময়ী, চিরকল্যাণদায়িনী, সন্তান বৎসলা স্নেহময়ী জননী। অন্তরের সহিত তাঁহাকে আবাহন করিলে তিনি নিশ্চয়ই আবির্ভূত হন। তাঁহার আরাধনা করিলে তিনি প্রসন্না হন, তাহার অর্চ্চনা করিলে, তাঁহার পূজা পাঠ, স্তবস্তুতি এবং ধ্যান ধারণা করিলে তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁহার প্রসাদ বিতরণ করেন।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে,
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবী, নারায়ণি নমোহস্তুতে।

তাহা হইলে আজ এই শিক্ষার ব্যর্থতা লইয়া এত কথা উঠিতেছে কেন। কেনই বা শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করিবার জন্য কলরব শুনা যাইতেছে? তাহার কারণ হইতেছে, বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদিগকে জীবন সংগ্রামে নিপুণতর করিয়া তুলিতে পারিতেছে না, শিক্ষা সত্ত্বেও আমরা প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইতেছি। সেই জন্যই অনেকে বলিতেছেন বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতেছে একান্ত ভাবে পুঁথিগত ব্যাপার (academic)। এর প্রয়োজনীয়তার আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া গিয়াছে, শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তাই নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহাকে জীবন পরিবেশের সহিত সম্পর্কিত করিয়া জীবন সহচরী করিয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুঁথির অভিভাবকত্ব হইতে মুক্ত করিয়া আরও ব্যবহারিক করিয়া তুলিতে হইবে।

শিক্ষার ব্যবস্থাকে ব্যবহারিক করিয়া তুলিবার প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহারা শিক্ষাবিদ্‌গণের চিত্তদোলায় যে দোল দিয়াছিলেন, তাহারই দোলন আজ নূতন আন্দোলন হইয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন প্রভৃতির সমালোচনার মধ্যে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন্ বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সমস্ত ত্রুটি গুলি দেখাইয়াছিলেন, সে গুলি হইতেছে, (১) শিক্ষার একমুখী (unilinear system) ব্যবস্থা (২) মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব ও প্রভুত্ব, (৩) হাতে কলমে কাজ করিবার সুযোগের অভাব, (৪) ছাত্রদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব, (৫) কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থার স্বল্পতা, (৬) কারখানা ও ব্যবহার কেন্দ্রগুলির সহিত বিদ্যালয়ের যোগাযোগের অভাব, (৭) কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকার গুলির যোগাযোগের অভাব, (৮) বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন শিক্ষা-নীতি প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত ত্রুটির অধিকাংশই হইতেছে শিক্ষার সহিত ব্যবহারিক জীবনের সম্পর্কের অভাবজনিত ত্রুটি।

মাধ্যমিক বিভাগের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষাকে জীবনের সহিত সম্পর্কিত করিবার জন্য বর্ত্তমানে যে সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে, সেগুলি হইতেছে—কৈশোরের প্রয়োজন ও সামর্থ্য হিসাবে শিক্ষাকে বহুমুখী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা এবং তাহাদের মনস্বিতাংশ ও প্রবণতা লক্ষ করিয়া যে সব ছাত্রদের মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইবার সামর্থ্য নাই, তাহাদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামের মধ্যেই নানা জাতীয় কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা আর বাকী বুদ্ধিমান ছেলেদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের academic পরীক্ষার পথ সুগম করিয়া দেওয়া; অর্থাৎ, মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ভাবে করা যাহাতে এক দিক দিয়া ইহা যেমন যুবকদিগকে জীবিকা অর্জ্জনে সহায়তা করিবে, অন্যদিক দিয়া তেমনই তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষার জন্যও প্রস্তুত করিবে।

এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিতর্কের কোনও কারণ নাই। আমরা দেখিতে পাইতেছি বর্ত্তমান সিলেবাসে শিক্ষিত হইয়া যে সব ছাত্র দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগে স্কুল ফাইনাল পাশ করে তাহারা 'ন ঘরকা না ঘাটকা' এক জাতীয় জীব হইয়া উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত যোগ্যতা ও তাহাদের থাকে না আবার সরাসরি কোনও একটা কাজ কর্ম্মে লাগিয়া যাইবার মত কারিগরি দক্ষতাও তাহারা অর্জন করে না। ফলে তাহারা যদি চাকুরি প্রভৃতি না পায়, তখন হাতে কলমে কাজ কর্ম্মও তাহারা কিছু করিতে পারে না। ফলে যাহাদের পড়াশুনা করিবার ইচ্ছা ও নাই, হয় তো ক্ষমতা ও নাই, তাহারা ও বাধ্য হইয়া কলেজে প্রবেশ করে এবং সেখানে কিছুদিন সময় অর্থ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া জীবন সংগ্রামে আরও অনুপযুক্ত হইয়া পড়া শুনা শেষ করে, দেশে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, জীবন ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে অহঙ্কার স্ফীত হইয়া উঠে এবং জাতীয় জীবনে ব্যর্থতা প্রকট হইয়া পড়ে।

এই আশঙ্কা নিবারণের একমাত্র উপায় হইতেছে স্কুল গুলিকে multi-lateral করিয়া শিক্ষাকে বহুমুখী করিয়া তোলা। মধ্য শিক্ষা কমিশনও এই সুপারিশই করিয়াছেন। এই multi-lateral ও multi-purpose স্কুলের উপযোগিতা উদয়পুরের বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ডাঃ K. L. Srimali বিগত নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের অষ্টাবিংশতি অধিবেশনে নানা ভাবেই দেখাইয়াছিলেন।

ডাঃ শ্রীমালি দেখাইয়াছিলেন শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক করিবার (democratic) করিবার উৎকৃষ্টতর উপায় ইহার চেয়ে বেশী নাই। ইহাতে বিভিন্ন প্রকারের লক্ষ্য, বিভিন্ন প্রকারের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন প্রকারের ক্ষমতা ও বুদ্ধি বৃত্তি লইয়াও ছেলেরা একই স্কুলে পড়াশুনা করিয়া তাহাদের সম্ভবনাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। বিরুদ্ধবাদীরা হয়ত বলিতে পারেন, ইহার জন্য multi-lateral school তৈরী করার প্রয়োজন কি? ইহার জন্য গোটা কতক করিয়া technical স্কুল বা কৃষি বিদ্যালয় প্রভৃতি তৈরী করিয়া দিলেই ত হয়। বিভিন্ন স্কুলের ব্যবস্থা হইলে যাহারা কারিগরি বিদ্যালয়ে যাইবে তাহাদের মধ্যে আসিবে একটা হীনমন্যতার ভাব এবং যাহারা acadmic স্কুলে যাইবে তাহাদের মধ্যে আসিবে একটা উন্নাসিক ভাব। ইহা স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর নহে। বর্ত্তমান সময়ে additional subject হিসাবেও কোনও ছাত্র যদি গণিত নেয় এবং অন্য একজন যদি mechanics বা বিজ্ঞান প্রভৃতি নেয়, তাহাতে কেহই কাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারে না। multi-lateral school গুলিতে ঠিক এই জিনিষই হইবে। তাহাতে কেহ ভাবিতে পারিবে না যে আমরা academic course টা লইয়াছি বলিয়া আমরা হইতেছি উচ্চতর জীব, আর বাকী সকলে কুলি মজুরের শিক্ষা পাইয়াছে বলিয়া নিম্নস্তরের জীব।

ইহা ছাড়া আর ও একটা কথা আছে। Central Advisory Board of Education মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত বুনিয়াদি শিক্ষাকেই জাতীয় শিক্ষার আদর্শ (pattern of national education) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেই বুনিয়াদি শিক্ষার সহিত বর্ত্তমান প্রচলিত academic শিক্ষার একটা যোগ সূত্র নাই। তা ছাড়া এই বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্ত্তনের ও প্রসারের ফলে গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সহরের শিক্ষা ব্যবস্থার অথবা কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা ও পুঁথিগত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য গড়িয়া উঠিতেছে। এই জন্যই যাঁহারা ছেলেদের উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে উচ্চাভিলাষ পোষণ করেন, তাঁহারা বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে তেমন আমল দিতেই চাহেন না।

Multi-purpose স্কুলগুলি এই অবস্থার অবসান ঘটাইয়া বুনিয়াদি শিক্ষার সহিত মাধ্যমিক তথা উচ্চশিক্ষার একটা যোগ সূত্র স্থাপন করিবে। তাহার ফলে বুনিয়াদি স্তর হইতে মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশ ব্যাপারটা যেমন মসৃণ ও সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে, তেমনই মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কারিগরি বা পেশাগত কর্ম্মজীবনে অভিযানটাও তেমনই সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে।

শিক্ষাকে জীবনের সহিত সম্পর্কিত করিবার জন্য পাঠ্য সূচীর কথাও অনেকখানি ভাবিতে হইবে। বর্ত্তমান পাঠ্য সূচীতে ইংরাজী যে ভাবে পড়ান হয় তাহাতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার চেয়ে ইংরাজী সাহিত্য শিখাইবার জন্যই বেশী প্রবণতা দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে ইংরাজী ২৫০ নম্বরের মধ্যে ছাত্রদের ইংরাজী ভাষা জ্ঞানের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে মাত্র ৭৫ নম্বর, অনুবাদের জন্য ২০, সংক্ষিপ্ত সারের জন্য ১৫, চিঠি পত্রের জন্য ১৫, আর ব্যাকরণের জন্য ২৫। ইহার মধ্যে আবার চিঠি লেখার ১৫ নম্বরের দ্বারা ছাত্রদের ঠিক জ্ঞানের পরীক্ষা প্রায়ই হয় না, কারণ প্রায়ই মুখস্ত বিদ্যার দ্বারা চিঠি লেখার বাহাদুরিটা প্রতিষ্ঠিত করা যায় আর ব্যাকরণের ২৫ নম্বরেরও অনেকখানিতেই mechanical ব্যাপার আছে; ইংরাজী ভাষার জ্ঞান ভাল না থাকিলেও transformation of sentences, অশুদ্ধি সংশোধন প্রভৃতির কাজ আন্দাজে করা যায়। যাহাই হউক এই ৭৫ নম্বর বাদ

দিলে বাকী ১৭৫ নম্বরটা সবই থাকে পাঠ্য পুস্তক হইতে। ইংরাজীকে ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য তৈয়ারি করিতে হইলে ছাত্রদের নিজস্ব রচনার শক্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

পাঠ্য সূচীর পরিবর্ত্তন দ্বারা ইংরাজীর মত গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, art craft প্রভৃতিকেও জীবনের সহিত সম্পর্কিত করিয়া তোলা যায়। গণিতকে Commercial Arithmatic এর সহিত এবং বিজ্ঞানকে Applied Chemistry বা Applied Physics প্রভৃতির সহিত সম্পর্কিত করিয়া, artকে Commercial art এর দিকে প্রবণতা দিয়া এবং craft কে নানা জাতীয় ব্যাপারের প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ও সহকারী করিয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা প্রত্যহিক জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিতে পারি।

অনেকেরই বিশ্বাস শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই ভাবে প্রত্যহিক জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিলেই আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত হইয়া উঠিবে, দেশে আর বেকার সমস্যা থাকিবে না।

কিন্তু নিছক শিক্ষার ব্যবস্থার দ্বারা আমরা দেশগত বেকার সমস্যার সমাধান করিতে পারিব কি? মাধ্যমিক শিক্ষাকে যদি আমরা সর্ব্বাঙ্গীন করিয়া তুলিতে চাই, তাহা হইলে সেই বিপুল সংখ্যক যুবকবৃন্দকে চাকরি অথবা হাতে কলমে কাজ দিয়া অন্ন সমস্যা মুক্ত করিতে পারিব কি? আমরা দেখিতে পাই 'উইভিং কলেজ' হইতে পাশ করিয়া থাকিলেই ছেলেরা কাপড়ের কল কারখানা তৈয়ারি করিতে পারে না, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়াও অনেকে জীবন সংগ্রামে কৃতী হইতে পারে না, ডাক্তারি পাশ করিয়াও উপযুক্ত সহায়তার অভাবে অনেক প্রতিভাশালী যুবককে অন্য ডাক্তারের সহকারী হিসাবে অগৌরবের জীবন কাটাইতে হয়, ওকালতি পাশ করিয়া অনেকে স্বাধীন ভাবে practice আরম্ভ করিতে পারে না; কমার্স পড়িয়া অধিকাংশ ছেলেই ব্যবসাদার হইতে পারে না, হয় অন্য ব্যবসাদারের কেরাণী।

কাজেই শিক্ষাকে শুধু ব্যবহারিক করিয়া তুলিলেই দেশের যুবকেরা যে বিভিন্ন পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। বিভিন্ন পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে প্রয়োজন হয় এক একটা পেশার সহিত জন্মগত ও কর্ম্মগত ঘনিষ্ঠতা ও আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধা। এই জন্মগত ও আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধার জন্যই মাড়োয়ারী ব্যবসাদারের ছেলেরা কমার্স না পড়িয়াও ভাল ব্যবসাদার হইতে পারে, আর কর্ম্মগত সুযোগ সুবিধার জন্য হেনরি ফোর্ড হইতে আলামোহন দাস পর্য্যন্ত তাহারাই বড় হইতে পারিয়াছে, যাহারা একেবারে নিম্নতম স্তর হইতে এক একটা ব্যাপারের সমস্ত বিষয়ের খুঁটি নাটি বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। স্কুল কলেজের শিক্ষার কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে সেই জাতীয় অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা নাই।

কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে muti-lateral করিয়া ব্যবহারিক জীবনের সহিত সম্পর্কিত করিলে দিন কতকের জন্য শিক্ষিত যুবকদের খানিকটা সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু এই শিক্ষা যখন সার্বজনীন হইবে তখন দেশের লক্ষ লক্ষ যুবককে দিবার মত চাকুরি বা পেশা হয়ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

আজ আমাদের মধ্যে যে ব্যর্থতা ও অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার জন্য দায়ী কে?—এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিয়া আমরা ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর দোষ চাপাইয়াছি এবং ভাবিতেছি যে শিক্ষাকে একটা ব্যবহারিক প্রবণতা দিতে পারিলেই হয়ত আমাদের জীবন সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। আবার ব্যবহারিক শিক্ষা যখন সার্বজনীন ও বহুব্যাপক হইয়া উঠিবে তখন হয়ত আমরা ব্যবহারিক জীবনের-প্রতিদিবসের গ্লানি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য হাঁপাইয়া উঠিয়া এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য দাবী করিব যাহার সহিত ডাল ভাত বা হাতা বেড়ীর কোনও সম্পর্ক নাই।

আবার যদি কখনও এমন একটি রাম রাজ্য দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে রাষ্ট্র হইতে প্রত্যেক মানুষটিকেই উপযুক্ত কাজ দেওয়া যাইবে, এবং প্রত্যেকের জন্যই অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা হইবে তখন মানুষ চাহিবে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যে শিক্ষা তাহাদিগকে কাজের ব্যাপারে দিবে দক্ষতা আর অপর সময়ে দিবে কাব্য সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি বিমূর্ত্ত চিন্তার খোরাক। স্থূল অন্ন বস্ত্রের সহিত যাহার সম্পর্ক নাই, এইরূপ একটা বিমূর্ত্ত চিন্তার খোরাক—শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। কারণ মানুষ তাহার অবসর মুহূর্ত্তগুলি কি ভাবে যাপন করে, তাহারই মধ্যে নিহিত আছে তাহার প্রকৃত সভ্যতার পরিচয়। এই জন্যই ব্যবহারিক জীবনে যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হয় তাহার কাব্য দর্শন প্রভৃতির রসাস্বাদ। এই জন্যই শিক্ষাকে যতই ব্যবহারিক করিয়া তোলা হউক না কেন তাহার সহিত কাব্য সাহিত্য দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি রাখিতেই হইবে।

শিক্ষার আদর্শ উদ্দেশ্য ও প্রণালী লইয়া মতভেদের অন্ত নাই। সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বিতর্ক যতই হউক না কেন, এ কথা অনস্বীকার্য্য যে জীবনের প্রয়োজন হইতে শিক্ষার প্রয়োজন একটা অন্যতর দ্রব্য হইতে পারে না। এই জীবনের প্রয়োজনেই অতীতের এথেন্স তাহার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়া দেশের যুবকবৃন্দকে আদর্শ নাগরিক করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল, এই জীবনের প্রয়োজনেই স্পার্টা চাহিয়াছিল দেশের প্রত্যেক লোকটিকে আদর্শ সৈনিক হিসাবে গড়িয়া তুলিতে, আর বর্ত্তমানে আমরা চাহিতেছি দেশের যুবকবৃন্দকে প্রাত্যহিক জীবনের অন্ন বস্ত্রের সমস্যা মিটাইবার জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলিতে।

কিন্তু জীবনের প্রয়োজন শুধু অন্ন বস্ত্রের, প্রয়োজন নহে, শুধু নাগরিকত্বের প্রয়োজন নহে, সন্ন্যাসের প্রয়োজনও নহে। ইহার প্রয়োজন অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। ইহার সমস্যার জন্য একটা চিরন্তন সমাধান নাই, জীবন ব্যাধির চিকিৎসার জন্য সার্ব্বজনীন প্রেস্ক্রিপ্শন ঔষধ নাই সার্ব্বজনীন একটা formula ও নাই মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়াছে এই যে, একটা সাময়িক প্রতিকারের ব্যবস্থাকে মানুষ চিরন্তনী ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিয়াছে। সেই জন্যই যে ব্যবস্থাটি এক যুগে ফলপ্রসূ হইয়াছে, সেই ব্যবস্থাটিই পরবর্ত্তী যুগে ব্যর্থতার সৃষ্টি করিয়াছে। এই জন্যই শিক্ষা তত্ত্বের মতবাদের মধ্যে একটা পেণ্ডুলমের গতির মত দোলন দেখা যায়। আজ কাল শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করিবার জন্য যে একটা আন্দোলন চলিতেছে তাহা ঐ দোলনেরই একটা অবস্থা মাত্র। ইহাও একটা চিরন্তনী নীতি হইতে পারে না কারণ অন্নবস্ত্রের এবং অর্থ নৈতিক তারতম্যের প্রয়োজন ছাড়াও মানুষের আরও অন্য প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে মানুষ হাঁপাইয়া উঠে। একটা গরু নাক কান ডুবাইয়া জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট হয় এবং সেই জাবনারই রোমন্থন করিয়া তাহার অবসর মুহূর্ত্তগুলিও মধুর আলস্যে কাটাইয়া দিতে পারে কিন্তু মানুষ তাহার পেট ভর্ত্তি থাকিলে শুধু গৃহীত খাদ্যের রোমন্থন করিয়াই সময় কাটাইতে পারে না। সে মুখ তুলিয়া উপরের দিকে চায়, চিন্তা করে, "ফিলসফি" করে, সৃষ্টির কথা জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা, ভগবানের কথা ভাবে; এইখানেই তাহার মনুষ্যত্ব। মূর্ত্ত ভাত কাপড়ের চিন্তা এবং বিমূর্ত্ত ফিলসফি ও জ্ঞান বিজ্ঞান—এই সবটুকু লইয়াই মানুষের জীবন। এই পূর্ণ জীবনের সন্ধান পান নাই বলিয়া টেনিসনের ইউলিসিস্ হাপাইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন—

It little profits that an idle king
By this still hearth among these barrn crags
Matched with an aged wife, I mete and dole
Unequal laws unto a savage race
That hoard and sleep and feed and know me.
I cannot rest from travel.

এটুকই হইতেছে মানুষের কথা, তবে ইউলিসিস্ অভিযান করিতে চাহিয়াছিলেন সমুদ্রের বুকের উপর দিয়া,

আর সাধারণ মানুষ অভিযান চালাইতে চায় জ্ঞান বিজ্ঞানের পথে, পূর্ণতার পথে। শুধু পেটের খোরাকে তাহার মনুষ্যত্বের তৃপ্তি হয় না।

বর্ত্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যার দিকে মাত্রাতিরিক্ততা যদি একটা ত্রুটি হয়, তাহা হইলে ব্যবহারিক হাতে কলমে শিক্ষার অতিশয্য ও তেমনই একটা ত্রুট হইবে। ইউ পির স্বরাষ্ট সচিব (Home Minister) ডাঃ সম্পুরানন্দ বলিয়াছেন।

While overemphasis on literary life is wrong, overemphasis on the cult of the dirty hand, as the euphemism goes, is egqually worng"....the purpose of education cannot be different from the purpose of life itself···to rise to the full height of manhood."

শিক্ষাকে যদি আমরা সত্য সত্যই জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়া তুলিতে চাই, তাহা হইলে এই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সুযোগ তাহাকে দিতে হইবে। এই পূর্ণত্বের মধ্যেই আজ মানুষের চরম পুরুষার্থ।

এই পুরুষার্থের জন্য প্রাচীন ভারতীয়গণ কি ভাবে চিন্তা করিতেন, তাহা আলোচনা করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহারা বলিয়াছিলেন মানুষের পুরুষার্থ হইতেছে ধর্মার্থ কাম মোক্ষ সাধনার মধ্যে।

এই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ কথাটা আমাদের কাছে এত বহুশ্রুত ও পরিচিত যে এটিকে একটা অত্যন্ত সেকেলে জিনিষ বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ বর্ত্তমানের ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধর্ম্মের কথা শুনিলেই যেন আমরা চমকাইয়া উঠি। কাজেই এই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের প্রথম শব্দ 'ধর্ম্ম' এবং শেষ শব্দ 'মোক্ষ'টিকে বাদ দিয়া শুধু 'অর্থ' এবং 'কাম' এই দুইটি শব্দ লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করিব।

এই অর্থ আর কাম এই দুইটি জিনিষকে বর্ত্তমান শিক্ষাতত্ত্বের ভাষায় যদি আমরা প্রকাশ করিতে চাই তাহা হইলে সে দুটি হয় অর্থ বা স্বার্থ-প্রকৃতি (Instinct of self(preservation or self-instinct) এবং কাম প্রবৃত্তি (instinct of preservation of the species)। এই দুইটি জিনিষ শুধু মানুষ কেন, মানুষ ছাড়া ইতর প্রাণীদের মধ্যেও ইহাদের লীলা আছে, এবং তাহা খাদ্যসংস্থান ও প্রজননের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু মানুষ যখন হইতেই সমাজবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতেই সে ব্যক্তিগত অর্থ বা স্বার্থের সঙ্গে (এবং ব্যক্তিগত কামের সঙ্গে) সমাজের অন্যান্য লোকের স্বার্থ (এবং কামের কথা) চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছে। মানুষ ঠেকিয়া শিখিয়া বুঝিয়াছে যে অর্থ বা স্বার্থটাকে আত্মকেন্দ্রিক না করিয়া সমাজ কেন্দ্রিক করিয়া তুলিলে ব্যক্তিরই লাভ হয় বেশী। এই ভাবে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থবুদ্ধি যখন উদার হইয়া সমাজগত স্বার্থবুদ্ধিতে পরিণত হয়, তখনই সৃষ্টি হয় প্রতিযোগিতার স্থানে সহযোগিতা, দাবীর স্থানে দায়িত্ববোধ। ইহাই ধর্ম্মবুদ্ধির গোড়ার কথা।

এই সহযোগিতা দ্বারা, এই দায়িত্ববুদ্ধির দ্বারা, এই ধর্ম্ম বোধের দ্বারা, আমরা জগৎকে আর ও সুখী ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারি। কিন্তু তাহা হইলেও মানুষের জীবনে এমন কতকগুলি দুঃখ আছে যাহা অনিবার্য্য। সেই অনিবার্য্য দুঃখগুলির অর্থাৎ আধি ব্যাধি জন্ম মৃত্যু জরার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই মানুষকে সন্ধান করিতে হইয়াছে মোক্ষপথের।

এই ভাবে প্রাচীন ভারতীয়গণ মানুষের আদিম স্বার্থ প্রবৃত্তি ও কাম প্রবৃত্তি, যাহাকে ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্‌গণ "ইদ্" (Id) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহারই পুরোভাগে ধর্ম্ম বা সামাজিক অধিশাস্তাকে (Social super-ego) রাখিয়া, ধর্ম্মের অভিভাবকত্বে স্বার্থ ও কামকে পরিচালিত করিয়া, "মোক্ষে"র দিকে অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির পথে তাহাদিগকে পরিচালিত করাকেই "পুরুষার্থে"র, তথা শিক্ষা ব্যবস্থার, চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতার মধ্যে যেন "অর্থ ও কাম" টিকেই খুব বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা

এই অর্থ কামকে অস্বীকার করে নাই, তবে ইহাদের আগে ও পরে সম্মুখরক্ষক (Vanguard এবং ও পশ্চাৎ রক্ষক (rear-guard) হিসাবে ধর্ম্ম ও মোক্ষকে সংস্থাপিত করিয়া মানুষের পুরুষার্থকে "ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ" এই চতুর্ব্বর্গ সাধনায় পরিণত করিয়া "অর্থকামের 'অভিযানকে অকল্যাণের পথ হইতে বাঁচাইয়াছে।

শিক্ষাকে জীবনের সহিত সম্পর্কিত করিবার যদি কোনও পথ থাকে, তাহা হইলে সেটা হইতেছে জীবন কে এই চতুর্ব্বর্গের সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়া তুলা, "নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। আমরা জানি প্রত্যক্ষজ (perceptual) অনুভূতি হইতে ধারণাসম্ভূত (conceptual) অনুভূতির দিকে, ব্যক্তি হইতে সমাজের দিকে অহং (ego) হইতে অবিশাস্ত (Super-ego) র দিকে, বর্ত্তমানের স্বার্থ হইতে ভবিষ্যতের স্বার্থের দিকে মূর্ত্ত (concrete) বর্ত্তমান হইতে বিমূর্ত্ত (abstract) ভবিষ্যতের দিকে, বাস্তব (real, হইতে আদর্শের (ideal) দিকে যাত্রা পথই হইতেছে মানুষের অভিব্যক্তির পথ। অবশ্য এই মূর্ত্ত হইতে বিমূর্ত্তের দিকে এগুতে এগুতে মানুষ মাঝে মাঝে মূর্ত্তের সঙ্গে সংযোগ হারাইয়া ফেলিয়া উধাও হইয়া চলিয়া যায়। তখনই তাহাকে টানিয়া নামাইয়া আনিতে হয় মূর্ত্ত মাটীর জগতে। সেই জন্য তাঁহারাই হইতেছেন আদর্শ জ্ঞানী যাঁহারা। Soar but never roam. True to the kindred points of heaven and earth.

শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই wisdom দিতে হইবে। আজ শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যবহারিক সংযোগটা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে, আবার ব্যবহারিক দিকের আতিশয্য হইতে, তথা কথিত cult of the dirty hand এর অতিশয্য হইতেও তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। অলস পাণ্ডিত্য বিলাস যেমন শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নহে, তেমনই নিছক জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থাও শিক্ষার লক্ষ্য নহে। তা ছাড়া শুধু শিক্ষা ভিন্ন যেমন বেকার সমস্যারও সমাধান ও হয় না তেমনই মানুষের সব দুঃখেরও সমাধান হয় না।

বর্ত্তমান কম্যুনিজম একটা দাবীর শ্লোগানের মধ্য দিয়া মানুষের দুঃখের সমাধান খুঁজিতেছে আর অতীতের ভারত দায়িত্ব বুদ্ধির ভিতর দিয়া তার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছে। সে পথটা ভুল পথ ছিল না। কারণ প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের দায়িত্বটাকে পালনন করে, তাহা হইলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দাবীর পাওনাটুকুও পাইয়া যায়, অথচ এই পাইবার জন্য হানা হানি কাড়াকাড়ি ধর্ম্মঘট বিপ্লব প্রভৃতি করিতে হয় না। যুযুৎসু পথ দিয়া যে জিনিষটা আমরা ছিনাইয়া আদায় করিয়া লইতে চাহিতেছি, পূর্ব্বে সেটা আমরা স্নিগ্ধ প্রেমের ও মৈত্রীর পথ দিয়া না চাহিতেই পাইয়াছি।

এতদিন ধরিয়া আমরা যে ধরণের শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে মস্তিষ্ককে আজ মাধ্যমিক-শিক্ষা-কমিশন প্রভৃতি যে সুপারিশ করিতেছেন, তাহাতে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে হাতকে, আর অতীত ভারতের তপোবনে যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল আত্মাকে (Soul)

অতীত ভারতের আদর্শের কথা তুলিয়া, আত্মার প্রাধান্যের কথা তুলিয়া আমরা মানুষকে ধর্ম্মের আফিং খাওয়াইয়া জীবন সংগ্রামে অনুপযুক্ত করিয়া তুলিতে চাহি না, অথবা প্রত্যেক মানুষটিকে সংসারত্যাগী বিশুষ্ক সন্ন্যাসীও করিয়া তুলিতে চাহিতেছি না। তবে ধর্ম্মের সংযমচ্যুত হইয়া মানুষ যে অর্থ ও কামের দাস হইয়া পড়ে, তাহার একটা প্রতিকার চাহিতেছি। আমাদের বিশ্বাস এই প্রতিকারটি করিতে পারিলেই শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হইবে। মানুষের সমাজে আজ ক্রমশঃ যে সমাজনীতির স্থলে 'অরণ্য নীতি' সংক্রমিত হইতেছে, সহযোগিতার স্থলে প্রতিযোগিতা আসিয়া পড়িতেছে, 'দিয়া' খাওয়ার চেয়ে 'কাড়িয়া' খাওয়ার নীতিটা বড় হইয়া উঠিতেছে, ধর্ম্ম বুদ্ধির চেয়ে চালাকি ও সয়তানি বড় হইয়া উঠিতেছে, তাহার একটা প্রতিকার চাই।

উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও মর্য্যাদা দিয়া শিক্ষককে কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ কর।

প্রথম পাঠ

কণা সেনগুপ্ত

শিশু ৫।৬ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ের নূতন জীবনের সাথে তার পরিচয় সুরু করে। ক্রমশঃ চলতে চলতে সে খাপ খাইয়ে নিতে শেখে। শিশু যাতে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে এজন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশ মনোরম হওয়া প্রয়োজন। যে কোন বিষয়ে জ্ঞানদানের পদ্ধতি পরিবেশকে যেমন একদিকে মনোরম করে তুলতে সাহায্য করে, অপরদিকে তেমনি শিশুমনের উপযোগী না হলে পরিবেশকে ইহা ভীতিপ্রদ করে তুলতে পারে। কাজেই শেখাবার পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষককে অবহিত হতে হবে তবে যে কোন পদ্ধতির কথাই বলা হোক্ না কেন, একটি কথা মনে রাখতে হবে যে অবস্থাভেদে পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হতে পারে এবং সেজন্য শিক্ষকের যথেষ্ট মৌলিকত্ব (originality) থাকা প্রয়োজন।

পড়তে শেখাবার ক্ষেত্রে প্রথমে শিশুমনে পড়ার জন্য আগ্রহ বা প্রয়োজনবোধ সৃষ্টি করতে হবে। আগ্রহ বা প্রয়োজন বোধ সৃষ্টি করতে পারলে শিক্ষকের অর্দ্ধেক কাজ এগিয়ে গেল, কারণ শিশু তখন আপনা থেকেই পড়ার দিকে এগিয়ে যাবে। কি ভাবে আগ্রহ বা প্রয়োজনবোধ জাগান যেতে পারে এ বিষয়ে এর আগের প্রবন্ধে বলা হয়েছে। এখানে আলোচ্য বিষয় হ'লে শিশুর মন তৈরী হয়ে গেলে প্রথম পাঠ কি ভাবে সুরু হবে তাই।

পড়তে শেখাবার পদ্ধতির ভেতর বাক্যক্রমিক পদ্ধতি, শব্দক্রমিক পদ্ধতি, বর্ণক্রমিক পদ্ধতি ইত্যাদি নানারকম পদ্ধতির কথাই বলা হয়ে থাকে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে যে বর্ণক্রমিক পদ্ধতি একেবারেই শিশুর মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। বিমূর্ত্ত বিচ্ছিন্ন কতকগুলো বর্ণ শিশু মনে ভয়েরই সৃষ্টি করে বেশী, কারণ ক, খ, গ, ঘ শিশুর কাছে অর্থহীন। একটি পুরো শব্দ বা পুরো বাক্য অর্থপূর্ণ বলে শিশু সেটা অনেক সহজে গ্রহণ করতে পারে। 'ভ' অক্ষরটী শিশুর কাছে নিতান্তই ভয়ের কারণ, তার কাছে এর কোন অর্থ নেই, কিন্তু 'ভাত' বা 'ভয়ই' শিশুর নিতান্ত পরিচিত। শিশুশিক্ষা ক্ষেত্রে মূল নীতিই হ'ল জানা থেকে অজানাতে এগিয়ে যাওয়া। বর্ণক্রমিক পদ্ধতি এ নীতির অনুসরণ করে না বরং বর্ণক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিশু প্রথমেই অজানার সাগরে প'ড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে, সাগর তলের শুক্তির সাথে পরিচয় ঘটবার আগেই তার প্রাণ ওঠে হাঁপিয়ে। কাজেই দেখা যাচ্ছে শব্দক্রমিক বা বাক্যক্রমিক (পদ্ধতি শব্দক্রমিক—শব্দ থেকে বর্ণেতে এগিয়ে যাওয়া; বাক্যক্রমিক—বাক্য থেকে শব্দ ও শব্দ থেকে বর্ণতে এগিয়ে যাওয়া) শিশুর পরিচিত জগত থেকে সুরু হয় বলে অক্ষর-পরিচয়ের ক্ষেত্রে এগুলিই শিশুর মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

এখন প্রশ্ন আসছে, কি ধরণের কার্য্য বা শব্দ নিয়ে শিশুর পড়া সুরু হবে। এর উত্তরে বলা যায় যে, শিশুর দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম ও পরিবেশকে ভিত্তি করে যে সব শব্দ বা বাক্য শিশুকে সর্ব্বদাই ব্যবহার করতে হচ্ছে তার থেকেই সুরু হবে শিশুর প্রথম পাঠ। কৃত্রিম উপায়ে তৈরী বাক্য বা অপরিচিত শব্দ শিশুর কাছে অপরিচিত বর্ণের মত একই সমস্যার সৃষ্টি করবে।

কর্ম্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সর্ব্বদাই এমন কত গুলো বাক্য বা শব্দ শিশুদের ব্যবহার করতে হয় যা দিয়ে কিছু বাক্যের বা শব্দের কার্ড তৈরী করে দিলে কাজের সময় প্রত্যেক দিন নাড়াচাড়ার ফলে সে গুলোর সঙ্গে শিশুর আপনিই পরিচয় হয়ে যায়। যেমন বিদ্যালয়ের কাজ সুরু হবার প্রথমেই মাসের নাম, বারের নাম সম্বলিত কার্ড

"এটা' বৈশাখ মাস", "আজ সোমবার" ইত্যাদি শ্রেণীতে টানিবার ভার শিশুদের দিলে কাজের সঙ্গে সঙ্গে বাক্য গুলির সাথে শিশুদের পরিচয় ঘটে। তেমনি আবার হাওয়ায় খবর সংক্রান্ত কার্ড—"আজ রোদের দিন," "আজ মেঘলা" দিন ইত্যাদি কার্ড শিশুদের টানিতে দিতে প্রায় যায়। তা ছাড়া, উপস্থিতি দেখার পর "—জন এসেছে,—জন আসে নাই," স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর "—জন দাঁত মেজেছে, "—জন দাঁত মাজে নাই" কার্ড ইত্যাদি তৈরী করে কার্ডগুলো শিশুদের টানতে দিয়ে সংখ্যা গুলো পুরণ করতে দিলে প্রত্যেক দিন দেখতে দেখতে এগুলোর সঙ্গে শিশুদের পরিচয় হয়ে যেতে পারে। কাজের যন্ত্রপাতি অথবা শ্রেণীর জিনিষ পত্র যেটা যেখানে রাখা হবে, সে সব জায়গায় যন্ত্রপাতি বা জিনিষের নাম লিখে লেবেল লাগিয়ে রাখলে রোজই শিশুরা সে গুলোর সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে। যেমন ঝুড়ির জায়গাতে "ঝুড়ি," বালতির জায়গাতে 'বালতি', চাটাই রাখবার নির্দিষ্ট জায়গাতে "চাটাই" ইত্যাদি লিখে রাখা যায়। প্রথম শ্রেণীর শিশুদের ব্যক্তিগত নামেরও কার্ড করে শ্রেণীতে সাজিয়ে রাখা চলতে পারে। ব্যক্তিগত সাজ সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি থাকলে সরঞ্জামের নাম ও শিশুর নাম একই সঙ্গে লেখা থাকতে পারে। কতক গুলো কাজের আদেশ মুখে না বলে কার্ডে লিখে, সে কার্ড দেখিয়ে কাজ করতে দিলে কিছুদিন বাদে সে গুলোও শিশুর চেনা হয়ে যাবে, যেমন "দরজা খোল", "আসন পাত' ইত্যাদি।

দৈনন্দিন কাজে শিশু যে গুলোর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, সে গুলো ছাড়া শিশুর পরিচিত পরিবেশ থেকে বা শিশুরা যে সব কাজ করেছে বা করবে তার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে, শিক্ষক বাক্য নির্ব্বাচন করতে পারেন, যেমন "এটি আম," "এটি পাকা আম,' 'এটি কাঁচা আম,' 'পাকা আম ভাল,' 'কাঁচা আম টক," অথবা 'ছবি কেটেছি,' 'ফুলের ছবি কেটেছি,' 'ফুলের ছবি লাল,' ইত্যাদি।

বাক্য নির্ব্বাচনে শিক্ষককে কয়েকটি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। (১) বাক্য শিশুর পরিচিত পরিবেশের বা কাজের সঙ্গে সম্বন্ধিত হওয়া চাই। (২) বাক্য গুলো অক্ষরে ছোট হওয়া চাই। (৩) বাক্য গুলো এমন হবে যেন প্রথম বাক্যের দু একটি শব্দ দ্বিতীয় বাক্যে পুনরুল্লিখিত হয় আবার দ্বিতীয় বাক্যের দু একটি শব্দ তৃতীয় বাক্যে পুনরুল্লিখিত হয়; অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে gradad সে রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহলে একই শব্দ বার বার দেখতে দেখতে শিশুর পক্ষে শেখা সহজ হবে। (৪) যুক্ত অক্ষর প্রথম অবস্থাতে যতটা সম্ভব বর্জন করাই ভাল, যে গুলো খুব স্বাভাবিকভাবে আসে বলে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, শুধু সে গুলোই ব্যবহার করা হবে।

এরপর বাক্যগুলো দিয়ে কার্ড তৈরী করা প্রয়োজন হবে। কার্ড তৈরীর সময় শিক্ষককে মনে রাখিতে হবে যে, (১) কার্ডের লেখা গুলো পরিষ্কার, গোটা হরফে হওয়া চাই, (২) বাক্য গুলোর সঙ্গে ছবি যুক্ত করতে পারলে ভাল হয়, যেমন, এটি আম— বাঁদিকে একটি আমের ছবি ও ডানদিকে বাক্যটি লেখা থাকবে। এটি কাঁচা আম— বাঁদিকে সবুজ রং এর আমের ছবি ও ডানদিকে বাক্যটি লেখা থাকবে। বাক্যের কার্ডের সঙ্গে সঙ্গে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের কার্ড এবং শব্দে ব্যবহৃত অক্ষরের কার্ডও তৈরী করা প্রয়োজন হবে, যেমন—

এটি আম এটি কাঁচা আম এটি পাকা আম	বাক্য
এটি আম কাঁচা পাকা	শব্দ
এ টি আ ম এ টি কাঁ চা আ ম এ টি পা কা আ ম	বর্ণ

এই ধরণের নির্ব্বাচিত বাক্য কয়েকবার অভ্যাস করাবার পরই শিশুরা যাতে ক্লান্তি বোধ না করে এবং আনন্দের সঙ্গে যাতে তারা বাক্যগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়

লাভ করতে পারে, সেজন্য খেলাচ্ছলের অবতারণা করা যেতে পারে। যেমন দু একটি অপরিচিত বাক্যের কার্ড এবং শেখান বাক্যটির আর একটি copy শিশুদের সামনে দেওয়া যেতে পারে। তারা শেখান বাক্যটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে দ্বিতীয় বারে দেওয়া কার্ড গুলোর ভেতর কোনটির সঙ্গে ওদের শেখা বাক্যটী দেখতে এক রকম। বলা বাহুল্য অক্ষর পরিচয় না থাকলেও শিশুরা অপরিচিত বাক্য থেকে পরিচিত বাক্যটি অনায়াসে বের করে দিতে পারে, এ আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। খেলার ছলে অনেক গুলো কার্ড থেকে খুজে বের করতে গিয়ে শিশুরা আনন্দ পায় প্রচুর। যে শব্দগুলো দিয়ে বাক্যটী গঠিত সেই সব শব্দের কার্ড শিশুদের সামনে দিয়ে এবং বাক্যটী সামনে সাজিয়ে শব্দের কার্ড দিয়ে অনুরূপ বাক্য তৈরী করতে দিলে আনন্দের সঙ্গে শিশুরা শব্দগুলো মিলিয়ে বাক্যটী তৈরী করতে পারে। এমন কার্ড যদি তৈরী করে নেওয়া যায় যে বাক্যের দু একটী শব্দ তার ভেতর লেখা নেই, তাহলে সেই কার্ড ও শব্দের কার্ড দিলে শূন্য স্থানটাতে কোন শব্দ বসবে শিশুরা সাজিয়ে দিতে পারে। যেমন ১টী আম, শূন্য স্থানটীতে পাকা অথবা কাঁচা শব্দটী বসিয়ে দিতে হবে এভাবে নানা রকম খেলার অবতারণা করা যায়। অবশ্য সে জন্য শিক্ষকের যথেষ্ট মৌলিকত্ব থাকা প্রয়োজন। অনুরূপ উপায়েই শব্দ থেকে অক্ষরে এগিয়ে যাওয়া যায়। প্রশ্ন উঠিতে পারে, আকার ইকার সমন্বিত অক্ষর গুলো কি ভাবে শিশু শিখবে। এ ক্ষেত্রে উত্তর এই যে, বাক্য নির্ব্বাচনের সময় যেমন দেখতে হবে যে প্রথম বাক্যের দু একটি শব্দ যেন দ্বিতীয়টীতেও পুনরুল্লিখিত হয়, তেমনি দেখতে হবে আকার ইকার গুলো যখন যেটা আসবে সেটার যেন পরের বাক্যে পুনরুল্লেখের সম্ভাবনা থাকে। তা হলে একই শব্দ বা একই অক্ষর বার বার দেখার ফলে যেমন শিশুর পক্ষে দেখা সহজ হবে তেমনি করেই ি ী ইত্যাদি বারবার দেখার ফলে শিশুর পক্ষে শেখা সহজ হবে। বলা বাহুল্য বাক্য থেকে শব্দ এবং শব্দ থেকে অক্ষরে এগিয়ে যাবার সময় প্রথমে শিক্ষককেই সবগুলির সাথে শিশুর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এ পরিচয় শিশুর কাছে ভীতিপ্রদ হবে না, কারণ 'আ' অক্ষরটী তার কাছে অর্থহীন, কিন্তু আম শব্দটী অর্থহীন নয়। তাই 'আম' কে ভেঙ্গে 'আ আর 'ম' তে যখন সে এগিয়ে যাবে তখন তার সাধের আম যে অক্ষর দিয়ে তৈরী হয়েছে তার প্রতি তার আর বিতৃষ্ণা থাকবে না।

এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, বাক্য থেকে শব্দ এবং শব্দ থেকে অক্ষরে এগিয়ে যাওয়া একদিনে সম্ভব হবে না। অবস্থা বিশেষে বাক্য বাদ দিয়ে শব্দ এবং শব্দ থেকে অক্ষরে এগিয়ে গিয়েও অক্ষর পরিচয় করান যায়। কিন্তু প্রথমেই অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় করান একেবারেই মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়।

বাক্যক্রমিক বা শব্দক্রমিক পদ্ধতির অনেকে সমালোচনা করে থাকেন যে এতে অযথা সময় নষ্ট হয় এবং শিশুরা অ, আ ই ঈ ইত্যাদির সহজ রূপের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পায় না। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সময়ের হিসেবের চাইতে শিশুমনে আনন্দ বিধান করা অনেক বেশী প্রয়োজনীয় কারণ আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা সুরু হলে প্রথমদিকে সময় বেশী লাগলেও পরিণামে শিশুদের সহজে এবং কম সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে, সুতরাং সহজের প্রশ্ন কোন প্রশ্নই নয়। দ্বিতীয় সমালোচনা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, শিশু প্রথমে যদি 'আ' এর পর ই না শিখে 'ম' ই শিখে থাকে তাতে ক্ষতি কি? সব অক্ষর শেষ হয়ে গেলে দেখা যাবে শিশু 'ই,' র সঙ্গেও যতটা পরিচিত হয়েছে। 'ম' এর সঙ্গেও ততটা পরিচিত হ'য়েছে। তবে বাংলা অক্ষরগুলির ব্যাকরণগত দিক থেকে এ ভাবে সাজাবার বিশেষ ভঙ্গীটি সর্ব্বজন স্বীকৃত। কাজেই শিশুকে তার সঙ্গে পরিচয় করবার এক সময়ে দরকার হবেই। এজন্য অক্ষর পরিচয় হয়ে গেলে প্রথম শ্রেণীর মাঝা মাঝি সময় থেকে শিশুদের দিয়ে যদি অভিধান তৈরী করান যায় তবে অক্ষরের বিশেষ সাজান-

শিক্ষা ও সমাজ সমস্যা

আগেকার দিনে এবং কিছু দিন পূর্ব্বপর্য্যন্ত শিশু এবং বালক বালিকা দিগকে শাস্তি দেওয়া একটি অতি সাধারণ প্রচলিত ব্যাপার ছিল ; শিক্ষার জন্য ইহাকে সর্বজন-স্বীকৃত এবং অপরিহার্য মনে করা হইত। বেত্রাঘাত সম্বন্ধে ডকটর আর্ণল্ড কি অভিমত পোষণ করিতেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার সময়ে ডকটর আর্ণল্ডের অভিমত অতি কোমলতাপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত। শিশুকে তাহার নিজের স্বভাব ও প্রকৃতি অনুসারে বাড়িয়া উঠিতে দিবার নীতি প্রচার করেন রুশো। তথাপি তিনিও "এমিল" (Emile) গ্রন্থ কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তি দানের অনুকূলে অভিমত দিয়াছেন। একশত বৎসর পূর্ব্বে শিশুর শাস্তি বিধান সম্পর্কে কিরূপ ধারণা ছিল তাহা তখন কার সতর্ককারী এক গল্পে বর্ণিত আছে। ছোট্ট একটি মেয়েকে সাদা জামা পরাইয়া দেওয়া হইতেছে কিন্তু সে জেদ ধরিয়াছে ফিকে লাল রঙেরটি পরিবে। তাহার অবাধ্যতার ফল কি হইল ?

বহির্বাটি থেকে এবে বাবা শুনিলেন যবে
খুকুর তর্জন ক্রন্দন ;
তখনি রাগের বশে ভিতরে ছুটিয়া এসে
বেত্রাঘাতে করেন দমন।

The Fair Child Family পুস্তকে বর্ণিত আছে মিঃ ফেয়ার চাইল্ড তাঁহার ছেলে মেয়ে দিগকে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করিতে দেখিলে বেত মারিতেন আর তালে তালে কবিতা আবৃত্তি করিতেন 'কুকুর মাতুক আনন্দে কামড়ে গর্জনে' (Let dogs delight to back and bite)। তারপর ফাঁসির কাষ্ঠের সঙ্গে ঝুলানো মৃত দেহ দেখানোর জন্য লইয়া যাইতেন, বাতাসে মৃত দেহটি নড়িত, শিকলের ঝন ঝন শব্দ হইত ; ছেলে মেয়েরা ভয়ে জড় হইয়া তাহাদিগকে বাড়িতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে অনুরোধ করিতে থাকিত। কিন্তু মিঃ ফেয়ার-চাইল্ড তাহাদিগকে বহুক্ষণ সেই বীভৎস দৃশ্য দেখিতে বাধ্য করিতেন এবং বলিতেন, যাহাদের অন্তরে ঘৃণা আছে তাহাদের এই দশাই হয়। পিতার ইচ্ছা ছিল

(১১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ভঙ্গীটীর সঙ্গে শিশু পরিচিত হতে পারে। অভিধান তৈরী শুনে অনেকেই হয়তো আঁৎকে উঠছেন। এ অভিধান 'মুখ-লের' ও নয়, 'চলন্তিকা'ও নয় সুতরাং চিন্তিত হবার কোনই কারণ নেই। প্রথম শ্রেণীর শিশুরা 'ক' দিয়ে যত স্থানের শব্দ জানে নীচে নীচে তা লিখলো এবং যে শব্দ গুলোর ছবি আঁকা চলতে পারে সে শব্দের ছবি ও পাশে পাশে আকলো। ছবির বিচার অবশ্য হবে শিশুর শক্তি বিবেচনা করে। ক এর পর এল খ দিয়ে শব্দ,—এ ভাবে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ দুই দিয়েই শব্দ সাজিয়ে অভিধান হতে পারে—

নমুনা :—

ক

কল—ছবি

কলম—ছবি

খ

খড়ম—ছবি

খরগোস—ছবি

গ

গরু—ছবি

গাধা—ছবি

ঘ

ঘাড়—ছবি

ঘণ্টা—ছবি

এ ভাবে অক্ষর অনুযায়ী শব্দগুলো সাজিয়ে গেলে অক্ষরের সাজান রূপের সঙ্গে পরিচয় শিশুর কাছে নিতান্তই সহজ হয়ে উঠবে।

ছেলেকে ধর্মযাজক করা; এবং এই উদ্দেশ্যেই হয়তো তাহাকে এমন শিক্ষা দেওয়ার দরকার ছিল যাহাতে সে পাপীর অপরাধ যে কিরূপ ভীষণ হয় সে সম্বন্ধে পরে প্রত্যক্ষ দর্শীর মত জলন্ত বর্ণনা দিতে পারে। বর্ত্তমান যুগে এরূপ শাস্তি কেহই সমর্থন করিবে না। কিন্তু ইহার পরিবর্তে কিরূপ শাস্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত সে সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। কেহ কেহ এখনো ভালমত শাস্তি দানের পক্ষপাতী, আবার কেহ কেহ মনে করেন ইহার কোন প্রয়োজন নাই। এ দুইটিই চরম অভিমত।

আমার মনে হয় শিক্ষায় শাস্তির প্রয়োজন আছে, তবে ইহার স্থান খুব কম; আর কঠোর শাস্তি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমার মতে ধমক দেওয়া বা তিরস্কার করাও শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। যদি কখনো কঠোর শাস্তির প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার জন্য স্বাভাবিক ক্রোধ প্রকাশই যথেষ্ট হওয়া উচিত। কয়েকবার তাহার ছেলে আমার ছোট বোনের উপর রূঢ় ব্যবহার করিলে তাহার মা রাগিয়া বিরক্তির সঙ্গে জোরে ধমক দেন। ইহাতেই সুফল ফলিল। ছেলে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং তাহার মা তাহাকে আদর না করা পর্য্যন্ত সে শান্ত হইল না। পরে ছোট বোনের সঙ্গে তাহার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল ক্রোধের সুফল তাহার মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করিয়াছে। আমরা কোন জিনিস না চাহিলেও সে যখন ইহার জন্য জেদ করিয়াছে কিম্বা তাহার ছোট বোনের খেলায় বিঘ্নসৃষ্টি করিয়াছে, তখন তাহাকে মৃদু আকারে শাস্তি দিতে হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে ভালভাবে বুঝাইলেও কোন ফল না হইলে আমরা তাহাকে একটি ঘরে একাকী রাখিয়া আসিতাম। ঘরের দরজা খোলা থাকিত; তাহাকে বলা হইত সে ভাল হইলেই যেন ঘর হইতে চলিয়া আসে। কয়েক মিনিট সে খুব জোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিত তারপর শান্ত হইয়া বাহির হইয়া বুঝিত যে বাহিরে আসায় সে শান্ত আচরণের সর্ত্ত মানিয়া চলিয়াছে। আমাদিগকে ইহার চেয়ে কঠোরতর শাস্তি প্রয়োগ করিতে হয় নাই।

যাহারা কঠোর শাস্তি দিয়া শিশুকে শায়েস্তা করিতে চাহিতেন এমন প্রাচীনপন্থী শৃঙ্খলা বিধানকারী ব্যক্তিদের বই পড়িয়া বোঝা যায় যে, বর্তমান প্রণালীতে শিক্ষিত শিশুদের অপেক্ষা প্রাচীন প্রণালীতে শিক্ষিত শিশুরা অনেক বেশী দুষ্ট ছিল। The Fair Child Family পুস্তকে শিশুদের যেরূপ আচরণের কথা উল্লেখ করা আছে আমার ছেলে তাহার অর্দ্ধেক খারাপ আচরণ করিলেই আমি স্তম্ভিত হইব। এরূপ ক্ষেত্রে আমি মনে করিব ছেলের চেয়ে ছেলের পিতা মাতার দোষই বেশী। আমি বিশ্বাস করি যে বিচারবুদ্ধি বিশিষ্ট পিতা মাতাই অনুরূপ সন্তান গড়িয়া তুলিতে পারেন শিশুদের জীবন গঠনের পক্ষে পিতা মাতার স্নেহ বিশেষ প্রয়োজনীয়। সন্তানের প্রতি শুষ্ক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সন্তানগণ বোঝে না বা তজ্জন্য কৃতজ্ঞও থাকে না তাহারা চায় জনক-জননীর অন্তর নিঙড়ানো মধুর স্নেহ। শিশুকে ভালভাবে গাড়য়া তুলিতে হইলে তাহাকে বুঝিতে দিতে হইবে যে, সে পিতা মাতার স্নেহের অধিকারী। ইহা ছাড়া তাহাকে কোন কাজ বা আচরণ হইতে বিরত থাকিতে বলিলে অথবা কোন কাজ করিতে নিষেধ করিলে, সম্ভব অসম্ভব না হইলে, ইহার কারণ তাহার নিকট যথাযথ ভাবে বুঝাইয়া বলা উচিত। খেলাধুলা করিতে গেলে অনেক সময় ছোটখাট আঘাত লাগে হাত-পা, কাটে বা ছাল উঠিয়া যায়; এরূপ ঘরং ঘটিতে দেওয়া ভাল তথাপি শিশুদিগকে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটির খেলা হইতে নিবৃত্ত করা উচিত নয়। এরূপ কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে যে, নিষেধ মানিয়া চলা বুদ্ধিমানের কাজ। সেখানে প্রথম হইতেই শিশুরা এইরূপ অবস্থার মধ্যেদিয়া শিক্ষা পাইতে থাকে যেখানে গুরুতর শাস্তি প্রাওয়ার যোগ্য কোন কাজ তাহারা করিবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

শিশু যখন জেদ করিয়া ক্রন্দনরতই অন্য শিশুদের খেলায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে থাকে কিম্বা অন্যদের আনন্দে বাধা দেয় তখন শাস্তি স্বরূপ তাহাকে অপর শিশুদের কাছ হইতে পৃথক করিয়া সরাইয়া রাখা উচিত। এরূপ কোন শাস্তি দিতেই হইবে কেন না একজনের দুষ্টামির জন্য অন্য সকলের আনন্দে বিঘ্ন হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু

দিবার কিন্তু প্রয়োজন নাই যাহাতে সে যে বিশেষ দোষী সেই ভাব তাহার মনে হয়। সে যদি বুঝিতে পারে যে, অন্যেরা যে আনন্দ ভোগ করিতেছে সে তাহা হইতে বঞ্চিত তবেই যথেষ্ট। এরূপ ক্ষেত্রে মাডাম মন্তেসারি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন :

"আমরা অনেক সময় এমন শিশুদের সংস্পর্শে আসিয়াছি যাহারা কোন রকম সংশোধনে বা উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া অন্যের আনন্দে উৎপাত সৃষ্টি করিয়াছে। এরূপ শিশুকে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়। যখন দেখা যায় যে তাহাদের কোনরূপ শারীরিক অসুস্থতা নাই, তখন তাহাকে ধরিয়া কোণে ছোট একটি টেবিলে বসাইয়া অন্যের নিকট হইতে দূরে পৃথক করিয়া রাখা হয়। তাহাকে ছোট একটি হাত-ওয়ালা আরাম চেয়ারে এমন ভাবে একটু উঁচুতে বসানো হয় যাহাতে সে অন্য ছেলেমেয়েদের খেলা দেখিতে পারে। যে সব খেলনা সে সব চেয়ে বেশী পছন্দ করে, তাই তাহাকে খেলিতে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া প্রায় সকল ক্ষেত্রে শিশুকে শান্ত করিয়াছে। পৃথক স্থানে বসিয়া থাকিয়া সে অন্য সাথীদের খেলা দেখিতে পায় এবং তাহা তাহার নিকট বস্তুপাঠের (object lesson) মত কাজ করে। শিক্ষকের মৌখিক উপদেশ অপেক্ষা ইহা বেশী কার্যকরী হয়। ধীরে ধীরে সে অন্য সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া খেলার সুবিধা উপলব্ধি করিতে পারে, সে নিজেই সকলের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চায়। এই ভাবে যে সব শিশু প্রথমে আমাদের শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে সক্ষম হইয়াছি। পৃথক করিয়া রাখা শিশুর প্রতি সর্বদা বিশেষ যত্ন লওয়া হইত, যেন সে পীড়িত। আমি নিজে কক্ষে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তাহার কাছে যাইতাম, যেন সে অতি কচি শিশু। তারপর আমি অন্যদের প্রতি দৃষ্টি দিতাম, তাহাদের খেলায় কৌতূহল দেখাইতাম, তাহারা যেন ছোট ছোট বয়স্ক ব্যক্তি এই ভাবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতাম। যাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিয়া শাস্তি দিতে হইত, তাহাদের মনে কি হইত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাদের আচরণের পরিবর্তন হইত স্থায়ী এবং সম্পূর্ণ। কেমন করিয়া কাজ করিতে হয়, কেমন করিয়া অন্যের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হয়,—ইহা শিখিতে তাহারা রীতিমত গর্বরোধ করিত। তাহারা অন্য শিক্ষায়িত্রী এবং আমার প্রতি সর্বদা প্রীতির ভাব দেখাইত।"

যে যে কারণের জন্য, এই প্রণালীতে সুফল পাওয়া যায়, তাহা আগেকার দিনের স্কুলে ছিল না। কোনরূপ অসুস্থতার জন্য শিশু খারাপ ব্যবহার করিতে সুরু করিলে এখন তাহাকে সরাইয়া পৃথক করিয়া রাখা হয়। তারপর এ প্রণালী প্রয়োগ করার কৌশল ও নিপুণতা তো আছেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব চেয়ে বড় কথা হইল, বেশীর ভাগ শিশুর শৃঙ্খলা মানিয়া চলার স্পৃহা। অবাধ্য শিশু একাই যেন জগতের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিন্তু ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। কিন্তু যে স্কুলে শ্রেণীর সকল ছাত্রই হৈ চৈ করিয়া শৃঙ্খলা অমান্য করিতে উৎসুক, সেখানে শিক্ষককে এক সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষকের কি প্রণালী অবলম্বন করা উচিত তাহা আলোচনা করিতে চাই না, কেন না প্রথম হইতে শিশুকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা দিলে শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষে এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টিই হইবে না।

তোষামোদ করিয়া শিক্ষাদান

শিশুরা শিক্ষণীয় বিষয় শিখিতে চায় তবে বিষয়টি শিখিবার উপযুক্ত হওয়া চাই এবং উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দেওয়া চাই। শৈশবে খাওয়ান ও ঘুমপাড়ানোর ব্যাপারে যে ভুল, শিক্ষা দানের ব্যাপারেও সেই ভুল করা হইয়া থাকে। শিশুর পক্ষে যাহা করা উপকারী তাহার জন্য তাহাকে এমন তোষমোদ করা হয় যে সে ভাবে সে বুঝি তদ্বারা বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে কৃতার্থ করিতেছে। শিশুদের মনে অতি সহজেই এই ধারণা আসে যে বয়স্ক ব্যক্তিরা চাহেন বলিয়াই তাহারা খায় এবং ঘুমায়। আহার ও নিদ্রায় কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখাইলে অভিভাবকগণ ব্যস্ত হইয়া পড়েন, শিশুর অহমিকাবোধ তৃপ্ত হয়। এই অবস্থার বাড়াবাড়ি ঘটিলে

শিশুর পরিপাক ক্রিয়া ও নিদ্রা দুইই ব্যাহত হয় এবং সে রুগ্ন হইয়া পড়ে। পরিচারিকা আমার ছেলেকে খোসামোদ করিয়া খাওয়ানো অভ্যাস করিয়াছিল, ইহার ফলে ক্রমেই সে জেদী হইয়া উঠিতে ছিল। একদিন দুপুরে তাহাকে আহার করিতে ডাকিলে সে পুডিং খাইতে অস্বীকার করিল। কাজেই ইহা রাখিয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই খাবার চাহিল কিন্তু তখন দেখা গেল পাচক তাহা খাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে সে সংযত হইয়া গেল এবং পরে আর কখনো আমাদের কাছে রাগের ভান করে নাই। শিক্ষা ব্যাপারে ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। যদি কেহ শিক্ষা নিতে না চায় তাহাকে বাদ দেওয়া উচিত। তবে দেখিতে হইবে পাঠদান হইতে সে যতক্ষণ অনুপস্থিত থাকিবে ততক্ষণ যেন আনন্দে সময় কাটাইতে না পারে। সে যদি অন্যকে শিখিতে দেখে, তাহা হইলে শীঘ্রই নিজেও শিখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। শিক্ষক তখন তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন; কাজটি এমনভাবে করিতে হইবে যেন শিশু বুঝিতে পারে যে সে নিজেই উপকৃত হইতেছে, অপর কাহাকেও কৃতার্থ করিতেছে না। আমি স্কুলে একটি করিয়া বড় খালি কক্ষ রাখার পক্ষপাতী যাহাতে অনিচ্ছুক ছেলেদিগকে সেখানে পাঠান হইবে; একবার সেখানে গেলে সে দিন আর তাহাকে শ্রেণীতে ফিরিতে দেওয়া হইবে না। পাঠের সময় খারাপ ব্যবহার করিলে শাস্তি স্বরূপ তাহাদিগকে শূন্য কক্ষে নির্বাসন করিতে হইবে। সাধারণ নীতি এই যে, অপরাধীকে এমন শাস্তি দিতে হইবে যাহা সে পছন্দ করে না। তথাপি ছাত্রের মনে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি প্রীতি জন্মাইবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ পুস্তক হইতে লেখা নকল করার শাস্তি প্রদান করা হইয়া থাকে।

প্রশংসা ও নিন্দা

ছোট খাট রকমের অপরাধের জন্য (যেমন আচরণের অশোভনতা ইত্যাদি) মৃদু রকমের শাস্তির উপযোগিতা আছে। প্রশংসা ও নিন্দা ছোট শিশুদের এবং বয়স্ক বালক বালিকাদের পক্ষেও পুরস্কার ও শাস্তি হিসাবে বিশেষ প্রয়োজনীয়। যিনি ছোটদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন এমন লোক যদি প্রশংসা বা নিন্দা করেন তবে ইহার গুরুত্ব আরো বাড়ে। প্রশংসা ও নিন্দা ব্যতীত শিক্ষাদান কার্য চলে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না, তবে ইহা প্রয়োগ করিতে কিছুটা সতর্কতা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, প্রশংসা বা নিন্দা তুলনামূলক ভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কোন শিশুকে বলা ঠিক হইবে না—'তুমি অমুকের চেয়ে ভাল করিয়াছ' বা 'অমুকে অমুকে মোটেই খারাপ নয়'। প্রথমটির ফল স্বরূপ তাহার মনে অবজ্ঞার ভাব উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় শত্রুতার সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দার প্রয়োগ কম করা দরকার। শিশু কোন অশোভন আচরণ করিলে শাস্তি স্বরূপ ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে; ফল পাওয়া গেলে উহার প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই।

তৃতীয়তঃ, যে কাজে বিশেষ কৃতিত্ব নাই, তাহার জন্য প্রশংসা করা অনুচিত। সাহস কিম্বা নূতন কৌশল প্রদর্শনের জন্য অথবা নিজের জিনিষ সম্বন্ধে কোন প্রকার নিঃস্বার্থপরতা দেখাইলে শিশুর নৈতিক শক্তির প্রকাশকে উৎসাহ দিবার জন্য প্রশংসা করিতে হইবে। শিক্ষা ব্যাপারে ছাত্র অনন্যসাধারণ ভাল কিছু করিলে তাহাকে প্রশংসা করা একান্ত আবশ্যক।

কঠিন কোন কাজ সম্পন্ন করায় জন্য প্রশংসাপ্রাপ্তি তরুণদের নিকট অতি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা; প্রশংসা লাভের কামনা তাহাদের কাজে প্রেরণা যোগায়, যদিও ইহা প্রধান উদ্দেশ্য নয়। কাজের প্রতি অনুরাগ ও নিষ্ঠাই প্রেরণার মূল উৎস হওয়া উচিত।

নিষ্ঠুরতা

চরিত্রের গুরুতর দোষগুলি, যেমন নিষ্ঠুরতা, শাস্তি দিয়া সংশোধন করা যায় না; তাহার জন্য শাস্তি প্রয়োগ করিলেও পরিমাণ খুব কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা ছেলেদের মধ্যে কম বেশী স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায়; ইহা প্রতিরোধ করার জন্য যথা সময়ে শিক্ষার প্রয়োজন। আপনি যদি মনে করেন, ছেলেকে যখন কোন প্রাণীর উপর নির্যাতন করিতে দেখিবেন, তখন তাহাকে

শাসন করিবেন, তবে ভুল করা হইবে। এরূপ করিলে সে যাহাতে পরে আপনার নজরে না পড়ে সেই চেষ্টা করিবে। শিশুর যে ভাবটি পরে হয়ত নিষ্ঠুরতার পরিণত হইতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রথম অবস্থাতেই তাহা দূর করা প্রয়োজন। ছেলেকে অপরের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা শিখান; সে যেন আপনাকে কোন প্রাণী, এমন কি ফোলতা বা সাপও হত্যা করিতে না দেখে। যদি তাহা সম্ভবপর না হয়, তবে কোন্ কোন্ প্রাণী কেন হত্যা করা হয় তাহা সহজভাবে শিশুকে বুঝাইয়া দিন। সে যদি অপর ছোট শিশুর প্রতি নির্দয় ব্যবহার করে, আপনিও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি সেইরূপ করুন। সে প্রতিবাদ করিবে; আপনি তখন তাহাকে বুঝাইবেন যে, সে যদি ইহা পছন্দ না করে, অন্যের প্রতিও তাহার নিষ্ঠুর আচরণ করা সঙ্গত নহে। এই ভাবে অন্যেরও যে তাহার মতই সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে তাহা সে বুঝিতে পারিবে।

নিষ্ঠুরতা নিবারণের উপায়

শিশু অন্যের উপর নিষ্ঠুর আচরণ করিলে তাহার উপরও অনুরূপ আচরণ করিয়া যদি তাহার নিষ্ঠুরতার মনোভাব দূর করিতে চান, তবে এ প্রণালী প্রথম হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। ইহার কারণ স্পষ্ট। অন্যের উপর নির্দয়তার প্রতিদানে শিশুর উপর যে অনুরূপ নির্দয় ব্যবহার করিবেন, তাহা তো গুরুতর হওয়া চলিবে না।

যখনি নিষ্ঠুরতার প্রতিদানে নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করিবেন শিশু যেন বুঝিতে পারে আপনি রাগিয়া তাহাকে শাস্তি দিতেছেন না, তাহার শিক্ষার জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহাকে বলিতে পারেন-,দেখ তোমার ছোটবোনকে তুমি এমনিভাবে কষ্ট দিয়েছ। আঘাত পাইয়া ছেলে প্রতিবাদ করিবে। তখন আপনি বলিবেন—'বেশ, তোমার যদি ইহা ভাল না লাগে,অন্যের ওপরেও তো তোমার এরূপ করা উচিত নয়'। এইরূপে শিশু যদি সঙ্গে সঙ্গে সহজভাবে শিক্ষা পায়, তবে তাহার এই ধারণা হইবে যে, অন্যের সুখদুঃখ বোধকে মানিয়া চলা উচিত। ইহার ফলে কখনো গুরুর নিষ্ঠুরতার উদ্ভব হইবে না।

নৈতিক উপদেশ

নৈতিক উপদেশসকল ঠিক [illegible] এবং বস্তু-সাপেক্ষ ভাবে (concrete) প্রয়োগ করা উচিত। শিশুকে উপদেশ দিবার জন্য আপনি ইচ্ছা করিয়া কোন ঘটনার অবতারণা করিবেন না। স্বাভাবিক ভাবে কোন ঘটনা ঘটিলে তখন তাহার সুযোগ লইবেন। মনে রাখিতে হইবে, একটি মাত্র সুযোগ অবলম্বন করিয়, ব্যাপকভাবে নানা উপদেশ দিলে কোন ফল হইবে না। কোন একটি বিশেষ ঘটনায় শিশু যে উপদেশ পাইবে পরে অনুরূপ কোন ক্ষেত্রে সে নিজেই উহা প্রয়োগ করিতে পারিবে। কোন্‌গুলি মানুষের সদ্‌গুণ এবং কি ভাবে তাহা প্রকাশ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে সাধারণ নীতি জানিয়া তাহা অনুসরণ করা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কোন বিশেষ অবস্থায় কিরূপ আচরণ করিতে হয় তাহা জানাই বরং তাহার পক্ষে সহজ। পরে অনুরূপ অবস্থা ঘটিলে সে পূর্বের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যথাযথ আচরণ করিতে পারিবে।

সাহসী হও, দয়ালু হও, সাধারণ ভাবে এরূপ উপদেশ দিবেন না, বরং কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তাহাকে সাহস দেখাইতে উৎসাহ দিন; পরে বলুন—'বেশ! এই তো তুমি সাহসী ছেলে,' তাহার খেলনাটি তাহার ছোট ভাই বা বোনকে খেলিতে দিতে বলুন। খেলনা পাইয়া শিশু যখন আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিবে, তখন খোকাকে বলুন-'এই তো তুমি ঠিক কাজ করেছ। খোকার বেশ দয়া আছে।' নিষ্ঠুরতা নিবারণ করিতেও এই নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিবেন কখনো ইহার সূচনা দেখিতে পান কিনা; নির্দয়তার ভাব বাড়িতে না দিয়া অঙ্কুরে ইহা নিবারণ করিতে হইবে।

সকল রকম চেষ্টা সত্ত্বেও যদি বয়স বাড়িলে শিশুর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়, তবে রোগের মত ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। হাম যা অন্য কোন প্রকার রোগ হইলে

শিশুকে যেমন অপ্রীতিকর অবস্থা ভোগ করিতে হয়, এক্ষেত্রেও তেমনি ভোগ করিতে হইবে ; শিশু যে অপরাধী এবং দুষ্ট হইয়াছে, এমন ভাব তাহার মনে জন্মাইবার প্রয়োজন নাই, কিছু সময়ের জন্য তাহাকে অন্যান্য বালক বালিকা এবং প্রাণীর নিকট হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে ; তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে, অপরের সঙ্গে তাহাকে মিশিতে দেওয়া নিরাপদ নয়। তাহার প্রতি অন্যে নির্দয় ব্যবহার করিলে তাহার কি দশা হইত তাহাও শিশুকে যথাসম্ভব বুঝান উচিত। তাহাকে ইহা উপলব্ধি করাইতে হইবে যে, নির্দয়তার আবেগ তাহার দুর্ভাগ্যের সূচনা করিতেছে এবং তাহার বয়োজ্যেষ্ঠরা তাহাকে ভবিষ্যতে ইহা হইতে রক্ষার চেষ্টাই করিতেছেন। আমার বিশ্বাস, অল্প কিছু মনোরোগ-বিশিষ্ট শিশু ছাড়া অন্য সকলের পক্ষেই এ প্রণালী সুফল প্রদান করিবে।

দৈহিক শাস্তির কুফল

দৈহিক শাস্তিদানকে আমি কখনই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করি না, তবে মৃদু আকারে দিলে ইহা বিশেষ ক্ষতি করে না, যদিও ভালও কিছু করে না ; কঠোর আকারে দিলে ইহা নির্দয়তা সৃষ্টি করে। ইহা সত্য যে শাস্তিদাতার প্রতি অনেক সময় শিশুর ক্রোধের উদ্রেক হয় না। যেখানে শিশুকে প্রায়ই শাস্তিভোগ করিতে হয়, সেখানে সে ইহাকে স্বাভাবিক মনে করে এবং নিজেকে ইহার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নেয়। কিন্তু ইহা তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে যে, কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য এরূপ দৈহিক শাস্তি প্রদান করা ন্যায়সঙ্গত। যে শিশু বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হইয়া কর্তৃত্ব করিবে, তাহার পক্ষে এ শিক্ষা বিপজ্জনক।

তাহা ছাড়া পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে খোলাখুলি সরল বিশ্বাসের সম্বন্ধ থাকা উচিত, শাস্তির কঠোরতা তাহা নষ্ট করিয়া দেয়। আধুনিক পিতা চান তাঁহার পুত্রকন্যা তাঁহার উপস্থিতিতে নিঃসংকোচে অবস্থান করুক ; তাঁহাকে আসিতে দেখিলে তাহারা যেন খুশী হয়—তিনি ইহা চান। তিনি যতক্ষণ উপস্থিত আছেন ততক্ষণ সবাই মিথ্যা ভয়ে সংকোচে (কাচুমাচু হইয়া) চুপ চাপ থাকিবে আর আড়ালে গেলেই নরকের তাণ্ডব সুরু করিবে—ইহা পিতার নিকট বাঞ্ছনীয় নয়। শিশুদের অকৃত্রিম প্রীতি লাভ করা জীবনের যে কোন বড় আনন্দ লাভের মতই লোভনীয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই আনন্দ কি জানিতেন না, কাজেই তাঁহারা কি হারাইতেছিলেন তাহাও বুঝতেন না। তাঁহারা সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতেন যে পিতামাতাকে ভালবাসা তাহাদের কর্তব্য কিন্তু কার্য্যত এই কর্তব্য পালন করা এক রকম অসম্ভব করিয়া তুলিতেন। এই অধ্যায়ের প্রথমে কবিতার যে মেয়েটীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার পিতা যখন বেত্রাঘাতে তাহাকে দমন করিতে আসিতেন, তখন সে নিশ্চয়ই খুশী হইত না। যতদিন পর্য্যন্ত লোকে বিশ্বাস করিত যে হুকুম করিয়া ভালবাসা আদায় করা সম্ভব, ততদিন তাহারা শিশুদের অকৃত্রিম প্রক্ষোভ (emotion) হিসাবে স্নেহপ্রীতি লাভ করিতে চেষ্টা করে নাই। ইহার ফলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল কঠোর, রূঢ় ও নির্দয়। শিশুর শাস্তি বিধান এই সমগ্র মনোভাবের সংঙ্গে সংযুক্ত এবং এই মনোভাব দ্বারাই পুষ্ট। ইহাই বিস্ময়ের ব্যাপার যে,যে সকল লোক কোন স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে হাত তোলার কথা কল্পনাও করিতে পারিত না, তাহারাই অসহায় অরক্ষিত শিশুর উপর দৈহিক নির্য্যাতন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। সৌভাগ্যের কথা এই যে, গত একশত বৎসরের মধ্যে পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইহারই ফলে শাস্তির নীতিই আগাগোড়া পালটাইয়া গিয়াছে। আমি আশা করি, শিক্ষাক্ষেত্রে যে উন্নতির ভাবধারার প্রবর্তন হইয়াছে তাহা ক্রমে মানুষের অন্যান্য কর্মক্ষেত্রেও প্রসারিত হইবে, কারণ আমাদের শিশুদের সহিত ব্যবহারে যেমন, অন্যত্রও তেমনি উহার বিশেষ প্রয়োজন আছে।*

---

*বার্টারাণ্ড রাসেলের 'শাস্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ। অনুবাদক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র।

বংশগতি সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় আমাদের জানিয়া রাখা উচিত। সংক্ষেপে এখানে তাহাই বলিব।

বংশগতির নিয়মানুযায়ী সন্তানেরা পিতামাতার সদৃশ হয়। তাই বলে, বাপকা বেটা," অথবা "যেমন মা তেমন ছা"—ঠিক কথা নয়। সন্তানেরা হুবহু পিতা বা মাতার কারুর মতই হয় না।

বংশগত গুণ শুধু পিতামাতা থেকেই সন্তানে বর্ত্তায় না। পিতা ও মাতার যাঁরা পূর্ব্বপুরুষ, তাঁদের গুণও উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানে দেখা দেয়। পূর্ব্বপুরুষদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্টভাবে বেড়ে যায়—যেমন প্রথম পূর্ব্বপুরুষ—২ (পিতা ও মাতা); দ্বিতীয় পর্য্যায়ের পূর্ব্বপুরুষের সংখ্যা ৪, তার পরের পর্য্যায়ে ৮, তার পরের পর্য্যায়ে ১৬, এই রকম ভাবে বাড়তে বাড়তে চলে। বংশানুক্রম সম্বন্ধে গ্যালটন (Galton)এর সূত্র হচ্ছে, সন্তান পিতামাতার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তার $\frac{1}{2}$ গুণ পায়, পিতামহের ও পিতামহীর পর্য্যায় থেকে $\frac{1}{4}$, তার পূর্ব্বপর্য্যায় থেকে $\frac{1}{8}$, তার পূর্ব্বপর্য্যায় থেকে $\frac{1}{16}$ গুণ পায়।

কখনো কখনো কোনো সন্তানে অনেক পূর্ব্বপর্য্যায়ের কোন গুণও হঠাৎ আবার দেখা দেয়। যেমন, হঠাৎ একটি ছেলে তার বৃদ্ধপ্রপিতামহের কটা চোখ পায়। তার ভাই বোন, বাপ, মা, ঠাকুর দা, ঠাকুর মা, কারু চোখ কিন্তু কটা নয়, কিন্তু তার বৃদ্ধপ্রপিতামহের চোখ কটা ছিল। এ জাতীয় ঘটনাকে বলে, atavism বা পশ্চাদাবর্ত্তন। কখনো কখনো মনুষ্যেতর প্রাণীর কোন গুণও মানুষের মধ্যে এ ভাবে দেখা দেয়।

অর্জ্জিত গুণ পরপুরুষে সংক্রামিত হয় না। পিতা মাতার ব্যাধিও যে উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানে সংক্রামিত হয়, এমন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। মাতৃগর্ভে ভ্রূণে অবশ্য মাতার দেহের ব্যাধি সংক্রামিত হতে পারে। কিন্তু ভ্রূণের জন্মকালে ব্যধির বীজাণু তাতে থাকে না: বিশেষ বিশেষ নিপুণতা পিতামাতা থেকে সন্তানে বর্ত্তায় না, তার কারণ এ গুণগুলি চেষ্টালব্ধ ও অর্জ্জিত। তবে সাধারণ কতগুলি গুণ, যেমন, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি—সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণ সবই যে জন্মকালেই প্রকাশ পায়, তা নয়। অনেক গুণ দৈহিক ও স্নায়বিক পরিণতি সাপেক্ষ। তাই বিভিন্ন সময়ে উপযুক্তকালে বংশগত গুণ বা দোষ প্রকট হয়।

কখনো কখতো দেখা যায়, পিতা বা মাতার কোন দোষ (রং কাল হওয়া, Colour blindness, বা রক্তের জমাট বাঁধিবার গুণের অভাব haemophilia) ঠিক পর পুরুষই দেখা যায় না। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে এ দোষ পুরুষ সন্তানদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু মেয়ে সন্তানদের মধ্যে দেখা দেয়। এই রকম মেয়ের সুস্থ ও স্বাভাবিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হলে তাদের পুরুষসন্তানদের অর্দ্ধেকের মধ্যে এ দোষ দেখা যায়। পিতা ও মাতা দুজনের মধ্যেই এ দোষটী থাকিলে তাদের মেয়ে সন্তানদের অর্দ্ধেকের মধ্যেও এ দোষ বর্ত্তাবে। একে লিঙ্গগত উত্তরাধিকার বা Sexlinked heredity বলে।

কখনো কখনো দু'টি বিপরীত গুণের মিশ্রণ হ'লে একটি প্রকট (dominant) ও আর একটি অপসৃত (passive) না হয়ে দুটি গুণের সব রকম মিশ্রণই সন্তানদের মধ্যে দেখা যায়। বাদামী দানা ও সাদা দানা যবের মিশ্রণে, সাদা থেকে সুরু করে গভীর বাদামী পর্যন্ত পাঁচ বিভিন্ন পৌঁছের রংএর দানাযুক্ত যব পাওয়া যায়। একে বলে মিশ্রিত উত্তরাধিকার (blended heredity)।

P 36168

বংশগতির বিভিন্ন উপাদান

কোন্ ব্যক্তিতে কোন্ কোন্ গুণ প্রকাশ পাবে, তা অনেকখানি নির্ভর করে তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শক্তি বা সম্ভাবনার উপরে। এই উত্তরাধিকারের উপাদান-

গুলিকে পাঁচভাগে (factors) ভাগ করা যেতে পারে। যথা, গণ (species), জাতি (race), পরিবার (family), লিঙ্গ (Sex) এবং ব্যক্তিত্ব (Individuality)।

১। **গণ বা Species** :—মানুষের সন্তানদের দৈহিক গঠন, কথা বলবার ক্ষমতা, মানসিক বৃত্তি মানুষের মতই হবে, গরু বা ছাগলের মত হবে না। এ গুণগুলি মনুষ্যগণের (Species) লক্ষণ। অন্য প্রাণীর মত তার কতকগুলি সাধারণ আদিম প্রবৃত্তি যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি থাকবেই। কিন্তু তার প্রকাশের মধ্যেও মানুষের বৈশিষ্ট্য থাকবে।

২। **জাতি বা Race** :—সন্তানের মধ্যে যেমন গণগত কতকগুলি লক্ষণ বিদ্যমান, তেমনি কতগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্য থাকবে। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে—

(ক) দেহের উচ্চতা—জাপানীরা বেঁটে বেঁটে, কিন্তু পাঠানেরা লম্বা। ব্যতিক্রম নেই তা নয়, তবে তা নগণ্য।

(খ) মাথার গড়ন—নিগ্রোজাতির মাথার খুলি ও চোয়াল লম্বাটে ও অপরিসর, লর্ডিক জাতির গড়ন, ডিম্বাকৃতি আর চীনারা হোল "চ্যাপটা মুখাংশু"।

(গ) অবয়বের গঠন—এক এক জাতের এক এক রকম। রাশিয়ানরা হচ্ছে গোলগাল, লম্বা চৌড়া গড়নের, ইহুদীরা হচ্ছে লম্বা চিমশে, নাক উঁচু ; নিগ্রোরা পুরু ঠোঁট ইত্যাদি। চোখের গড়ন, চোখের রং, গায়ের রং ও বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন রকম। অবশ্য এ বৈশিষ্ট্যগুলি সবই বংশগত এ কথা বলা চলে না। পরিবেশ, যেমন, ভৌগলিক অবস্থান, খাদ্য ইত্যাদিও এ জন্য কতকটা দায়ী—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(ঘ) চুল—চুলের রং এবং ধরণ বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রকম, বাঙ্গালীর চুল কালো ও দীর্ঘ, ইংরেজদের চুল সোণালী ও সরু, নিগ্রোদের চুল কড়া ও কোকড়ানো।

(ঙ) মেজাজ—দৈহিকগুণ যেমন জন্মগত, তেমনি মানসিক গুণও অনেক সময় জন্মগত। যেমন, ফরাসীরা রসিক, আলাপী, ভদ্র ; ইংরেজ গম্ভীর, হিসাবী, সাবধানী ; নিগ্রোরা আমুদে ও লঘুস্বভাব ; শ্লাভ জাতি বিষণ্ণ ও চিন্তাশীল।

২। **পরিবার** :—প্রত্যেক পরিবারেরও ধারা আছে। পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ১০ স্বাস্থ্য, ১০ বুদ্ধি, ১০ বিশেষ নৈপুণ্য বা অনৈপুণ্য।

এক এক পরিবারের ছেলে মেয়েরা প্রচুর স্বাস্থ্যবান—আমরা কথায় বলি তাদের "জোয়ানের গুষ্ঠি"। আর এক পরিবারের ছেলে মেয়েরা রোগাটে। শিশুকাল থেকেই একই বয়সের ছেলে মেয়েদের মধ্যেও বুদ্ধির যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। কাজেই মনে করা যায়, এ পার্থক্য জন্মগত। অবশ্য বুদ্ধির পার্থক্য পরিবেশের উপরও নির্ভর করে :—সে কথা যথাস্থানে আলোচনা করব।

বিশেষ বিশেষ নিপুণতা (যেমন গাহিবার ক্ষমতা, অঙ্ক কষিবার ক্ষমতা বা অক্ষমতা) এক এক পরিবারের ছেলে মেয়েদের মধ্যে যেন স্বাভাবিক। এর কতটা জন্মগত ও কতটা পরিবেশ ও শিক্ষাগত তা নিয়ে বহু তর্ক আছে, তবে কিছুটা যে বংশগত এটা সঙ্গতভাবে মনে করা যেতে পারে।

৩। **লিঙ্গ** :—লিঙ্গের পার্থক্য জন্মগত এবং এ প্রভেদ কতগুলি দৈহিক ও মানসিক প্রভেদের কারণ। পুরুষ ও নারীর দৈহিক প্রভেদ পরিণত বয়সে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নারীদেহের প্রধান বৈশিষ্ট্য মাধুর্য্য ও ছন্দোময়তা। পুরুষদেহের প্রধান বৈশিষ্ট্য কাঠিন্য ও দৃঢ়তা, জৈব প্রয়োজনেই এটা হয়েছে লিঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট। অবয়বাদির প্রভেদ ছাড়াও আরও প্রভেদ আছে। পুরুষের হাড়,নারীর চেয়ে স্থূলতর ও দৃঢ়তর। নারীর পেশী কোমল ও অধিকতর নমনীয়। অল্প বয়সে মেয়েদের শরীরের "বাড়" ছেলেদের তুলনীয় দ্রুততর। কিন্তু পরে ছেলেরা মেয়েদের ছাড়িয়ে যায়।

তাদের মানসিক পার্থক্য নিয়ে কাব্যে ও সাহিত্যে অনেক বিপরীত মতামত প্রচলিত আছে, সে গুলি অধিকাংশ সময়ই অনির্ভরযোগ্য। বৈজ্ঞানিক আলোচনা ত অনেক হয়েছে ও হচ্ছে, সেখানেও যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। জৈব প্রয়োজনে দৈহিক প্রভেদ যেমন আছে, মানসিক প্রভেদও তেমনি থাকবে, এটা মনে করা অসঙ্গত নয়। বুদ্ধির ক্ষেত্রে কয়েকটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আগে কথা বলতে শেখে কিন্তু ছেলেদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর। টারম্যানের (Terman) পরীক্ষায় দেখা যায়, অসাধারণ বুদ্ধিমান ছেলেদের সংখ্যা মেয়েদের তুলনায় বেশী। "আরার ডব্লিউ, এফ, বুক, (W. F, Book) ও জে, এল, মিডোজ J. L. Meodows) নামে দুই বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় দেখা যায় মানসিক ন্যূনতা (mentally deficient) সম্পন্ন ছেলের সংখ্যা ও মেয়েদের তুলনায় বেশী। টি, হান্ট নামে আর একজন বিজ্ঞানী বলছেন, ছেলেদের নানা সংবাদ রাখবার সামাজিক গুণ বেশী কিন্তু মেয়েরা সমাজে অনেক বেশী মানিয়ে চলবার মত ক্ষমতা রাখে। প্রাচীনেরা নারী ও পুরুষের পার্থক্যকে অলংঘ্য বলে মনে করতেন। কিন্তু নারীর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এবং বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে নারী এমন সব দৈহিক গুণের পরিচয় দিচ্ছে যা এক কালে নিতান্তই পুরুষোচিত বলে বিবেচিত হত। মানসিক দিক থেকেও তাদের হীনতার অপবাদ নারী সম্পূর্ণ অস্বীকার কর্ত্তে সুরু করেছে। "সবলা" আজ দৃপ্ত কণ্ঠেই বলছে "ধাব না বাসর কক্ষে বধূ বেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী"। বর্ত্তমান কালে অনেক বিজ্ঞানীও মনে করেন যে মানসিক শক্তি সম্পর্কে নারী ও পুরুষের পার্থক্য প্রাচীনেরা যতটা বেশী মনে করতেন, বাস্তবিক পক্ষে তা নয়।

৪। **ব্যক্তিত্ব** : পূর্ব্বেই বলা হয়েছে প্রত্যেক সন্তানের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণের সমষ্টি বিভিন্ন। প্রত্যেক মানুষ তাই বিভিন্ন। একই পিতামাতার যমজ সন্তানদের বংশগতি বা উত্তাধিকার সবচেয়ে কাছাকাছি কিন্তু তার মধ্যেই পার্থক্য আছে। প্রত্যেক সন্তানের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য অনুসারেই ভবিষ্যতে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। শিক্ষার কাজই হবে প্রত্যেক ছাত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠবার সুযোগ দেওয়া, এ বিকাশ উপযুক্ত পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।

পরিবেশ—Environment

ধাতুগত অর্থে, যা বেষ্টন করে থাকে, তাই পরিবেশ। প্রত্যেক শিশু জন্মমাত্র এমন কি মাতৃগর্ভেও—কতগুলি অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত। এ সবই তার পরিবেশ। শিশুর জন্মস্থানের ভৌগলিক বিশেষত্ব, তার খাদ্য, গৃহ, বন্ধু শিক্ষক, সমাজ, ধর্ম্ম—এই সবই তাকে ঘিরে থাকে—তাকে প্রভাবান্বিত করে, তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। সমাজের এ পরিবেশ তার প্রকৃতির মধ্যে এমনভাবে মিশে যায় যে, তাকে তার বংশগতির উত্তরাধিকার থেকে পৃথক করা যায় না। তাই অনেক সময় সামাজিক উত্তরাধিকার বা Social heredity কথাটি ব্যবহার করা হয়। এ ব্যবহার খুব বিজ্ঞানসম্মত নয়।

পরিবেশকে সাধারণতঃ তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়— (১) গৃহ, (২) বিদ্যালয়, (৩) সমাজ।

গৃহ বলিতে পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের স্নেহপ্রীতি, নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা ইত্যাদিও বোঝায়। ঘরের গড়ন, আলো, বাতাস, খাদ্য ইত্যাদিকে ত বোঝায়ই। গৃহের পরিবেশ শিশুর জীবনে গভীরতম প্রভাব বিস্তার করে, কারণ শিশু যখন পৃথিবীতে আসে তখন সে সম্পূর্ণ অসহায়। তখন সে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের উপর। এ সময়ে প্রীতি ও যত্নের অভাব, পিতা মাতার মধ্যে বিরোধ, গৃহের বাহ্যিক ও মানসিক আবহাওয়া, তার জীবনে স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। এখানেই সে শেখে বিভিন্ন সু-অভ্যাস বা কু-অভ্যাস, এখান থেকেই সে পায় তার ভাষা, তার জীবন দর্শনের প্রথম ইঙ্গিত। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানী তাই এ কথাটির উপর বারে বারে জোর দেন যে, শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন, সুন্দর, নির্ম্মল, শান্তিপূর্ণ গৃহ-পরিবেশ।

বিদ্যালয় পরিবেশ বলিতে—শিক্ষার সব উপাদানকেই বোঝায়। শুধু স্কুলঘর নয়, শিক্ষক, পুস্তক, বন্ধু, খেলাধুলা। ঘরের বাইরে, বাড়তি বয়সে তার সুশিক্ষা বা তার কুশিক্ষার সব উপায় বা উপাদানকে বলা যায় বিদ্যালয় পরিবেশ। শিশুর দেহ যখন বাড়ছে, মন যখন উৎসুক, তখন গৃহের

পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বোধনের বাঁশী

শ্রীআদিত্যনাথ সাহিত্যশাস্ত্রী বি. এ. বি. টি.

বোধনের বাঁশী বাজে,
হবে জাগ্রত আদ্যাশক্তি ভক্ত হৃদয় মাঝে
দীনতা হীনতা অপমান ভার চিরতরে যাক ঘুচে,
যত ভেদাভেদ সমাজের ক্লেদ এ লগনে যাক মুছে।
দুর্ব্বল জাতি আজিকে শক্তিহীন
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রাণের প্রদীপ তাই তো হয়েছে ক্ষীণ।
মাতৃপূজার মন্ত্র দিয়েছে সুপ্ত হৃদয়ে নাড়া
বাজুক শঙ্খ, জাগুক জাতির জীবনে নবীন সাড়া।
জীবন করুক সুরভিত আজ রূপরস সমাবেশে,
বিশ্ব নির্নিমেষে
দেখুক বোধন গণদেবতার প্রয়োজনের বেদী মূলে
সৃজনোৎসবে রুদ্ধ দুয়ার যাহারা দিয়েছে খুলে।
বাংলার বুকে এলো আনন্দময়ী,
রাভয় পেয়ে তার সন্তান হবে সব কালজয়ী।
আশাহত আর দিশেহারা যারা আজো কাঁদে পথে পথে
নব জীবনের কর্ম্মরজ্জু অগ্রগতির পথে
তারা বেঁধে দেবে, যোগাবে শক্তি, রবেনা অসম্ম
বিশ্বের যত পথহারা পাবে এ পথের সন্ধান।
বাজুক বোধন বাঁশী,
দুখের রাজ্যে উঠুক প্লাবন দেখি উন্মাদ হাসি
দশ পহরণ দাও সন্তানে, শত্রুর হোক্ ক্ষয়
অসত্য পাপ অন্যায় মেকী রবেনা সুনিশ্চয়।

---

১২১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

পরেই বিদ্যালয়ের প্রভাব সব চেয়ে গভীর। এইখানে আছে শিক্ষকের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব।

সমাজ বলিতে—ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, ভাষা, রাজনীতি অর্থনীতিক অবস্থা, প্রতিযোগিতা, নানা সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, এ সব বুঝায়। মানুষের জীবন যে এ সবের দ্বারা গঠিত, প্রভাবান্বিত, পরিবর্ত্তিত হয় তা বোঝা কঠিন নয়। তাই বর্ত্তমান যুগে মানুষ আদর্শ অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কোন্‌টি?—এই প্রশ্ন করছে এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্যে নানা পরীক্ষা, নানা প্রচেষ্টায় ব্রতী হচ্ছে। সমস্ত সংগঠন, সংস্কার ও বিপ্লবের পিছনেই রয়েছে এ বিশ্বাস যে, সামাজিক পরিবেশ পরিবর্ত্তন দ্বারা মানুষকে উন্নত স্তরের জীবনের অধিকারী করা যায়। মানুষ একক চেষ্টায় তার জীবনকে গড়ে না। সামাজিক পরিবেশটি অনুকূল হওয়া চাই—রাশিয়া আজ এ কথাটির উপরেই সব চেয়ে জোর দিচ্ছে।

বুভুক্ষু শিক্ষকগণ রাষ্ট্র ও সমাজের বিপদস্বরূপ। জাতি গঠনের কাজ তাহাদের দ্বারা করাইয়া লইবার আশা বাতুলতা। শিক্ষার বনিয়াদকে দৃঢ় করিতে হইলে, বুনিয়াদী, শিক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করিতে না চাহিলে শিক্ষকগণকে উপযুক্ত জীবিকা ও মর্য্যাদা দিন।

জনহিতে আণবিক শক্তির ব্যবহার

আণবিক শক্তি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যতই বাড়িয়া যাইতেছে এই শক্তিকে শুধু ধ্বংসকর কার্য্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া মানুষের কল্যাণ কর্ম্মে প্রয়োগ করিবার আগ্রহ ও প্রচেষ্টা ততই বাড়িতেছে! এইটিই এই ভয়াবহ এটমিক ও হাইড্রোজেন বোমার যুগে আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। আমেরিকা, রাশিয়া এবং বৃটেন যাহারা আণবিক শক্তির গবেষণা কার্য্যে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগামী, সুখের বিষয় সেই দেশের বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই দিনরাত্রি এই ভীষণ শক্তিশালী দানবকে মানবহিতে নিযুক্ত করিবার জন্য, নিত্য নূতন পরিকল্পনা করিতেছেন।

গ্রেট বৃটেন

আণবিক শক্তিকে দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা কার্য্যে কি ভাবে ব্যবহার করা হইতেছে 'শিক্ষকে'র পাঠকগণকে ইতিপূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। এইবার শ্রম শিল্পে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে গ্রেট বৃটেনে যে সকল প্রচেষ্টা হইতেছে সে সম্বন্ধে কিছু বলিব।

আণবিক যুগ যতই অগ্রসর হইতেছে, বিভিন্ন কাজে, আণবিক পাইল হইতে উপজাত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বেকার তুলনায় বর্ত্তমানে আইসোটোপ ব্যবহারকারী যন্ত্রগুলির কার্যকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতাও অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ওয়েল্ড করা ধাতুর ত্রুটী নিরূপণ

কাষ্টিং, ফোজিং ও ওয়েল্ড করা ধাতুর ত্রুটী নিরূপণের জন্য সর্বপ্রথম রঞ্জন রশ্মির পরিবর্ত্তে আইসোটোপ ব্যবহার করিয়া খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। অধিকন্তু

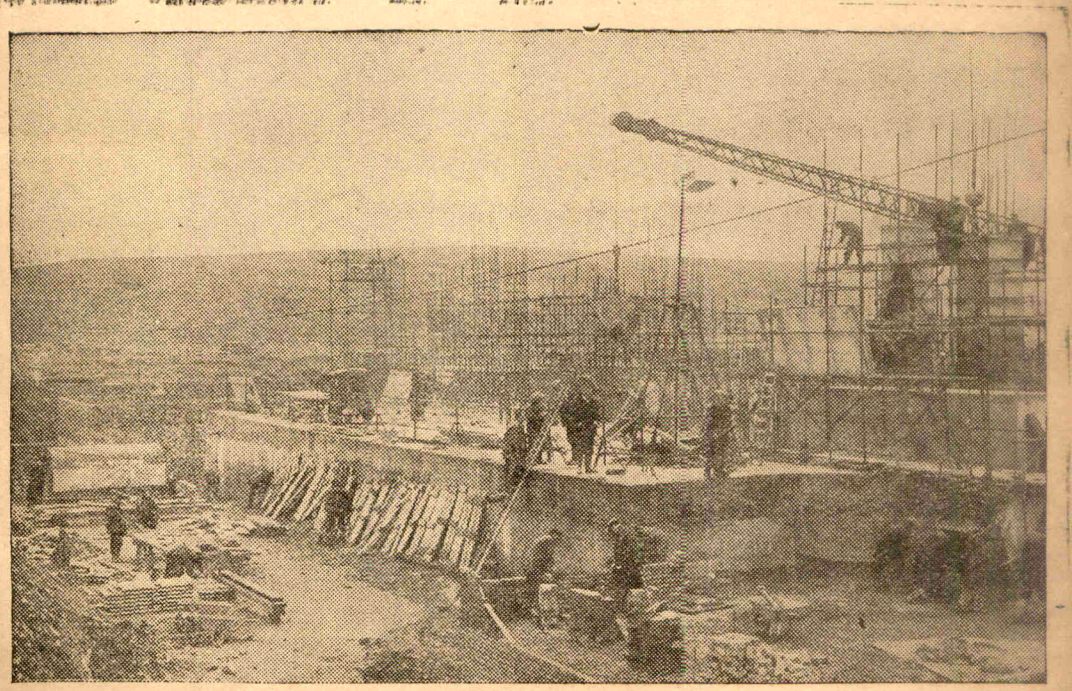

কাম্বারল্যাণ্ডের ক্যালডার হলে বৃটেনের প্রথম আণবিক শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে। কারখানা নির্ম্মাণ কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

আইসোটোপ ব্যবহার করিলে খরচ কম পড়ে এবং ইহা ব্যবহার করার জন্য শ্রমিকদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না।

ঘনত্ব পরিমাপ

ইহার পর ঘনত্ব পরিমাপ করার কাজে আইসোটোপ ব্যবহার করা হইতে থাকে। ঘনত্ব পরিমাপের দুইটি পদ্ধতি আছে। একটি পদ্ধতি হইল, যে বস্তুর ঘনত্ব পরিমাপ করা হইবে তাহার মধ্যে দিয়া আইসোটোপ হইতে বিকীর্ণ তেজ সঞ্চারিত করা এবং অপরদিকে তেজ পরিবর্ত্তনের মাত্রা পরিমাপ করিয়া ঘনত্ব নিরূপণ করা। অপর পদ্ধতি হইল, যে বস্তুর ঘনত্ব পরিমাপ করা হইতেছে তাহার গাত্র হইতে প্রতিফলিত তেজের কম বেশী পরিমাণ পরিমাপ করিয়া ঘনত্ব নিরূপণ করা। এই দুই পদ্ধতির জন্য যে আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় তাহা বিটা তেজ বিকীরণ করে; সেইজন্য যে যন্ত্রের সাহায্যে এই আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় তাহাকে বলে বিটা পরিমাপ যন্ত্র।

যন্ত্রের সাহায্যে অন্যান্য ধাতুর পাত এবং ধাতু পাতের উপর টিন ইত্যাদির কোটিং-এরও ঘনত্ব পরিমাপ করা যায়।

আইসোটোপ ব্যবহারকারী পরিমাপ যন্ত্রগুলি খুবই সূক্ষ্ম। প্রথম প্রথম অতি শীতল, অতি উষ্ণ, ধূলিপূর্ণ ও আর্দ্র স্থানে এগুলি ব্যবহার করিতে খুবই অসুবিধা হইত। কিন্তু ক্রমশঃ সেই অসুবিধাগুলি দূর করা সম্ভব হইয়াছে।

প্যাকেট পরীক্ষা

বর্ত্তমানে বহুপ্রকার কাজে আইসোটোপ ব্যবহার করা সম্ভব হইতেছে। ভবিষ্যতে ইহার ব্যবহারের ক্ষেত্র যে আরও অনেক বিস্তৃত হইবে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। উদাহরণস্বরূপ, বর্ত্তমানে কয়েক ধরণের 'প্যাকেজ

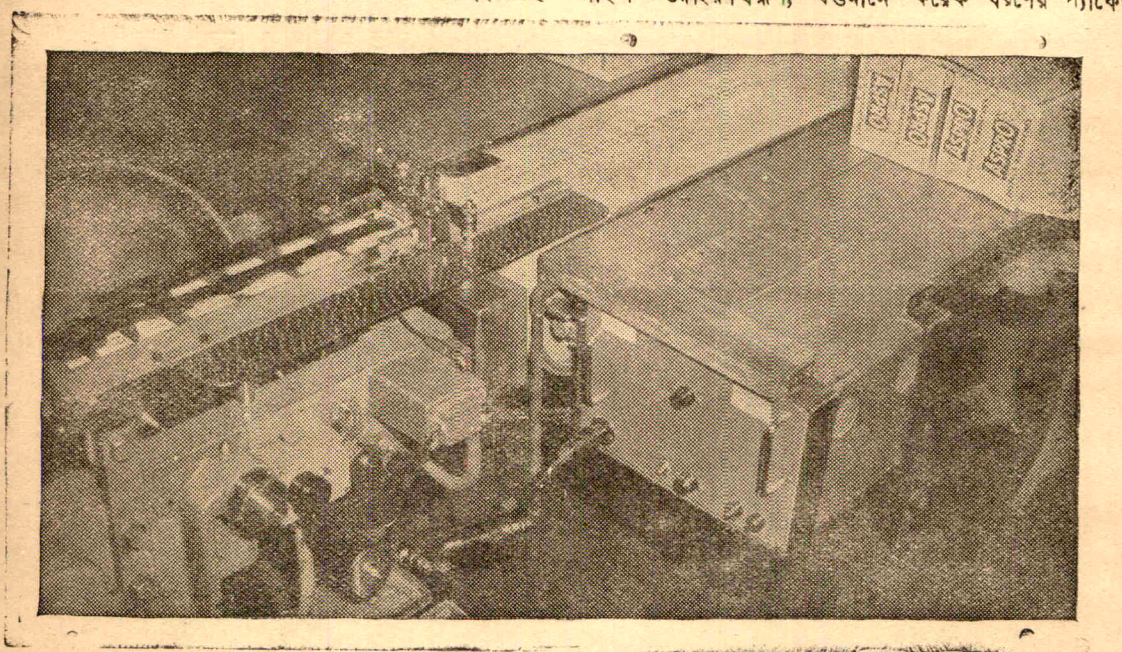

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে প্যাকেটের মধ্যস্থ জিনিষ কি ও তাহার সংখ্যা কত তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ ওয়েলসের একটি নূতন কারখানায় নির্ম্মিত ইস্পাতের পাতের ঘনত্ব পরিমাপের জন্য এক ধরণের যন্ত্র ব্যবহার করা হইতেছে যাহাতে গামা তেজ বিকীরণকারী আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। এই মনিটর' যন্ত্র ব্যবহার করা হইতেছে। যন্ত্রের দ্বারা যে সকল প্যাকেট ভর্ত্তি করা হয় উপরি উক্ত মনিটরের সাহায্যে

সেগুলির ভিতরের বস্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভব হইতেছে। একটি মনিটরের সাহায্যে সাবান চূর্ণের প্যাকেট পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়; অপর এক মণিটরের সাহায্যে এসপিরিন বড়ির প্যাকেট পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। প্যাকেটের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কম বড়ি থাকিলে পরীক্ষার ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাহা ধরা পড়ে। এই সকল মনিটরের সাহায্যে সিগারেট, চিনি, বন্ধুকেরগুলি প্রভৃতি বহু জিনিসের প্যাকেট পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়।

ছাপা কাপড়ের রং নিয়ন্ত্রণ

কাপড় ছাপার কাজে আইসোটোপ ব্যবহার করিয়া যে সাফল্যলাভ করা গিয়াছে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। যখন রোলারের সাহায্যে কাপড়ের উপর বিভিন্ন রং ছাপা হয়, তখন রোলারের গায়ে যে রংগুলি লাগিয়া থাকে সেগুলি বিভিন্ন রংয়ের আধারের মধ্যে আসিয়া পড়ে। ছক্ষুতে ব্যাপারটি কিন্তু ধরা পড়েনা কারণ ছাপার জন্য যে রং ব্যবহার করা হইতেছে ছাপা কাপড়েও যে ঠিক সেই রংই উঠিবে তাহা নয়। রং যে ক্রমশ একটু একটু করিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা সহজে ধরা মুস্কিল। ইহার ফলে ছাপার সময় অনেক কাপড় নষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কালো ও হলুদ রংয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ছাপার সময় কালো রং হলুদ রংয়ের আধারের মধ্যে পড়ে এবং হলুদ রং ক্রমশঃ বাদামি রংয়ে রূপান্তরিত হয়।

আইসোটোপের সাহায্যে সহজেই এই সমস্যার সমাধান করা যায়। কালো রংয়ের মধ্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নিক্ষেপ করা হয় এবং হলুদ রংয়ের আধারের উপর একটি 'মণিটর' যন্ত্র বসাইয়া দেওয়া হয়। যখন হলুদ রংয়ের আধারে রোলারের দ্বারা আনীত কালো রংয়ের পরিমাণ একটি নির্দ্দিষ্ট মাত্রা ছাড়াইয়া যায় তখনই মনিটর যন্ত্রে একটি কাঁটা সরিয়া যায় এবং যন্ত্রচালককে সতর্ক করিয়া একটি ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। ইহার ফলে অনেক রংও বাঁচিয়া যায়। এতকাল করা হইত কি? ছাপার মান উন্নত রাখিবার জন্য এক রংয়ের মধ্যে আরেক রং আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই ভাল থাকিতে থাকিতেই সমস্ত রং ফেলিয়া দেওয়া হইত।

পিষ্টন রিংএর ক্ষয় নির্দ্ধারণ

পেট্রোল ইঞ্জিনের পিষ্টন রিংএর ক্ষয়ের পরিমাণ নিরূপণের জন্যও বর্ত্তমানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ খুব কাজে লাগিতেছে। সম্প্রতি বৃটেনের একটি পেট্রোলিয়াম

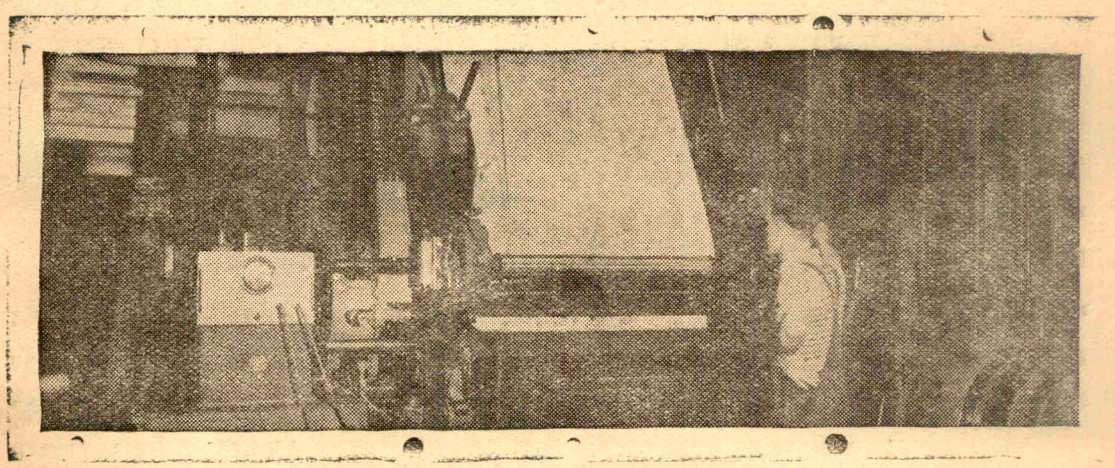

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সুতা ও কাপড় রং করিবার সময় রং নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

কোম্পানী পিষ্টন রিং-এর ক্ষয় নিরূপণ করার এই নূতন পদ্ধতি সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক ফিল্ম প্রস্তুত করিয়াছেন। অনুরূপ পদ্ধতির সাহায্যে চুল্লীর অভ্যন্তরস্থ ইষ্টক আচ্ছাদনীর ক্ষয়ের পরিমাণও পরিমাপ করা সম্ভব হইতেছে। কাচের কারখানায় চুল্লীর মধ্যে গলিত কাচকে একটি নির্দিষ্ট লেভেলে রাখারও একটি নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, যদিও তৎসম্পর্কে বিশদ বিবরণ এখনও জানা যায় নাই।

আইসোটোপ ব্যবহার শিক্ষা

আণবিক শক্তির এই সকল বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োগের ফলে সমগ্র বিশ্বের শিল্পপতিরা শ্রমশিল্পের কাজে আইসোটোপের ব্যবহার সম্পর্কে অতিশয় আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছেন। কার্কশায়ারের অন্তর্গত হ্যারওয়েলের আণবিক গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে আইসোটোপ ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে কয়টি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে পৃথিবীর বহু বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা যোগদান করিয়াছে। তিন বৎসর পূর্বে এই স্কুলগুলি স্থাপিত হয় এবং প্রথমে কেবল বৃটিশ ছাত্ররাই ইহাতে যোগদান করিতে পারিত। কিন্তু শীঘ্রই সকল দেশের ছাত্রদের জন্য এই স্কুলগুলির দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং তিন বৎসরের মধ্যে ৩১টি দেশের ২৮০ জন ছাত্রে এই স্কুলগুলিতে শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করিল। বর্তমান ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশে দূর-প্রাচ্য, নিকট-প্রাচ্য, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশ হইতে আগত বহুসংখ্যক ছাত্র এই সকল স্কুলে আইসোটোপের ব্যবহার বিধি শিক্ষা করিতেছে। বেলজিয়ামের ছাত্রসংখ্যা ১৫ এবং সর্বাধিক, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতেও একজন ছাত্র আসিয়াছে।

১৯৪৭ সালে সুরু হইয়া গত ছয় বৎসরের মধ্যে হ্যারওয়েলে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের উৎপাদন প্রভূত-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিসাবের সুবিধার জন্য 'পার্সেল' হিসাবে আইসোটোপের উৎপাদনের হিসাব করা হয়, যদিও বর্গ পার্সেলে আইসোটোপের পরিমাণের তারতম্য থাকে। ১৯৪৭ সালে ১৩৫ পার্সেল আইসোটোপ উৎপন্ন হয় এবং সমস্তটা বৃটেনেই ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৭ সালে উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৪১৩ পার্সেলে দাঁড়ায়। ১৯৪৯ সালে উৎপাদন হয় ইহার দ্বিগুণ এবং ১৯৫০ সালে হয় তাহারও দ্বিগুণ। ১৯৫১, ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে পার্সেলের সংখ্যা হয় যথাক্রমে ৮,৭৫৫, ১০,১৬০ এবং ১২,১৫৯। এই সংখ্যাগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবীর মধ্যে বৃটেনেই সর্বাধিক পরিমাণ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশ বৃটেন হইতে আইসোটোপের পার্সেল আমদানি করিয়া থাকে।

আণবিক শক্তির সাহায্যে তড়িৎ উৎপাদন

বর্তমানে বৃটেনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা অদূর ভবিষ্যতেই নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিতেছেন। নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র হইল এরূপ একটি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র যেখানে কয়লা বা অন্য কোন প্রকার জ্বালানির পরিবর্তে আনবিক শক্তি ব্যবহার করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। বৃটিশ ইলেকট্রিসিটি কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই একটি নিউক্লিয়ার শক্তি বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রধান নিউক্লিয়ার শক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞ জনৈক ইঞ্জিনিয়রকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিয়াছেন। আশা করা যায় যে আগামী ছয় বৎসরের মধ্যে নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইবে।

অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে যদি যুদ্ধ নিবারণ করিতে এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের, বিশেষতঃ অনুন্নত দেশগুলির জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইবে। ইহা করিবার একটি দ্রুত ও নিশ্চিত উপায় হইল বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং নূতন নূতন অঞ্চলে তাহা সরবরাহ করা। বস্তুতপক্ষে, বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিমাণের সহিত জীবনযাত্রার মানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিদ্যুৎই হইল বৈষয়িক সমৃদ্ধির চাবিকাঠি।

এযাবৎকাল জ্বালানি হিসাবে কয়লা বা তৈল ব্যবহার করিয়াই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইয়াছে। বৃটেনের কয়লা সম্পদ ছিল প্রচুর এবং সেই কারণেই বৃটেন বহুসংখ্যক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়া শ্রমশিল্পের দ্রুত উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। বৃটেনে ঘরবাড়ি এবং কলকারখানার জন্য বিদ্যুতের চাহিদা প্রতিবৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু বৃটেনের কয়লা সম্পদ ত অপরিসীম নয়। কয়লা একদিন ফুরাবেই। সুতরাং বৃটেনকে বাধ্য হইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কোন উপায়ের কথা চিন্তা করিতে হইতেছে। বিশ্বের সমস্ত দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে হইবে। কিন্তু সেই বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা বা তৈল পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া প্রভৃতি যে যে সকল দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়া উন্নত একশত বৎসর পরে তাহাদেরও কয়লার অভাব ঘটিবে। সুতরাং সকল দিক দিয়াই বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন উপায় অবলম্বন করা যে নিতান্ত আবশ্যক বৃটেন বুঝিয়াছেন।

এই বিকল্প উপায় হইল নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে আনবিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা। এই উপায় অবলম্বনের একটি বড় সুবিধা হইল এই যে ইহার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিশ্বে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অধিকন্তু এই জ্বালানি কয়লার চেয়ে অনেক সহজে ও অনেক দ্রুত একস্থান হইতে অন্য স্থানে, বিশেষতঃ যে সকল অনুন্নত দেশে কয়লা নাই সেই সকল দেশে, পাঠান চলে। ইহার অর্থ হইল এই যে জলা বা মরুভূমি অঞ্চলেও নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করা সম্ভব। তবে প্রধান সমস্যা হইল, ইহার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম নির্মাণ করা এবং উৎপাদন কেন্দ্রগুলি গড়িয়া তোলা। এই কাজ করিতে হইলে অপরিসীম বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দক্ষতা এবং বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। সুখের বিষয় পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশ সমূহে তাহার অভাব দেখা যাইতেছে না

আমেরিকা

পারমানবিক শক্তি সম্পর্কে গবেষণা আমেরিকাতেই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে ইহা সকলেই অবগত আছেন। সুখের বিষয় আমেরিকাও ইহার শান্তিকালীন ব্যবহারের জন্যও বিশেষভাবে তৎপর হইয়াছে।

'শিক্ষকে'র পাঠকগণকে এ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পূর্ব্বে জানান হইয়াছে। আণবিক শক্তি পরিচালিত, 'ডুবোজাহাজ' সাবমেরিণ ও অন্যান্য জাহাজ নির্ম্মাণের কথা, ইতিপূর্ব্বে 'শিক্ষকে' প্রকাশিত হইয়াছে। পারমাণবিক শক্তির শান্তিকালীন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল উন্নতি হইতেছে তাহা মিশিগ্যানের অ্যান আরবারে কিছুদিন পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল নিউক্লিয়ার ইনজিনিয়ারিং কংগ্রেসের অধিবেশনে নানা চিত্র সহযোগে দেখানো হইয়াছে। এই সকল উন্নতি-মূলক কাজের সংগে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও ইনজিনিয়ারগণের ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রে কাজ করিবার পক্ষে কতকগুলি বিশেষ ধরণের বিপদের আশঙ্কা আছে। সেই সকল বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত, বহু নূতন নূতন উপকরণকে কাজে লাগাইতে হইবে। যেমন, বেরিলিয়াম ও জিরকোনিয়াম ধাতু, ফ্লোরিন উপজাত যৌগিক পদার্থ এবং সীসার ন্যায় শক্ত কাঁচ প্রভৃতি। এই সকল দ্রব্যের উন্নতির জন্যই পারমাণবিক শক্তির শান্তিকালীন প্রয়োগের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন সম্ভব হইতেছে। এই উন্নতির পরিচয় সমগ্র স্বাধীন বিশ্বে বর্ত্তমানে যে ত্রিশটিরও অধিক পারমাণবিক চুল্লী চালু রহিয়াছে এবং আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে অতিরিক্ত পারমাণবিক চুল্লী নির্ম্মাণের যে পরিকল্পনা করা হইতেছে, তাহাতেই পাওয়া যায়। প্রত্যেক রি-অ্যাক্টার বা চুল্লী হইতে নূতন ও মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাইতেছে এবং তাহা উন্নততর চুল্লী নির্ম্মাণে প্রয়োগ করা হইতেছে। এই সকল চুল্লী দ্বারা বিপুল পরিমাণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন করা হইতেছে। ভেষজবিজ্ঞান শিল্প, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিদিন এই সকল আইসোটোপ ব্যবহৃত হইতেছে।

সকলেই জানেন যে আমেরিকা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত বৈজ্ঞানিকগণ পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন অস্ত্রাদি বিষয়ে গোপনে বহু গবেষণা এবং পরমাণু সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যা বা টেকনোলজী সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। আনন্দের কথা পারমাণবিক শক্তির শান্তিকালীন প্রয়োগের জন্য এই সকল তথ্য যে সাধারণের নিকট প্রচারিত হওয়া উচিত, ইহা আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেছেন। অবশ্য তথ্য সমূহ যে সকল রাষ্ট্র আমেরিকার মিত্র নহে তাহাদের আণবিক শক্তি বৃদ্ধিতে যাহাতে সাহায্য না করে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে তাহারা বলিয়াছেন।

ম্যাচাচুছেট্‌স ইনষ্টিটিউটে আণবিক তেজস্ক্রিয় বস্তুর সাহায্যে দীর্ঘ কাল খাদ্যদ্রব্য তাজা রাখা হইতেছে। ছবিতে কড মাছকে পচন-সংঘটক বীজাণু মুক্ত করা হইতেছে।

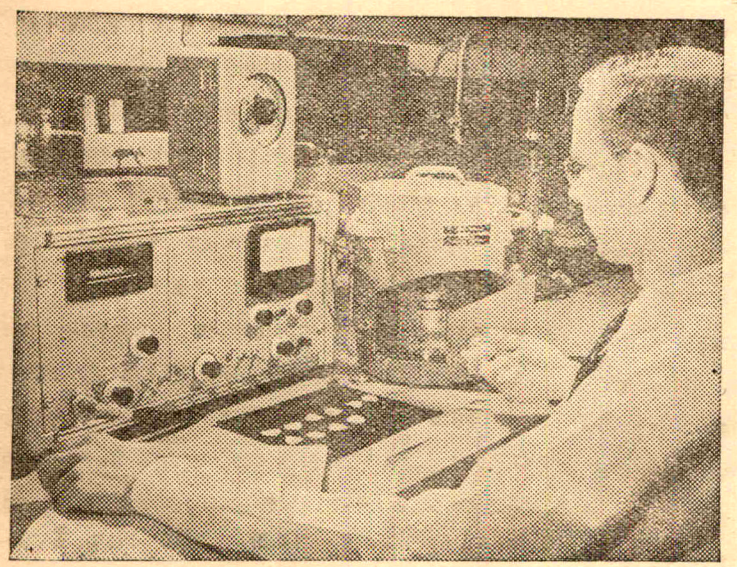

তেজস্ক্রিয় পদার্থে পরিপুষ্ট জীবাণু প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন প্রকার সাবানের কাপড় পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়।

ম্যাচাচুছেট ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজি তাঁহাদের গবেষণাগারে আণবিক শক্তির সাহায্যে দীর্ঘ দিন ধরিয়া খাদ্যরক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় উপাদান হইতে অতি তীব্র আলোক রশ্মি নিঃসৃত করিয়া তাহার সাহায্যে তাঁহারা টম্যাটো, মাছ এবং মাংসকে জীবাণুমুক্ত করিয়া ৯০ দিন পর্য্যন্ত তাজা অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। এইভাবে আলুকেও এক বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখা গিয়াছে।

শিল্পেও আনবিক শক্তি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করিবার প্রচেষ্টা

(শেষাংশ ১৫৪ পাতায়)

হরিবাগের মুক্তি

শ্রীজনরঞ্জন রায়

মহাপুরুষগণের অযাচিত কৃপার অনেক কাহিনী আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই, তাহাতে আমাদের ভরসা হয়। ইহাও সেইরূপ একটি কাহিনী।

ভগবৎ প্রতিম যোগাচার্য্য শ্রীমৎ নিত্যগোপাল দেব তখন নবদ্বীপের তুড়াপাড়ায় অবস্থান করিতেছেন। ইহা ১৯০০ খৃঃ কথা। তাঁহার মাহাত্ম্য বহু দেশেই তখন সুবিদিত। তাহা নবদ্বীপ ছাড়িয়া বর্দ্ধমান জেলাতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নবদ্বীপ সংলগ্ন বর্দ্ধমান জেলার বহু পল্লী হইতে তখন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট নবদ্বীপে আসা-যাওয়া করিতেছেন। তথাকার ভক্তগণ একদিন শ্রীনিত্যগোপাল-দেবের নিকট নিবেদন করিলেন যে, দোগাছির তেঁতুলে বাগ্দীর, ডাকাতদলের উৎপাতে তাঁহারা বিব্রত হইতেছেন পুলিশ তাহাদের আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এই জন্য ঘরবাড়ী ছাড়িয়া তাঁহার নিকটে আসাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে।

নবদ্বীপ হইতে প্রায় আট মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে পূর্ব্বস্থলীর নিকট এই দোগাছি বা রায়দোগাছি গ্রাম। নবদ্বীপ হইতে কাটোয়া যাইবার কালনা—কাটোয়া রাস্তার উপরে ইহা অবস্থিত।

ডাকাত দলের সর্দ্দার হরি বাগ্দী বা হরিবাগ।

সেদিন রাত্রে ডাকাত দল তাহাদের লুণ্ঠিত মাল হরিবাগের কুটিরে বসিয়া ভাগ-বাটোয়ারা করিতেছিল। একজন বলিল—সর্দ্দার আর বুঝি আমাদের দল থাকে না। নবদ্বীপের এক সাধুর কাছে আমাদের নামে নালিশ হয়েছে... ভারি জাগ্রত সাধু...এইবার দল ভাঙবে। হরিবাগ বলিল—কত পুলিশ হাকিম তলিয়ে গেল আর একটা সাধু ভেঙে দিবে আমাদের দল! হরিবাগ তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল—সাধু দেখতে কেমন শুনেছ কি তোমরা? তাহারা বলিল, খুব সুপুরুষ...তাঁহার গা দিয়ে সর্ব্বদা সূর্য্যের আলো বেরোয়।

ডাকাত দল চলিয়া গেল। হরিবাগ ভাবিতেছে—কত সাধুকে জখম কোরলাম...কত ঠাকুর দেবতার অলঙ্কার লুঠলাম...কেওতো পারলে না আজ পর্য্যন্ত কিছু কোরতে... এই সাধুটা আমাদের কাবু কোরবে? ভাল, দেখতে হবে কেমন এই সাধু।

রাত্রি তখনও প্রভাত হয় নাই। হরিবাগ তাহার ঘরের মাচার নিচে লুণ্ঠিত মালের ভাগ পুঁতিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছে। মাচার উপরে শুইয়া শুইয়া সে ভাবিতেছে। সে যেন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ তাহার ঝাঁপে যেন কে আঘাত করিল...কে যেন ডাকিতেছে—হরি, ওঠ ওঠ... তুমি যে সাধুকে দেখতে চেয়েছিলে সে এসেছে। ডাকাত সর্দ্দার মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার কুটিরের ঝাঁপ খুলিয়াছিল...এক দৃষ্টে সে চাহিয়া আছে সেই সাধুর দিকে...চোখ যেন ধাঁধিয়া যাইতেছে...কী রূপচ্ছটা! হরিবাগের অসুরের মত কাল দীর্ঘ মাংসল দেহ যেন বিদ্যুৎস্পর্শে কাঁপিতে লাগিল...তাহার লম্বা লম্বা বাবরি চুলগুলি খাড়া হইয়া উঠিল...তাহার রক্ত-চক্ষুর দৃষ্টি মাটির দিকে নামিয়া পড়িল। হরিবাগ কাঁদিতে কাঁদিতে কি যেন নিবেদন করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সাধু তখন অন্তর্হিত হইয়াছেন।

কিছু পরে হরি বাগ সম্বিদ ফিরিয়া পাইল। সে আকণি যুক্ত দুইটি লাঠি লইয়া রণ্‌পায়ে দৌড়িতে লাগিল নবদ্বীপের দিকে। আসিয়া উপস্থিত হইল নবদ্বীপ তুড়াপাড়ায় নিত্য গোপালের আশ্রম দ্বারে। তখন উষার আলোকে দিক উদ্ভাসিত। সে আশ্রম দ্বারে জোরে জোরে আঘাত করিতেছে আর বলিতেছে—দেখা দাও...আমায় দেখা দাও ঠাকুর! ঘরের ভিতর হইতে শ্রীনিত্যগোপাল সহাস্যে বলিতেছেন—দোর খুলে দাও তোমরা...বুঝি হরিবাগ। হরিবাগকে শ্রীনিত্যগোপালের নিকট আনা হইল। সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে ক্ষণকাল তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর বলিতে লাগিল—হাঁ তুমি—তুমি...তুমিই দেখা দিয়েছিলে শেষ রাত্রে...তুমিই টেনে নিয়ে এলে আমায় ঠাকুর...আমি ডাকাত...আমি সেই হরি বাগ্দী...কত মানুষকে খুন করেছি...কত সতীর সর্ব্বস্ব লুঠ করেছি...কেউ আমায় টলাতে পারে নি...তুমি তা পেরেছ! সে আবেগ ভরে পড়িয়া গেল শ্রীনিত্যগোপালের সাধন-কুটিরের দুয়ারে। অধম-তারণ নিত্যগোপাল বলিলেন—হরি তুমি আমাকেই দেখেছিলে তো? পরখ করে দেখ। হরিবাগ তখন কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছে। কিছু পরে আবার নিত্যগোপাল বলিলেন—তাড়াতাড়ি গঙ্গাস্নান কোরে এস। হরিবাগ

দৌড়িল গঙ্গার দিকে। অচিরাৎ গঙ্গাস্নান করিয়া সিক্তবস্ত্রে ফিরিয়া আসিল। শ্রীনিত্যগোপাল তাহার কর্ণে দিব্যমন্ত্র প্রদান করিলেন আর বলিলেন—এই বৃত্তিটা ছাড়া ভাল।

সেই হইতে হরিবাগ ডাকাতি ছাড়িল এবং মাদুর বুনিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিল। এখন পর্য্যন্ত দোগেছের পাটী কালনা, কাটোয়া ও নবদ্বীপের বাজারে পাওয়া যাইতেছে।

যোগাচার্য্য শ্রীমৎ নিত্যগোপাল দেব

শ্রীনিত্যগোপালের অলৌকিক লীলা কাহিনী বর্ণনা করিবার যথেষ্ট স্থান আজ এখানে মিলিবে না। ১২৬১ সালের ১৩ই চৈত্র (১৮৫৫ খ্রীঃ ২৫শে মার্চ্চ) রবিবারে বাসন্তী অষ্টমী দিবসে পাণিহাটীতে মাতুলালয়ে তাঁহার আবির্ভাব হয়। ১৩২৭ সালের ৭ই মাঘ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে (১৯১১ খ্রীঃ ২১শে জানুয়ারী) শনিবারে হুগলী নিত্যমঠে অনন্ত সমাধি যোগে তিনি লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার নির্দ্দেশ মতে, তাঁহার কলিকাতা কালীঘাট সন্নিহিত মহানির্ব্বাণ মঠে তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্য দেহ সমাহিত করা হইয়াছিল। গত ২৭শে চৈত্র ১৩৬০ শনিবারে (১৯৫৪ খ্রীঃ ১০ই এপ্রিল) ১১৩ নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯, মহানির্ব্বাণ মঠে তাঁহার শতবার্ষিকী আবির্ভাব মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ অবধূত মহারাজের নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম ছিল শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূতাচার্য্য। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার বিশেষ সখ্যতা ছিল। তাঁহার বহুল দার্শনিক গ্রন্থে তিনি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন। আমার মত ও পথটাই খাঁটি, অপরের মত ও পথ ঘৃণ্য ও মিথ্যা—ইহার প্রতিবাদ তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থেই আছে, তিনি বলিয়াছেন, প্রতি মানুষের ভিতরই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ আছে। তিনি বলিয়াছেন—কাহারও মনে কোন একটার বিকাশ প্রধানভাবে দেখা যায়, কিন্তু প্রত্যেক পথেই মুক্তি পাওয়া যায় এবং সকল মতের একীকরণে ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করাই সাধনার উদ্দেশ্য।

ভগবানকে লাভ করিতে গিয়া সংসারের পিতৃ-মাতৃত্বকে অস্বীকার করার কোনও প্রয়োজন নাই তিনি বলেন জীবনের সকল অবস্থাই মায়িক। গৃহ-সংসারও মায়িক, সন্ন্যাসজীবনও মায়িক। জীবনধারাকে বিভিন্ন সংঘাতের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিয়া সকল দ্বন্দ্বের উপরে যে মহা সত্য তাহা প্রাপ্তিই আত্মাকে, বা ব্রহ্মকে জানা উপনিষদে বলেন, 'নেতি-নেতি' বলিতে 'এতি' আসে। শ্রীনিত্যগোপাল বলিলেন, সমন্বয়···নিত্যানিত্য সমন্বয়···জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়···সাকার নিরাকার সমন্বয়·· জড়াজড় সমন্বয়···চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়·· এই সর্ব্বসমন্বয়ের দৃষ্টিতে সারা পৃথিবীর সামাজিক রাষ্ট্রিক ও ধার্ম্মিক জীবনের সমন্বয় সম্ভব। আত্মানুভূতির দ্বারা তিনি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই পথেই দ্বন্দ্ববহুল পৃথিবীর সকল অশান্তি ঘুচিয়া মিলন-ভূমি রচিত হইতে পারে, দৃঢ়তার সহিত শ্রীনিত্যগোপাল ইহা বলিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার বাক্য সফল হইতেই হইবে। তবে আজ হোক্ বা কাল হোক্। অন্য পথ নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষার স্থান

শ্রী কে, এম্, মুন্সী, (উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল)

অনুবাদ—শ্রীঅনীতা বসু, বি-এ

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতির নূতন বিকাশের মধ্যে সহজেই যে জিনিষটি লক্ষিত হয়, সেটি হইতেছে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সার্থক মিলন ও সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস। ইংরাজী শিক্ষার মধ্য দিয়া আমরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইয়াছি। এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির সার্থক রূপটি এবং মানুষের মনকে যথাযথ চিন্তাধারা ও কার্য্যক্রমের মধ্য দিয়া ঠিক পথে পরিচালিত করিবার শক্তিটি আমরা প্রথম হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। অপর পক্ষে, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতের বিরাট সাহিত্য-সম্ভার ইয়োরোপের মনীষিগণই প্রথমে আবিষ্কার করেন। তাঁহারা ভারতের এই পুরাতন ঐশ্বর্য্যের প্রতি বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করেন। ইহার ফলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের স্থান সহজেই নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থায়, ইয়োরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রীক্ ও ল্যাটিন এই ভাষার অনুরূপ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় হইতেই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যবিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়িতে হইলে তাহা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে সুরু করিতে হয়। অতএব সেখানেও সংস্কৃত পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে টোল ব্যতীত অতি অল্প স্থানে সংস্কৃত অধ্যাপনা হইত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন কাহিনী-পুস্তক, পুরাণ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পড়াইতেন। এই সকল পুস্তক হইতে জনসাধারণ সংস্কৃত ভাষার অপূর্ব্ব সম্পদের পরিচয় পাইত। ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ আহরণ করিয়া নিজ নিজ ভাষাকে নূতন প্রকাশ-ভঙ্গিমায় সমৃদ্ধ করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দচয়নকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে করা হয়। ইয়োরোপেও ল্যাটিন হইতে উদ্ভূত সকল ভাষা তাহাদের শুদ্ধ ভাষা এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের উপযোগী গম্ভীর শব্দ ল্যাটিন হইতে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষে এই আহরণ কার্য্যটী বেশী মাত্রায় চলিতে থাকে, ফলে নূতন সৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়া কেবল এই কার্য্যটীই চলিতেছে। এইরূপ হইলে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত ভাষাসমূহ আপন আপন পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া নূতন ভাষায় উন্নীত হইতে পারিবে না। প্রয়োজন মত নিজের জোরে ভাষা সৃষ্টি করিয়া লইতে হয়, সব সময় পিছনের সাহায্য নেওয়া ঠিক নয়।

বিদ্যালয়ে সংস্কৃত

এইভাবে বর্ত্তমানে স্কুলে ও কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। উত্তর প্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে, কাশ্মীর, বিহার, নেপাল, আসাম, বাংলা উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী অঞ্চলে এবং মহারাষ্ট্র, রাজস্থান প্রভৃতি স্থানে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ জায়গায় সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষার বিরাট ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছে। এই সব স্থানের অধিবাসীদের মনে, বিশেষতঃ এখানকার বিদ্বান সমাজে, সংস্কৃত ভাষা জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। কেবলমাত্র সিন্ধু পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমান আধিপত্যের স্মারক ও ধারক হিসাবে ফার্শী-সংস্কৃতির প্রভাবে সংস্কৃত শিক্ষার ঐতিহ্য কিছুটা ব্যহত হইয়াছে দেখা যায়। তবে বিগত আশী বৎসরে আর্য্য সমাজের আন্দোলনে সে সকল স্থানেও আবার সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্য কিছুটা ফিরিয়া আসিয়াছে। তবুও ঐ সকল স্থানে পার্শী-সংস্কৃতির প্রভাব এত বেশী যে সেখানে সংস্কৃতকে পুনরায় পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ নয়, তবে এখন সংস্কৃতকে লিখিতভাবে আগের চেয়ে একটু বেশী প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

যাহা হউক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কলেজের প্রারম্ভিক অবস্থায় তিনটী ভাষা শিক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে,—মাতৃভাষা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা (অথবা অন্য একটী ক্ল্যাসিকাল ভাষা, যেমন মুসলমানদের মধ্যে পার্শী ও আরবী, উত্তর ভারতের ও পঞ্জাবের হিন্দুদের মধ্যে পার্শী)। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতের উপর বিভিন্ন মাত্রায় জোর দেওয়া হইয়া থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত তিনটী ভাষাকেই আবশ্যিক করিয়া রাখা হইয়াছে। বিশেষতঃ বাংলা দেশে সকলে মনে করেন, আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিকে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রূপদান করিতে হইলে তাহাকে পাখীর মত দুইটী ডানায় ভর করিয়া চলিতে হইবে; একটী ডানা সংস্কৃত ভাষা ও অপরটী হইতেছে ইংরাজী ভাষা। এই কারণেই বাংলা সাহিত্য ও ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় আত্মা মুক্তিলাভ করিয়াছে, বাঙালীই ভারতীয় সভ্যতাকে ভারতের তথা বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করিতে পারিয়াছে ও ভারতবাসীর জীবনে ও চিন্তাধারায় এই আত্মার জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া দিয়াছে। অতএব আধুনিক ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃতের স্থান অস্বীকার করা হয় নাই।

প্রশ্ন হইতেছে—উচ্চ বিদ্যালয়ে সংস্কৃত কতদূর শিখান হইবে? সময়ের গতির ফলে আজকাল স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মনে আদর্শের পরিবর্তন ঘটিতেছে। গত শতাব্দীতে উচ্চ বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের বুদ্ধিমান ও ধীমান ছাত্রদেরই একরকম একচেটিয়া ছিল। ব্রিটিশ রাজত্বে দেশের বুদ্ধিমান ও ধীমান যুবকদের সম্মুখে যে পথ খোলা ছিল সে পথ হইতেছে কিছু লেখাপড়া শিখিয়া সরকারী চাকুরী ও কয়েকটী ব্যবসায়ে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করা, যেমন—ওকালতি, ডাক্তারী ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি। এই কাজের জন্য উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজন হইত। কিন্তু আজকাল দেশে নানাবিধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হওয়াতে ও নানা রকম কাজ কর্ম্মের ফলে অনেক পথ খোলা হইয়াছে। এখন বহু যুবকই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যতীত আর একটু ভিন্ন ধরণের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া এই সব পথে যাইতে পারে। কেবল মাত্র শিক্ষার খাতিরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইলেই এখন উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লইতে হয়। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহিত্যানুগ শিক্ষাই এতকাল দেওয়া হইত। পরে কিছু কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাও দেওয়া আরম্ভ হয়।

কিন্তু আজকাল অনেকে উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া কোনরূপ কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবিকা অর্জ্জনে ব্রতী হইতে চান। তাঁহাদের জন্য ভিন্নরূপ শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুবা গতানুগতিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা তাহাদের পক্ষে অকারণ সময়, অর্থ ও শক্তিব্যয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। পশ্চিমে এই কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইবার পরই শিক্ষণীয় বিষয় দুইভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা যে দিকে যাইবে তাহারা তখন হইতেই সেইরূপ বিষয়ে পাঠ লইয়া থাকে। আমাদের শিক্ষাবিদগণও ক্রমশঃ এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরে কিছু কারিগরী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে দুই ভাগে ভাগ করিবার পূর্বে সংস্কৃত বা অন্য কোন ক্ল্যাসিকাল ভাষার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। ছাত্রের এগার বারো বৎসর বয়স হইলে মোটামুটি ভাবে বুঝা যায় তাহার মনের ধারা কিরূপ ও ভবিষ্যতে সে কিরূপ জীবিকা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইবে। তাহার অভিভাবক ও শিক্ষকগণ তাহার রুচি ও বুদ্ধির বিকাশ লক্ষ্য করিয়া এ বিষয়ে তাহাকে নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই দেশের বাছাই করা ছেলেমেয়ে আর এইরূপ বাছাই করা ছেলে মেয়ের সংখ্যা সর্ব্বদেশেই কম। অতএব এই সব ছেলেমেয়েদের জন্য প্রথম হইতেই ভিন্নরূপ পাঠ্যের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ

ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে (১) মাতৃভাষা, (২) ভূগোল,—নিজেদের দেশের ও পৃথিবীর, (৩) ইতিহাস,—নিজের দেশের ও পৃথিবীর, (৪) অঙ্ক, গণিত,—বীজগণিত ও জ্যামিতি, (৫) বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান—এই পাঁচটী বিষয় অবশ্য-পাঠ্য হওয়া সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত হইবে না। এইবার ষষ্ঠ বিষয়ের কথা বলি; সেটী হইতেছে মাতৃভাষা ভিন্ন অপর একটী ভাষা, যে ভাষা বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্ব-উদ্বোধক (Humanities) শিক্ষণীয় বিষয়ের দিক হইতে উন্নততর। ভারতবর্ষে সেই ভাষা বলিতে ইংরাজীই একমাত্র উপযুক্ত ভাষা। যদি বিরূপ মনোভাব বশতঃ এই ভাষা শিক্ষা আমরা বন্ধ করিয়া দিই তবে তাহা আমাদের মানসিক বিকাশ ও জাতীয় উন্নতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে।

পাঠ্যতালিকার সপ্তম স্থানে সংস্কৃত বা অন্য কোন ক্ল্যাসিকাল ভাষা দেওয়া হইবে কিনা এইবার সেই প্রশ্ন উঠিবে। কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে যাহারা সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয় (Humanities) পড়িবে তাহাদের পক্ষে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আছে, কিন্তু যাহারা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হইবে, তাহাদের পক্ষে সংস্কৃত ভাষা একটী মৃত-ভাষা বলিয়া মনে হইবে। অতএব সংস্কৃতকে উচ্চ বিদ্যালয়ে আবশ্যিক পাঠ্য করা সঙ্গত নয়।

সংস্কৃতের স্থান নির্দ্ধারণের পূর্বে আমাদের তিনটী বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (১) বর্ত্তমান ভারতে একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের পক্ষে এই ভাষার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, (২) উচ্চ বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্রছাত্রিগণ কোন একটি বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষা লাভ করিতে চায়, তাহাদের সে ব্যাপারে যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হইবে কিনা, অথবা অপর দিকে, যদি কেহ কোন বিষয় শিক্ষা করিতে একেবারে অপছন্দ করে তবে তাহার উপর সেই বিষয় জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইবে কি না এবং (৩) অন্যান্য দেশে যেখানে সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ কোন ক্ল্যাসিকাল ভাষা আবশ্যিক ভাবে পাঠ্য তালিকাভুক্ত আছে, সেখানকার অভিজ্ঞতার পর্য্যালোচনা।

(১) সংস্কৃত সাহিত্যের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক সম্পদের কথা বলা বাহুল্য। ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়া আমরা বর্ত্তমান জগতের অতি প্রয়োজনীয় ভাবধারার সহিত পরিচিত হই; যেমন, চিন্তাশক্তির স্বাধীনতা, সার্ব্বজনীনতা বা বিশ্ব-জনীনতা ও নাগরিকতা। এইগুলি প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রীক-শিক্ষার দান। সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের দিয়াছে জীবনের বিভিন্নতার মধ্যে একের উপলব্ধি, বহুর মধ্যে একের অস্তিত্ব-জ্ঞান ও দিয়াছে এই জীবনের পরমার্থিকতা যাহা এই জীবনে উপলব্ধ হইয়া পরজীবনে প্রসারিত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে জীবের অভিন্নতা বোধ; ধ্রুব বস্তু কি, তাহার মূল্য কতটুকু; সহগুণের সার্থকতা; দয়া, ধর্ম্ম, অহিংসা ও সৎকার্য্যে প্রেরণা ইত্যাদি—সবই সংস্কৃত শিক্ষা হইতে আমরা পাইয়া থাকি। বহু শতাব্দী যাবৎ সংস্কৃতই ছিল ভারতীয় আত্মা ও সংস্কৃতির প্রতীক বা চিহ্নস্বরূপ। আমাদের মানসিক ও আত্মিক প্রস্তুতির সঙ্গে সংস্কৃতের গভীর যোগ আছে। ইয়োরোপে গ্রীক ও ল্যাটিন যে অর্থে মৃতভাষা, ভারতে সেই অর্থে সংস্কৃতকে মৃতভাষা বলা যায় না। এখনও আমাদের জীবনে সংস্কৃত একটী বিশেষ স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। এখনও সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ আমদানী করিয়া আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমৃদ্ধ হইতেছে। নূতন নূতন ভাবধারার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ও বিজ্ঞান আলোচনার ফলে নিত্য নূতন পরিভাষা সৃষ্টির ব্যাপারে আজকাল সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার বাড়িয়া চলিতেছে। অতএব স্কুলের ছাত্রদের এই ভাষা একেবারে অবহেলা করা চলে না। বিজ্ঞানের ছাত্রদেরও কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করার দরকার। কারণ আমরা আশা করি যে আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান-বিষয়ক শব্দগুলিকে মাতৃভাষায় অনূদিত করিবেন। কাজেই সংস্কৃতে কিছু জ্ঞান থাকিলে এই বিষয়ে অনেক সুবিধা হইবে। আমাদের দেশের অনেক বৈজ্ঞানিকই সংস্কৃতজ্ঞ। এই দু'জনের মধ্যে বহুকাল হইতে যে নৈকট্য আছে তার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করা উচিত নয়।

(২) উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রের রুচি অনুসারে তার আবশ্যিক পাঠ্য স্থির করা ঠিক নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা

যায় যে, গণিত যদি তাহার ভাল না লাগে তবে তাহা বাদ দেওয়া যায় না; ভাল না লাগিলেও পরিশ্রম করিয়া উহা শিখিতে হইবে, ক্ষমতা কম থাকিলে চেষ্টার দ্বারা ক্ষমতাকে জাগ্রত করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রয়োজনমত সাহায্য ও চেষ্টার ফলে বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই কাজে ছাত্রের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। দৃঢ় পণ, পরিশ্রম ও মনসংযোগের ফলে গণিত শিক্ষার বাধা তাহাকে অতিক্রম করিতেই হইবে। কঠিন জিনিষ আয়ত্ত করিতে হইলে দৃঢ় পণ, পরিশ্রম ইত্যাদি গুণগুলির চর্চ্চা হয়; ইহার সুফল আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। অতএব যে সকল বিষয় আমাদের নিকট একান্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে, সে সকল বিষয় ছাত্রদিগকে শিখিতে হইবে।

(৩) অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা লাভবান হইতে পারি। দিল্লীস্থ বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসে গিয়া তাহাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যতটুকু জানা গিয়াছে তাহা এখানে উদ্ধৃত করা হইল। ফ্রান্সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাটিন ও গ্রীক বিভাগের প্রতি কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে মনোযোগী, সেখানকার অধ্যাপকরা বেশীর ভাগ ভাল ছেলেদের এই বিভাগে যাওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন। এই নির্দ্দেশের যে সত্যকার গুরুত্ব আছে সেটা জানা যায় এই থেকে যে, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় সার্টিফিকেট-ধারী ছাত্রগণ পলিটেকনিক স্কুলে অন্য ছাত্রদের চেয়ে কিছু বেশী সুবিধা পায়। অবশ্য সেখানে কয়েকটী কলেজ আছে—যেখানে ল্যাটিনের চেয়ে আধুনিক কোনও চল্‌তি ভাষাকে বেশী পছন্দ করা হয়। যাই হোক না কেন, ফ্রান্সে বিজ্ঞান-শাখার ছাত্রদের ক্ল্যাসিকাল ভাষায় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা হয় এবং সেই কারণে তাদের জন্য আলাদা পাঠ্যসূচী নির্দ্দিষ্ট আছে। ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যসূচী চারিটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে দুইটীতে ল্যাটিন অবশ্যপাঠ্য, একটীতে ল্যাটিন ও গ্রীক দুটীই অবশ্যপাঠ্য; চতুর্থটীতে কেবল ল্যাটিনের বদলে একটী আধুনিক ভাষা পড়িবার ব্যবস্থা আছে। এইভাবে সমস্ত ছাত্রকে ল্যাটিন পড়িতে বাধ্য না করিয়াও ল্যাটিনকে সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

জার্ম্মাণ শিক্ষাব্যবস্থায়—যে ব্যবস্থা এখনও পশ্চিম জার্ম্মাণীতে চালু আছে, সেখানে ল্যাটিন অবশ্যপাঠ্য না হইলেও ছাত্ররা দশ বৎসর হইতে ল্যাটিন ও তের চৌদ্দ-বৎসর হইতে গ্রীক পড়িতে সুরু করে। ধর্ম্মতত্ত্ব ও ডাক্তারী বিভাগে প্রবেশ করিতে হইলে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা ভাল রকম জানা থাকা প্রয়োজন। বেলজিয়মের উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রধান দুইটী অংশে বিভক্ত: গ্রীক-ল্যাটিন বিভাগ ও ল্যাটিন-গণিত বিভাগ লইয়া একটী অংশ ও বিজ্ঞান-বিভাগ ও বাণিজ্য-বিভাগ লইয়া আর একটী অংশ। আইন, চিকিৎসা ও অন্যান্য মনুষ্যত্ব-উদ্বোধক বিষয়ে (humanities) শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে ল্যাটিন ভাষার ডিপ্লোমা থাকা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও আইন বিভাগে ল্যাটিন অবশ্যপাঠ্য।

ইটালীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (তিন বৎসর) ল্যাটিন অবশ্যপাঠ্য এবং সাধারণ উচ্চ বিদ্যালয়ে (Classic High School) ল্যাটিন ও গ্রীক উভয়ই অবশ্যপাঠ্য। উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে যেগুলিতে বিশেষভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় (Scientific High School) সেখানে গ্রীক ও ল্যাটিন উভয়ই অবশ্যপাঠ্য না হইলেও শুধু ল্যাটিন অবশ্য-পাঠ্য। এই দুই ধরণের বিদ্যালয়েই পাঁচ বৎসরের কোর্স পড়ান হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে আজকাল যে সকল ছাত্ররা সাহিত্য ব্যতীত অন্য বিষয়ে পড়াশুনা করিতে চায় তাহাদের ল্যাটিন অবশ্যপাঠ্য নয়, তবে সাধারণ ভাবে বলা যায়, প্রায় সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ল্যাটিনের উপর বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষার পক্ষে ল্যাটিনের প্রয়োজনীয়তা আছে। এটা মনে রাখা দরকার যে ইংরাজী ভাষা ল্যাটিন থেকে উদ্ভূত নয়।

মেক্সিকোতে স্প্যানিশ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ভাষা ল্যাটিন থেকে উদ্ভূত। তাই সেখানে স্নাতক-পূর্ব্ব বিদ্যালয়ে দু'বছর ল্যাটিন ও এক বছর গ্রীক অবশ্যপাঠ্য।

এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, আমাদের

দেশে শিক্ষাব্যবস্থা মাধ্যমিক স্তর থেকে দুটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিবার পর (অর্থাৎ একটী ভাগে ব্যবসা, বাণিজ্য, কারিগরী বিদ্যা ইত্যাদি ও অপর ভাগে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, আইন, ডাক্তারী ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিতব্য বিষয়) সংস্কৃতকে দ্বিতীয় ভাগে অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। কারণ প্রথমতঃ ভারতবাসীর নিকট সংস্কৃতের সাংস্কৃতিক মূল্য খুব বেশী, দ্বিতীয়তঃ অল্পবয়সে এই প্রয়োজনীয় বিষয়টী আয়ত্ত করা প্রয়োজন, তৃতীয়তঃ অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। অন্যান্য দেশে যেমন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অনুরূপ একটী ক্লাসিকাল ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, এখানেও সেইরূপ সংস্কৃতকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী পঠিতব্য বিষয় হিসাবে রাখিয়া দেওয়া ভাল।

শিক্ষার ভিত্ তৈয়ারী করার জন্য ভারতীয় ছাত্রদের কতকগুলি অবশ্যপাঠ্য বিষয় আছে; সেগুলি এই :—

(১) **পুরাণ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য**—যাহার ফলে ব্যাস, বাল্মিকী, কালীদাস, হোমার, ভার্জ্জিল, সেক্সপীয়ার, গ্যেটে প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মনীষিদের ভাব-সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া যায়।

(২) **শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, সক্রেটিস, খ্রীষ্ট ও বর্ত্তমান-কালের রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ, গান্ধী, ম্যাটসিনি, আব্রাহাম লিঙ্কন, কুরীদ্বয় প্রভৃতির জীবনী ও তাঁহাদের দেওয়া উপদেশ ও শিক্ষা।**

(৩) **ভারতের ইতিহাস**—

যাহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিবে ভারতের সত্যকার পরিচয়। জানা যাইবে কেমন করিয়া এখানে ধর্ম্মের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে; এখানকার অধিবাসীদের জীবনে নীতির বন্ধন কেমন করিয়া প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; কেমন করিয়া এখানকার মানুষ যুগের উত্থান পতনের ঊর্দ্ধে শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে; কেমন করিয়া কবিরা গান গাহিয়াছেন, বীরেরা মৃত্যু বরণ করিয়া গিয়াছেন ও সাধুরা দেশের ও দশের উন্নতি করিয়া গিয়াছেন; কেমন করিয়া একটীমাত্র বই মহা-ভারত ও একটী ভাষা সংস্কৃত ভারতবাসীকে আবহমানকাল ধরিয়া এগিয়ে চলার প্রেরণা ও শক্তি জুগাইয়া আসিয়াছে, যার ফলে সে মধ্যযুগীয় নৃশংস বর্ব্বরতার উপর জয়ী হইতে পারিয়াছে; কেমন করিয়া পরাধীনতার বিরুদ্ধে রক্তহীন সংগ্রামের ফলে আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হইল এবং সমস্ত জনগণের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত সেই রাষ্ট্র সমস্ত বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল; কেমন করিয়া ভারত সাংস্কৃতিক পুনর্জন্ম লাভ করিয়া বিশ্বকে শান্তি ও সৌন্দর্য্যের বাণী শোনাইল,—এ সমস্তই শিক্ষা করা প্রয়োজন।

(৪) **ইতিহাস পাঠ**—

যে ইতিহাস পাঠে দেখা যায় সময়ের পথ ধরিয়া মানব জাতি ক্রমশঃ স্বাধীন ও দায়িত্বশীল হইয়া উঠিতেছে; যে ইতিহাস জীবনের সাধারণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও বর্ব্বরের ধ্বংসকারী ক্ষমতার ও রাষ্ট্রের উত্থান পতনের ইতিহাস নয়; যাহা মানুষের নূতন মূল্যবোধের, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে প্রীতির বন্ধন গড়িয়া উঠিবার ইতিহাস; যাহা শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস নয়, মনুষ্য-জাতির নৈতিক চেতনা ও উন্নতির ইতিহাস। এই ইতিহাস কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তির জীবনের ইতিহাসও হইতে পারে।

(৫) **পুনঃ পুনঃ গীতার শ্লোক পাঠ করা।** এইরূপ পাঠে মানুষের মনে শান্তি আসে, অন্তর বিকশিত হয় ও সর্ব্বত্র ভগবানের অবস্থিতি অনুভব করা যায়। সত্য কথা বলিতে কি, এই চেতনাই মানুষকে বিশ্বের সমস্ত দ্বন্দ্বের সমাধানে এবং সত্যকার এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন গঠনে সাহায্য করিতে পারে।

কাঞ্চন কৌলিন্যের দিনে শুধু আদর্শের কথা বলিয়া ক্ষুধিত শিক্ষককে উপহাস করিও না। জাতির কল্যাণের জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত জীবিকা ও মর্য্যাদা দাও।

অনেক খুঁজে অবশেষে বউবাজারের এক গলির মধ্যে একটা আস্তানা জুটে গেলো। সিংগেল সিটেড্ রুম—রুম তো নয়, পার্টিশান দেওয়া ছোট একটা পায়রার খুপ্‌রি। তবু বন্ধুবর পরমেশ যদি দয়া না করতো তা হলে যে আরো কতো ঘাটের জল খেয়ে আমাকে বেড়াতে হোত তার ঠিকানা নেই। ছোটখাটো একটা বোর্ডিং-হাউস বলা যায় এটাকে। নাম 'অন্নপূর্ণা হোটেল'। বাইরে সাইন বোর্ডের উপরে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে:

"ভদ্র মহোদয়গণের জন্য খাইবার এবং থাকিবার সুবন্দোবস্ত আছে।"

সুবন্দোবস্ত যে কতো সে আর ব'লে কাজ নেই—তবু বাড়ীর এই দুর্দিনে আমার যে মাথা গুঁজবার 'সিংগেল সিটেড' পায়রার খুপ্‌রি জুটেছে—তাই যথেষ্ট। গলির মুখটাতেই একটা ডাষ্টবিন্—বাড়ী ঢুকবার সময়ে মনটা কেমন যেন ঘিন্ ঘিন্ ক'রে ওঠে। তারপরে ভাঙা আর অন্ধকার একটা দরোজা পার হ'য়ে উঠোনে এসে পড়লেই আপনার চোখে পড়বে: একরাশ এঁটো থালা বাসন নিয়ে এখানকার চাকর অনন্তরাম কলতলাটার আঁকিয়ে ব'সে আছে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গেলে এক রকম তার ঘাড়ের উপর দিয়েই যেতে হবে আপনাকে—সেই এঁটো বাসন, মাছের কাঁটা, ভাত আর তরকারীর ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্টের দিকে তাকালে নিজের থেকেই পেটের নাড়ী উল্‌টে আস্‌বে তাতে সন্দেহ কি? তবু উপায় নেই, এমন একটা আস্তানা যে অনেক চেষ্টা ক'রে জোগাড় ক'রতে পেরেছি, তাতেই নিজেকে কৃতার্থ ব'লে মনে করি।

ছোট একটা বাঙালীর মার্চেণ্ট অফিসে কনিষ্ঠতম কেরাণীর পদ অধিকার ক'রে ব'সে আছি। সুতরাং এই যুদ্ধপরবর্তী যুগে কি আরামে যে আমার দিন কাটে তা আপনারা সহজেই অনুমান ক'রে নিতে পারবেন। তবু বক্ষে এই যে আমার নিজস্ব সংসার বল্‌তে কিছু নেই—কিছু করবার কথা মনে হ'লেও সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। দেশে বৃদ্ধা জননী এবং একটী মাত্র ভাই আছে, মাসান্তে যৎসামান্য অর্থ পাঠিয়ে দিয়ে কোন রকমে কর্তব্য পালন করি। বাকী যা থাকে তাই দিয়ে কায়ক্লেশে দিন পাত হয়।

দিন বেশ চল্‌ছিলো বল্‌তে পারেন, অফিসের পরে এসে আমার ঘরের সামনে যে ছোট্ট একটুকরো বারাণ্ডা আছে সেখানে আমার বহুদিনের পুরাণো অর্ধভগ্ন ইজিচেয়ারটা পেতে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে সস্তাদামের সিগারেট একটির পর একটি শেষ করতে বেশ লাগে। ঠিক এই সময়ে অনন্তরাম এক কাপ চা নিয়ে এসে আমাকে দিয়ে যায়। এ আমার দৈনন্দিন বরাদ্দ। মাসের শেষে হিসেব করে তাকে পয়সা দিয়ে দিই—ছেলেটী সত্যি ভালো—আমাকে বেশ সশ্রদ্ধ চোখেই দেখে।

কিন্তু আজ কয়েকদিন থেকে তার শ্রদ্ধার ভাবটা অতিরিক্ত রকম বেড়ে উঠ্‌ছে লক্ষ্য করলুম। নিশ্চয়ই কিছু কারণ ঘটেছে। তবু মুখে কিছু না ব'লে, চা খেয়ে নিজের খাতাটা টেনে নিয়ে বস্‌লুম। ছোটবেলা থেকে একটু আধটু গল্প লেখার অভ্যাস আছে, ছোটখাটো দুচার আনার সাময়িক পত্রে মাঝে মাঝে দু একটা লেখাও

আমার ছাপা হয়ে থাকে—সেই আনন্দেই খুব আগ্রহ নিয়ে পরবর্তী আর একটী গল্প লিখ্‌তে বসি—সময়টা নিতান্ত মন্দ কাটে না!

খাতাটা নিয়ে কলমের ক্যাপ খুলে সবে ব'সেছি, লক্ষ্য করলুম অনন্তরাম চায়ের কাপটী আমার পাশে রাখা ছোট টিপয়ের উপরে রেখে উবু হ'য়ে বস্‌লো। বেশ কিছুক্ষণ সময় এইভাবে কাট্‌লো, তারপরে আমি যেন এইমাত্র হঠাৎই তাকে লক্ষ্য ক'রেছি, এইভাবে তার দিকে চেয়ে বললুম, আরে—ব'সে আছিস্ যে, কিছু বল্‌বি আমাকে?

—আইজ্ঞা ছার! কিন্তু কথা ছিলো আপনের লগে,—আস্তে আস্তে, কথাগুলি উচ্চারণ করলো অনন্ত। সম্ভবত তার ধারণা, আমরা পশ্চিম বাংলার লোকেরা পূর্ববাংলার কথ্য ভাষা সহজে বুঝতে পারিনা। বিশেষ করে তার দেশ যখন খাস চট্টগ্রামে।

বললুম, বেশ তো, কি বল্‌বি বল্?

—আইজ্ঞা ছার! হেয়া বরো গোপন কথা, আপনি যদি হোনেন মন দিয়া তো কই!

'ছার' অর্থাৎ 'স্যর'! হেসে বললুম, বেশতো মন দিয়েই শুন্‌ছি—বল্!

—আইজ্ঞা আমার একখান্ পত্তর লেখন প্রেয়োজন অইছে। বহুৎ দিন যাবৎ লেহি নাই—লেহা পড়া তো কিছুই শিহি নাই ছার—তাই এই দুর্গতি অইসে, আপনে যদি কিরপা কইরা লেইখ্যা দ্যান এটু।

আমাদের সংগে কথা বলবার সময়ে পূর্ববাংলার পাঁচমিশেলী ভাষা ব্যবহার ক'রে অনন্তরাম, বোধহয় তার ধারণা, এতে তার বক্তব্য আমরা সহজে অনুধাবণ করতে পারবো।

বললুম, পত্তর লিখবি? তা কাকে লিখবি তুই? ব'লে ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে তার দিকে তাকালুম। ঠোঁটের উপরে জোর ক'রে একটুকরো হাসি টেনে নিয়ে এসে অনন্তরাম বললে, হেই কথাই তো কমু আপনেরে—হেয়ার লইগ্যাই তো এভাবে গোপন কথাই কইছি, আমার এউগ্যা দিদি আছে—তারে একটা চিঠি ল্যাখতে অইবো, আমারে বরো ভালোবাসে হে, ছার।

বললুম, ভালো কথা, লিখে দেবো চিঠি—ঠিকানাটা দিস্!

—ঠিকনা? হেয়াতো আমি জানিনে ছার!

—তবে চিঠি লিখ্‌বি কি ক'রে?—এবার একটু বিরক্ত হ'য়েই তাকালুম তার দিকে।

—বাহারে! এডা কেমুন কথা কইলেন আপ্‌নে, ছার! আমাগো জিলা চট্টগ্রাম, আর আমার দিদির নামডা ল্যাখালেই হগল চিঠি যায়—হেইডাই লেইখ্যা দিবেন, তা অইলেই অইবো!

ছেলেটার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম—আচ্ছা পাগলের পাল্লায় প'ড়েছি যা হোক্। ছেলেটার

'আইজ্ঞা, আমার একখান পত্তর লেখন প্রয়োজন অইছে'

বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নেই দেখা যাচ্ছে, হাতের গল্পটা বেশ জমে উঠেছিলো, এমন সময় এই হতভাগার উৎপাতে ভারি বিরক্তি এলো মনে, বললুম, এখন যা, পরে আসিস, দেখবো। আর কোনো কথা না ব'লে অনন্তরাম চ'লে গেলো।

তারপর প্রায় একটা সপ্তাহ পার হ'য়ে গেছে, নানা রকম কাজের ভীড়ে অনন্তর কথাটা ভুলেই গিয়েছিলুম—সেদিন সন্ধ্যার পরে চায়ের কাপটা টিপয়ের ও'পরে নামিয়ে রেখে ভক্তপ্রবর হনুমানের মতো আবার আমার কাছে হাত জোড় ক'রে বস্‌লো সে।

মুখের দিকে চাইতেই সমস্ত ঘটনাটা আবার মনে প'ড়ে গেলো, তবু বল্‌লুম, কি অনন্তরাম, কি সংবাদ?

—ছার, কয় রাত্তির ওইতে মন্‌ডা বরো হাকর ফাঁকর করে—কিছুই ভালো লাগে না!

বললুম, কেন? কি হোল, আবার তোর? অসুখ হ'য়েছে নাকি?

—আইজ্ঞা, না ছার। ওসুখ টৌসুখ আর নাই—কাল রাত্তিরে একডা হপন্ দ্যাখছিলাম!

বললুম—কি স্বপ্ন?

—আইজ্ঞা, আমার দিদি যেন আইছিলো আমার মাথার কাছে, কতো কথা কইলো সে, আদর করলো, আমাকে বারে বারে যাইতে কইলো তাগো বাড়ী, 'কতকাল তরে দ্যাখিনাই অনন্তরাম—একবার চইল্যা আয় দ্যাশে!

শুনে বললুম—অ!

—আইজ্ঞা ছার—হেয়ার লইগ্যাই তো কই, আমার হেই চিড্ডিডা যদি লেইখ্যা দ্যান!

বললুম, চিঠি তো লিখতে পারি—কিন্তু কোথায় পাঠাবো, ঠিকানা জান্‌লে তবে তো চিঠি লিখবি?

—আইজ্ঞা ছার—হেয়াতো ঠিকই কইছেন, তয় অইতো কইলাম আপনেরে, জিলা চট্টগেরাম আর দিদির নামডা—হেইলেই যাইবে! আহা, দিদি আমারে যে কতোটা ভালোবাসে হেয়া আপনেরে আর কি কইবো আমি? তা লেইখ্যা দিবেন হার?

আচ্ছা বদ্ধ পাগলের পাল্লায় প'ড়েছি—তবু তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে বললুম, আচ্ছা দেবো এখন লিখে, পরে আসিস্!

—আইজ্ঞা ছার! কহ'ন আমু এড্ড কইয়্যা দেন, আহা, দিদি আমার পত্তরডা না পাইয়া একেবারে হুকাইয়া গেছে দ্যাখ্‌লাম—বারে বারে কইলো পত্তর দিস্ অনন্ত—পত্তর দিস্!

বললাম ঘরে আসিস সন্ধ্যার পরে—দেবো এখন লিখে।

অফিসের কাজ—একটা বন্ধুর বিয়ে, তার উপরে হটাৎ দেশ থেকে কয়েকদিনের জন্যে ঘুরে আসায় প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে আর আমার অনন্তরামের কথা মনে ছিলো না। আমার এই ব্যস্ততা দেখে সে আর সাহস ক'রে কিছু বলেনি। আজকে সন্ধ্যার পরে সুযোগ দেখে আবার চুপচাপ জোড় হাতে এসে বস্‌লো আমার আছে।

বললুম—কি সংবাদ, অনন্তরাম?

—আইজ্ঞা ছার হেই চিড্ডিডা!—মনে মনে খুবই লজ্জা পেলুম, বললুম—বোস তুই একখুনি লিখে দিচ্ছি তোর চিঠি!

তারপরে কলমটা আর একখানা সাদা কাগজ টেনে নিয়ে বললুম, বল, কি লিখতে হবে?

আনন্দে অনন্তরামের চোখ মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, বললে, লেইখ্যা দ্যান, বরো দিদি, আপনের ছি চরণে কোটী কোটী পেরনাম জানাই—পরে লিখি আপনেরে দেহার লইগ্যা মন্‌ডা বরোই হাকর ফাঁকর করে, দ্যাশে যাইতে সাধ যায় খুব—কিন্তু টাহা পয়সার বরোই অভাব!

অনন্তরাম অনর্গল ব'লে যেতে লাগলো আর মাথা নীচু করে সাদা কাগজের উপার শ্রুতি লিখনের নামে কতগুলি দাগে দাগে কাগজটাকে ভরিয়ে দিলুম আমি।

চিঠি লেখা শেষ হ'লে সন্তর্পণে সে একটা খাম আমার দিকে এগিয়ে দিলে। আমি আগ্রহের সংগে সেটা নিয়ে বললুম, ঠিক আছে, কালকেই তোর এই চিঠি ডাকে দিয়ে দেবো।

আমাকে সেখানেই উপুড় হয়ে মাটীতে একটা সভক্তি প্রণাম ক'রে অনন্তরাম নীচে বাসন মাজতে চলে গেলো।

পরের দিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরেই অনন্তরামকে বললুম, তোমার চিঠি আজ ডাকে ছেড়ে দিয়েছি—এতোক্ষণে অনেকটা পথ চলে গেছে!

খুসীতে সমস্ত মুখটা ভরে উঠ্‌লো তার। বলল, দ্যাখবেন ছার—দিদি আমারে কি পত্তরডা না পাডায়—আপনি বোঝবেন তহন, কতোডা ভালোবাসে আমারে সে। শিশুকালে উনিই আমারে পালছিলো কিনা!

হেসে বললুম, বেশ তো! দেখবো এখন!

তারপরে পুরো একটা সপ্তাহ পার হ'য়ে গেছে, হঠাৎ অনন্তরামকে জিজ্ঞেস করলুম, কি অনন্ত, চিঠিপত্র কিছু পেলে তোমার দিদির কাছ থেকে?

—আইজ্ঞা না ছার! এহন্ তক্ কিছুই আসে নাই—তবে কথাডা কি জানেন ছার, অনেক দূরের পথ তো, চিটি আইতে দেরী তো অইবেই!

বললুম, হ্যাঁ—তা বটে!

আরো এক সপ্তাহ পার হ'য়ে গেলো। আজকাল দেখি, আধঘণ্টা একঘণ্টা অন্তরই অনন্ত গিয়ে লেটার বক্সটা দ্যাখে—চিঠিপত্র এলেই ম্যানেজারের টেবিলে নিয়ে গিয়ে দেয়, আর তারপরে সকরুণ নেত্রে নিজের চিঠির আশায় সেই গোছা গোছা চিঠিপত্রের গাদার দিকে চেয়ে থাকে।

তবু আবার একদিন মজা দেখবার জন্যেই জিগ্‌েস করলুম, কি অনন্তরাম—তোমার দিদির কি সংবাদ?

—আইজ্ঞা ছার, পত্তর খান তো এহনও আসে নাই—তবে কথাডা কি জানেন ছার—দিদি বরো কামের মানুষ কিনা, সময়ই তো পায় না, পত্তর খানা হে দেবেই, দ্যাখবেন আপনে!

শেষের কথাগুলি সে বেশ জোর দিয়েই বললো।

আরো একটা সপ্তাহ পার হ'য়ে গেলো। অনন্তরামের চোখ মুখে বেশ গভীর একটা হতাশার ভাব যে ফুটে উঠ্‌ছে তা বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করতে লাগ্‌লুম!

আজকাল পথের উপরে পিওনকে দেখ্‌লে সে নিজে দৌড়ে এগিয়ে যায় তার কাছে, তারপরে জিজ্ঞেস করে অনন্ত বড়ুয়ার নামে কোনো চিঠি আছে নাকি তার কাছে, তারপরে নেই শুনে হতাশ হৃদয়ে আবার ফিরে আসে কলতলায়, মাথানীচু করে এক গাদা বাসন টেনে নিয়ে বসে।

আমি আর এ দৃশ্য দেখ্‌তে পারছিলুম না। একটা উপায় বের করলুম। সেই রাত্রেই একটা পোষ্টকার্ডে গোটা গোটা কাঁচা অক্ষরে লিখ্‌লুম:

"পেরাণের ভাইডী

অনন্তরাম!

তোমার পত্তরখানা পাইলাম! আহা, আমি এই পত্তর পাইয়া যে কী পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা লিখিতে পারিতেছি না। তুমি আমার এই পত্তর পাইয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিবা—কতকাল অইলো তরে আমি দেহি নাই। তুমি আমার শত শত আশীর্বাদ জানিবা

ইতি—তোমার বরদিদি।"

চিঠি শেষ ক'রে অনন্তরামের নাম দিয়ে এই অন্নপূর্ণা হোটেলের ঠিকানা লিখে দিলুম। পরের দিন বিশেষ কাজে বালীগঞ্জ ষ্টেশনে যেতে হয়েছিলো আমাকে, সেখান থেকেই কার্ডখানা ডাকে দিয়ে দিলুম।

পরের দিনই অনন্তরাম দৌড়তে দৌড়তে সেই চিঠি নিয়ে আমার কাছে এসে হাজির! বললো, ছার, এই ছাহেন্, দিদি আমারে পত্তর দিছে—কই নাই আপনেরে—দিদি আমারে চিডি না লেইখ্যা যাইবো কই—ল্যাখতেই অইবে—আপ্‌নে পরেন ছার—এ আমি চিনি, দিদি স্বহস্তে ল্যাখ্‌ছে, আপনেরে কই নাই ছার?

আগ্রহের সংগে তার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে ভালো ক'রে থেমে থেমে আবৃত্তি করে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে প'ড়ে গেলুম। উৎকর্ণ হয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটী কথা শুন্‌তে লাগ্‌ল অনন্তরাম। চিঠি পড়তে পড়তে আড়চোখে চেয়ে দেখলুম, পরম তৃপ্তিতে তার সমস্ত চোখ-মুখ ভ'রে উঠেছে—চিঠির প্রত্যেকটি কথা যেন তার কাণে মধুবর্ষণ করছে।

(শেষাংশ ১৪৩ পৃষ্ঠায়)

পরিদর্শক ও শিক্ষক

চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আজ পরিদর্শক আসবেন—এ সংবাদ শিক্ষক পেলেন। পাওয়া মাত্র বিদ্যালয়গৃহের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা সম্মার্জ্জনীর তাড়নায় অপসারিত হ'ল, অবিন্যস্ত অগোছাল আসবাবপত্রগুলি রাখবার ব্যবস্থা হ'ল যথাস্থানে, হাজিরা বহির ফাঁকা অংশগুলি লিখিত হ'ল এবং সর্ব্বোপরি সমগ্র গ্রাম তোলপাড় করে ছাত্র সংগ্রহ করে শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ে হাজির হলেন—নির্দ্দিষ্ট সময় ১১টার কিছু পূর্ব্বেই।

পরিদর্শক প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে উপস্থিত হয়ে দেখলেন—পরিপাটী ব্যবস্থা; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয় গৃহ, আশাতীত ছাত্র-উপস্থিতি, খাতাপত্র সুষ্ঠভাবে রক্ষিত। বলা বাহুল্য পরিদর্শক মহাশয় পরিদর্শনান্তে প্রীত হলেন। পরিদর্শন-বহিতে বিদ্যালয় ও শিক্ষক সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করে পরিদর্শক মহাশয় দ্বিচক্রযানে কাছাকাছি আর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হ'লেন। বেলা প্রায় দুটো। তিনি লক্ষ্য করলেন—ছাত্র আর শিক্ষক দুই-ই অনুপস্থিত। বিদ্যালয়-গৃহ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। মেঝের উপর একগাদা ছেঁড়া কাগজ—কিছু গরুর খাবার খড়—এককোণে দুটি গরু। বেশ বোঝা গেল—দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষকের সম্বন্ধ নেই। পরিদর্শক শ্রান্ত-ক্লান্ত—রৌদ্রে একটানা সাইকেল ঠেলে একটু বিশ্রামের আশায় ঐ বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। সম্পাদক মহাশয় বাড়ীতেই ছিলেন—তিনি শশব্যস্তে ইনস্‌পেক্টার বাবুকে অভ্যর্থনা জানালেন।

পরিদর্শকই প্রথম কথা বল্লেন—"আজ কি স্কুল বসেনি?"

সম্পাদক—"আজ্ঞে—বসেছিল, তবে আপনি আসবার কিছুক্ষণ আগেই ছুটি হয়ে গেল।"

পরিদর্শক—"শিক্ষক কোথায়, একবার ডাকুন তো?"

সম্পাদক—"আজ্ঞে—তিনি এইমাত্র হাটে গেলেন।"

ইত্যবসরে দু'চার জন গ্রামের লোক এসে জড় হ'য়েছে—তার মধ্যে একজন মোড়ল-গোছের লোক হঠাৎ বলে বসলেন,—আজ্ঞা, হাট-বাজার যাওয়া কথাটা মিথ্যে। আজ সাত দিন হ'ল, শিক্ষক মহাশয় স্কুলে অনুপস্থিত। কোথায় যে গেছেন আমরা কেউ জানিনে। তারপর একটু থেমে বল্লেন, "আপনি আসবেন জান্‌লে—আমরা তাঁকে খবর দিতাম—দেখতেন, স্কুলে ছাত্র ধরে না।

পরিদর্শক মহাশয় মৃদু হাসেন, বলেন—স্কুলের খাতাপত্রগুলো ত আছে, সেইগুলোই আনুন,—একটু দেখি।

খাতাপত্রগুলি সম্পাদক মহাশয়ের বাড়ীতেই রাখা হয়—সেগুলি দেখে পরিদর্শক ত হতবাক্! আজ প্রায় দুইমাস যাবৎ শিক্ষক-হাজিরা ও ছাত্র-হাজিরা অলিখিত—একটি কালির আঁচড়ও পড়েনি।

পরিদর্শক মহাশয় সে রাত্রি অতিবাহিত করেন সম্পাদকের গৃহে। সন্ধ্যার দিকে গ্রামের ৫০।৬০ জন লোক দলবদ্ধ ভাবে পরিদর্শক কর্ম্মচারীর সহিত দেখা ক'রে শিক্ষকটির পদচ্যুতির দাবী জানান—কেউ কেউ বলেন বদলী করতে। তাঁরা শুধু শিক্ষক মহাশয়কেই এই দুরবস্থার জন্য দায়ী করেন না; সম্পাদক ও স্কুলকমিটির সদস্যদেরও পরিবর্ত্তনের দাবী জানান।

পরের দিন সকালবেলা সংবাদ পেয়ে শিক্ষক উপস্থিত হয়ে যাহোক একটা কৈফিয়ৎ দেন। বলেন, অভিভাবকেরা শিক্ষার মর্ম্ম বোঝেন না, ছাত্রদের বিদ্যালয়ে যথারীতি পাঠান না—বিদ্যালয় ভালভাবে চলে না, কাজেই তিনি অনুপস্থিত থাকেন, কিংবা মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন।

পরদিবস পরিদর্শক আবার দ্বিচক্রযানে বহির্গত হন। নদীনালা ভেদ ক'রে অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে তিনি চলেছেন গ্রামের সঙ্কীর্ণ পথে। চার মাইল দূরে গিয়ে একটি বিদ্যালয়

চোখে পড়ে। তিনি বিদ্যালয় গৃহে প্রবেশ করেন। বিদ্যালয় বালক-বালিকাদের কলরবে মুখরিত। শিক্ষক অনুপস্থিত—বেলা তখন ১২টা। বেলা ১টার সময় প্রধান শিক্ষক মহাশয় এলেন, দেরী হওয়ার কৈফিয়ৎ দিলেন,—রান্না হয়নি সময় মত। ২য় শিক্ষক এলেন আরও আধ ঘণ্টা পরে। বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিলেন—স্ত্রীর অসুখ। কৈফিয়ৎ তৈরীই আছে—"নেমতন্ন", কিংবা "রান্না হয়নি",—"বেলা ঠাহর করতে পারিনি".....ইত্যাদি। খোঁজ নিয়ে দেখা যায় শতকরা ৯০টি কৈফিয়ৎই মিথ্যে।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে বাধ্য হচ্ছি—এই প্রকার মিথ্যার দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান শিক্ষক ও পরিদর্শকের মধ্যে। সহজ সরল সাবলীল রূপ চোখে পড়ে না—কৃত্রিমতার জটিলতা ভেদ করে আসল রূপটিকে ধরা বড় কঠিন। পরিদর্শক বিদ্যালয়ে গিয়ে তার স্বরূপ দেখতে পান না। সংবাদ দিয়ে গেলে দেখতে পান—সবই কৃত্রিম, সবই সাজানো। পরিদর্শক গেলে শিক্ষক তথা ছাত্রগণ তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। শিক্ষক পরিদর্শককে ভাবেন 'তক্ষক' কিংবা 'ভক্ষক', আর ছাত্রগণ তাঁকে ততোধিক ভীতিপ্রদ জীব মনে করে। শিক্ষককে দোষ দিতে পারি না,—কেন না আবহমান কাল থেকে শিক্ষকেরা দেখে এসেছেন—পরিদর্শক শুধু বিদ্যালয় ও শিক্ষকের দোষ-ত্রুটী ধরতে এসেছেন, কটু মন্তব্য লিখতে এসেছেন,—আর এসেছেন গালাগালি দিতে। সর্ব্বোপরি ভয় এই যে—চাকুরী খেতে এসেছেন! কাজেই পূর্ব্বে সংবাদ পেলেই—তাঁরা অন্ততঃ পরিদর্শক নামক জীবটির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কৃত্রিম ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করেন,—যা-নয়-তাই পরিদর্শককে দেখিয়ে এ যাত্রা রেহাই পাবার ব্যবস্থা করা হয়—নানাভাবে।

কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি—পরিদর্শক কর্ম্মচারী শিক্ষকদের friend, philosopher and guide. তাছাড়া এই ইনস্‌পেক্টার কথাটি অন্ততঃ বিদ্যালয়ের পরিদর্শককে বলা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। "ইন্‌কামট্যাক্স ইন্সপেক্টার"—"এগ্রিকালচার ইন্সপেক্টার" "আবগারী ইন্সপেক্টার"—আর "স্কুল ইন্সপেক্টার"। শেষোক্তটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—ইন্সপেক্টারের পরিবর্ত্তে "স্কুল অর্গানায়জার" কথাটিই বেশী প্রযোজ্য। কেন না বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজ শুধু পরিদর্শন, নয়, পরিদর্শন,—পর্য্যবেক্ষণ, অর্গানিজেশান্ এবং পরে পর্য্যালোচনার পর যথার্থ পথের সন্ধান দান। উন্নয়ন পরিকল্পনা, সামাজিক শিক্ষার প্রসার, শিক্ষকের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অভাব অভিযোগের প্রতিকার—সবগুলির প্রতি পরিদর্শকের থাকবে দৃষ্টি, তিনি এই কাজসমূহে করবেন আত্মনিয়োগ। পরিদর্শকের কাজ খুব ব্যাপক, শিক্ষার অগ্রসরতা, অনগ্রসরতা তাঁর কার্য্য ক্ষমতা এবং কার্য্যসূচীর উপর নির্ভরশীল। পরিদর্শককে কাজ করতে হ'বে এই শিক্ষক মণ্ডলীকে নিয়ে। বিদ্যালয় যেন একটি দুর্গ এবং শিক্ষকেরা এক একজন সৈন্য আর পরিদর্শক সেনাপতি। সেনাপতির উদাত্ত আহ্বানে সৈনিকেরা সাড়া না দিয়ে পারেন না—যদি সেনাপতির দরদ, মমত্ববোধ আর সহানুভূতি থাকে সৈনিকদের উপর।

দোষ-ত্রুটী নিয়েই মানুষ। পরিদর্শকও ত্রুটীশূন্য নন। পরিদর্শক বন্ধুর মত প্রীতি আর অভিভাবকের মত দায়িত্বপূর্ণ অনুশাসন নিয়ে অগ্রসর হবেন। তিনি কিছু দেবেন, কিছু গ্রহণ করবেন ও করাবেন, আর যা কিছু ভাল তিনি এক বিদ্যালয়ে লক্ষ্য করেন,—তা ছড়িয়ে দেবেন অন্য বিদ্যালয়ে। পরিদর্শক নব নব ভাবধারার ধারক ও বাহক। এক বিদ্যালয়ে যা কিছু নূতন ও সুন্দর তাঁর চোখে পড়বে, তিনি তা প্রচার করবেন অন্য বিদ্যালয়ে। এই ভাবেই শিক্ষা প্রসার লাভ করবে। শিক্ষকদের বুঝিয়ে দিতে হবে ইন্সপেক্টার তাঁদের শত্রু নয়, মিত্র, ভক্ষক নয়, রক্ষক, সহকর্ম্মী এবং সমধর্ম্মী। তবে শিক্ষকেরাও যেন পরিদর্শককে দূরে দূরে রেখে ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা (বা ঘৃণা) প্রদর্শন না ক'রে, হিতৈষী বন্ধু ও শ্রদ্ধেয় মনে করেন।

শিক্ষকের কাজ ছোট নয়, বরং মহান এবং দায়িত্ব পবিত্র। এই দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁদের সজাগ করে কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করাই পরিদর্শকের প্রধান কর্ত্তব্য।

কবিগুরু বলেছেন—শাসন করা তাকেই সাজে—সোহাগ ক'রে যে গো। যদি পরিদর্শক শিক্ষকের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হন, তবে অন্যায় দেখলে শাসন করাও সম্ভব হবে, আর সে শাসন ফলপ্রসূও হবে।

পরিদর্শক 'কর্ম্মী' না হলে, শিক্ষককর্ম্মীও তিনি খুঁজে পাবেন না। বিদ্যালয়ই পরিদর্শকের কাজ করবার বৃহৎ ক্ষেত্র, ইহারই মাধ্যমে দেশের সেবা করবার সুযোগ তাঁর অফুরন্ত; শিক্ষকমণ্ডলীকে মনের মত ক'রে গড়ে তুলে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি অনিবার্য্য। 'অফিসারী' ঠাট্ বজায় রেখে, ডাইরী লিখে কর্ত্তব্য শেষ করলে চাকুরী রক্ষা পাবে বটে, কিন্তু কখন সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নতির আশা খোলস-সর্ব্বস্ব অফিসারটির কাছ থেকে করা চলবে না।

আমার মনে হয়—বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং বিলে সহি করা ছাড়া পরিদর্শকের এই কাজগুলি অবশ্যকরণীয়।

(১) পরিদর্শক দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শন ক'রে গ্রামের মধ্যবর্ত্তী কোন গৃহে অবস্থান করবেন। পরিদর্শক এসেছেন—এ সংবাদ পেলে কিছু সংখ্যক গ্রামবাসী উপস্থিত হবেনই, আশে পাশের বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও উপস্থিত থাকবেন। এই সময় ঘরোয়া বৈঠকের মত একটি বৈঠক বসিয়ে বর্ত্তমানে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষক-অভিভাবকের সম্পর্ক, শিক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্ব ও ও কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে পরিদর্শক সুন্দর এবং মনোজ্ঞভাবে আলোচনা করবেন। গ্রামবাসীর সহিত একাসনে উপবেশন এবং একই ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করে তাদের অন্তর জয় করবেন। বলা বাহুল্য, পরিদর্শক যদি সাহেবীর পোষাকের ভক্ত হন তবে তা ছেড়ে বাঙ্গালীর সনাতন ধুতি-চাদর পরিধান করবেন। কেন না পোষাকের আড়ম্বর বড় দূরত্বের সৃষ্টি করে বলে অশিক্ষিত গ্রামবাসিগণ কাছে আসতে ভয় পান।

(২) গ্রামবাসিগণ বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক অভাব-অভিযোগ নিবেদন করবেন। সেগুলি ধীরভাবে শ্রবণ করে পরিদর্শক সম্ভাবিত মতামত দেবেন। গ্রামের আঞ্চলিক গান-বাজনায় পরিদর্শক যোগদান করে তাদের উৎসাহ বর্দ্ধন ত করবেনই—অধিকন্তু রস গ্রহণ করারও চেষ্টা করবেন।

(৩) গ্রামের কুসংস্কার, অশিক্ষার কুফল, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতা, টীকা গ্রহণে অনিচ্ছুকতা, আধুনিক কালের চাষ-বাস প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পরিদর্শক হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করবেন। গ্রামবাসিগণ যেন পরিদর্শকের কথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন।

(৪) প্রতি বৎসর অন্ততঃ দুই-তিন বার বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং উপরে বর্ণিত বিষয়-সূচী অনুসরণ করা দরকার। শিক্ষকেরা ইদানীং কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগে নিজেদের খুব ছোট মনে করেন। এই কমপ্লেক্স দূর ক'রে গ্রামে যাতে তাঁদের মর্যাদা স্বীকৃত হয়—সেদিকেও পরিদর্শক নজর রাখবেন।

(৫) বিদ্যালয়গুলি গ্রামবাসীদের নিজস্ব জিনিষ, এগুলি সরকারের নয়—এই কথাটি গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে দেবেন পরিদর্শক এবং বিদ্যালয় গৃহ সংস্কারের দিকে তাদের আগ্রহের সঞ্চার করবেন।

(৬) গ্রামে পরিদর্শনের সময় ব্যতীত বছরে আরও দুবার শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হতে হবে পরিদর্শকদের। স্থানীয় হাই স্কুলের মাঠে সভার আয়োজন করে, শিক্ষকদের দ্বারা একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করাবেন পরিদর্শক। থিয়েটার, আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ, সঙ্গীত, শিক্ষাব্রতীর ভাষণ, খেলাধূলা থাকবে বিচিত্র অনুষ্ঠানের সূচী। কিছু সংখ্যক অভিভাবক এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকলে ভাল হয়। এই সম্মেলনে যে সব শিক্ষাব্রতী ভাষণ দেবেন—তাঁরা শিক্ষকবর্গকে শিক্ষাদান-ব্রতকে সাফল্য মণ্ডিত করতে এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করবেন।

পরিশেষে, স্বাধীন দেশে আমার শিক্ষক বন্ধুদের মন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি আকর্ষণ করব—এগুলি প্রশ্নের আকারেই তাঁদের সম্মুখে উপস্থাপিত করছি :—

(ক) আপনারা পরিদর্শকের উপস্থিতিতে ভয় পান কেন? তাঁদেরকে আপনাদের বন্ধু ও হিতৈষীরূপে গ্রহণ করতে বাধা কোথায়? আপনাদের দুর্ব্বলতা কোথায়?

(খ) আপনারা বিনা কারণে যদি অনুপস্থিত থাকেন তবে ছুটীর জন্য আবেদন করেন না কেন? প্রত্যহ বিদ্যালয়ে হাজির হওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় ক'টায়? আপনারা ক'টায় বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন?

(ঙ) ছাত্রগণ যে সময় মত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় না, সেজন্য আপনারা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন? গ্রামে ঘুরে অভিভাবকদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে থাকেন কি? অভিভাবকদের কি এ সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়েছেন?

(ঘ) আপনারা শিক্ষক হাজিরা-বহি ও ছাত্র-হাজিরা বহি প্রত্যহ বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন কি? যাঁরা আনেন না, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি—কেন আনেন না? ইহা গুরুতর দোষ বলে মনে করেন কি?

(ঙ) ছাত্রগণের টীকা-দান সম্বন্ধে আপনি স্যানিটারী ইনস্পেক্টর বা জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীর সঙ্গে সহযোগিতা করেন কি? ছাত্রদের বেশভূষা, তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বিদ্যালয়-গৃহ প্রতিদিন পরিষ্কার রাখার দিকে আপনি নজর রাখেন কি?

(চ) সর্ব্বোপরি, বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের দৈনন্দিন খেলাধূলার ব্যবস্থা করেন কি? খেলাধূলা ছাড়া দৈহিক ও মানসিক উন্নতি সম্ভবপর নয়—এ আপনি জানেন কি?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলি অনেকের কাছে অবান্তর মনে হ'তে পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই আমার এই প্রশ্ন। আমি আশা করি প্রত্যেক শিক্ষক নিজে নিজের কাছে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা ক'রবেন এবং নিজের মনকে ফাঁকী না দিয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজবেন। তা হ'লেই তাঁরা নিজেদের মহান্ দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে পারবেন।

(১৩৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হেসে বললুম, সত্যিই তোর দিদি খুব ভালবাসে তোকে, —খুব ভালোমানুষ তোর দিদি!

অপূর্ব্ব হাসিতে তার সমস্ত মুখখানা আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো। তারপরে চিঠিখানা নিয়ে সে নেমে গেল।

একটু পরেই চা নিয়ে এলো অনন্তরাম। ইজিচেয়ারে শুয়ে প'ড়ে ততক্ষণে আমি একটা নতুন গল্পের প্লটের কথা ভাব্‌ছিলুম। হঠাৎ চেয়ে দেখি—চায়ের সংগে অন্য হাতে সে এক প্লেট্ খাবার নিয়ে এসেছে। এ সবের তো কথা ছিলো না! তবে? সচকিত হয়ে উঠে বস্‌লুম আমি! বললুম—ও কি-রে—ও সব কি করেছিস্ অনন্ত—এ সব পেলি কোথায়?

সেই আগের মতোই হাস্‌লো অনন্ত, বললে—কিছুই না, ছার! আপ্‌নে আমারে পত্তরখান লেইখ্যা দিছিলেন —হেয়ার লেইগ্যা সামান্য একটু মিষ্টি আন্‌ছি—'না' বললে শুনবু না, ছার! একটু মিষ্টিমুখ করতেই অইবে আপনেরে!

করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো!

চোখের সাম্‌নে অনন্তর দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত সমস্তটা জীবন যেন ঝল্‌সে উঠলো মুহূর্ত্তে। জানি তো সবই! কতই বা মাইনে পায় সে এখানে—আর তাই দিয়ে····· কিছু একটা বল্‌তে গিয়েছিলুম হয়তো, কিন্তু সব কথা এসে গলার কাছে আট্‌কে গেল—কয়েক মুহূর্ত্ত অভিভূতের মতো ব'সে থেকে একটা সন্দেশের খানিকটা টুক্‌রো শুধু ভেঙ্গে নিলুম!

কাঞ্চন কৌলিন্যের দিনে শুধু আদর্শের কথা বলিয়া ক্ষুধিত শিক্ষককে উপহাস করিও না। জাতির কল্যাণের জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত জীবিকা ও মর্য্যাদা দাও।

(গল্প)

একটা পার্ক, বিকেল বেলায় যেখানে ছেলেমেয়েদের রীতিমত একটা মেলা বসে যায়।

এই পার্কের উত্তর পশ্চিম দিকের কোণের লাল রংএর দোতালা বাড়ীটাই এতক্ষণ খুঁজছে সুভাষ, তাই রীণার লেখা কাগজটা আর একবার দেখে নিয়ে পা চালিয়ে এগিয়ে চলে সুভাষ। হাঁ, এই তো, এই বাড়ীটিই এতক্ষণ খুঁজছিল। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী; জানলায় লাল-রংএর একটা কাপড়ও শুকোচ্ছে. বুকে সাহস এনে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে দরজার কড়া নেড়ে উঠতেই, দোতলার ঘর থেকে একটি সুশ্রী তন্বী লাবণ্যবতী মেয়ে বলে ওঠে, কে?

—আমি: আমি সুভাষ।

—ওঃ আপনি, আসুন, ভেতরে আসুন, বলেই জানলার কাছ থেকে সরে যায় সেই সুন্দর মুখছবি।

কি একবার ভেবে সটান্ বাড়ীর ভেতর ঢুকেই থম্‌কে দাঁড়ায়; কোন দিকে সে যাবে? এ দিক ওদিক চাইতেই, সেই শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি আবার ভেসে ওঠে, সেই সঙ্গে মৃদু স্বরও ভেসে আসে—

—আসুন, ওপরে আসুন, আমার সঙ্গে উঠে আসুন। দ্বিধাগ্রস্ত সুভাষ তারই অনুসরণ করে উঠে আসে ওপরে।

কোন কথা না বলে বাঁ দিকের ঘেরা বারাণ্ডা বেঁকে বাঁ দিকের ঘরের নীল পর্দ্দা সরিয়ে দূরের সোফাটা দেখিয়ে মেয়েটি বলে—বসুন, সুভাষদা, আমি এখুনি বৌদিকে খবর আসছি।

চম্‌কে ওঠে সুভাষ তার এই সম্বোধনে। কোন দ্বিধা না করেই মেয়েটির দিকে চেয়ে আপন মনে বলে ওঠে, সুভাষ দা!

—হ্যাঁ,-কেন?—এবার লীনাও যেন কেমন থতমত খেয়ে তাকিয়ে বলে,—আমি আপনার রীণাদির ননদ।

—আমাকে বোধ হয় চেনেন না, না?

না, আমি তো কখনও এ বাড়ীতে আসিনি, কি করে চিনবো বলুন? তবে হ্যাঁ, রীণাদির সঙ্গে অনেক গল্প করেছি কিন্তু—কই আপনাকে দেখেছি বলে তো আমার মনে পড়ছেনা।

—তা না মনে পড়তে পারে, আমার কিন্তু বেশ মনে আছে।

—আমাদের বাড়ী গিয়েছিলেন আপনি?

—হ্যাঁ, সেই রুবীদির জন্মদিনে যখন আপনাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম, তখন রুবীদি দূর থেকে, আমায় বল্লেন,—'ঐ দেখ লীনা', ঐ আমার ছোট দেওর, ভারী মিশুক, ওর আমাকে না হলে যেন এক দণ্ড চলে না। এবার যখন আসবি আলাপ করিয়ে দেব, বাজনাও জানে খুব ভাল।'

একটু লজ্জিত হয়েই সুভাষ বলে—আমার ইতিহাস আপনি জানেন নাকি? বৌদি যে আপনাদের এত কথা বলেছে তাতো কোনদিন বলেনি আমায়।

—তা না বলতে পারে, কারণ এমন কোন কথা নয়, যা না বলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তা যাক, ও সব বাজে কথা ছেড়ে আসুন সেদিনের আলাপটা আজ জমানো যাক। তবে হ্যাঁ, একটু বসুন আপনি। আমি এখুনি বৌদিকে

খবর দিয়েই আসছি, বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় লীনা।

আশ্চর্য্য হয়ে যায় সুভাষ, এই মেয়েটির ব্যবহারে, তার মধুর সরলতায়। মুগ্ধ হয়ে যায় তার আপন করার শক্তি দেখে। কতক্ষণই বা এসেছে সে, তবু যেন মনে হয় যুগ যুগান্ত কেটে গেছে কথার পর কথার প্রসঙ্গে লীনা সুভাষের। এর আগে সে অনেকের সঙ্গে মিশেছে কিন্তু কোনদিন এমন প্রাণ খুলেতো কারুর সঙ্গে মেশেনি; বুকের মধ্যে যেন কি এক অনুভূতি তোলপাড় করে ওঠে, তবু চুপ করে বসে থাকে সুভাষ।

তন্দ্রা ছুটে যায় লীনার ডাকে।

—এই যে আসুন, বৌদি নীচে যেতে বলেছেন।

—আর ভাই ফোঁটাও তো ওপরে দেবনা।—বলে কাঁধের পড়ে যাওয়া আঁচলটা তুলে নিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে দুজনায়।

নীচে নামতে নামতে বলে সুভাষ, ও ঘরটা বুঝি আপনার?

—হ্যাঁ আমার। কিন্তু আপনি আমায় আপনি বলছেন কেন? ছোট বোনকে বুঝি আপনি বলতে হয়? বেশতো, বলে এক ঝলক্ হাসির ঝরণা ছড়িয়ে চেয়ে থাকে লীনা।

বিপদগ্রস্ত সুভাষ বলে, না তা নয়; তবে প্রথম প্রথম।

—ওঃ, প্রথম প্রথম আপনি বলতে হয়, না? কিন্তু ছোট বোনকে বলতে হয় না।

—বেশ এবার থেকে তুমি বলবো তা হলে, কিন্তু তোমারও তাহলে আমাকে 'তুমি' বলতে হবে।

—আপনাকে?

—হ্যাঁ, আমাকে, কিশোর কচি মুখখানি লজ্জিত হাসির আড়াল দিয়ে বললে সুভাষ।

মাথা নেড়ে লীনা জবাব দেয়, না, তা পারবোনা।

—কেন?

—না, আমি ছোট যে।

—বেশতো, ছোট না হয় মেনে নিলাম, দাদার আসনে যদি বসাতে পার তা হলে তুমি বলতে পারবে না কেন? আর কথা খুঁজে পায় না লীনা। সুভাষের কথা মেনে নেয়।

নীচে নেমে এসে, রীণাকে প্রণাম করতেই রীণা বলে—এই আমার ছোট ননদ, আজ থেকে তোর ছোট বোন; ঐ তোকে ফোঁটা দেবে বলে সকাল থেকে না খেয়ে বসে আছে। যা ঘরে গিয়ে বসতো যা, আমি যাচ্ছি।

—বল কি রীণাদি, ওকি এখনও খাইনি? না না লীনা, এ তোমার বড় অন্যায়, আজ প্রীতির দিন, ভাইফোঁটার উৎসব, আজ কখনও বোনের উপোস করে থাকতে হয়? চল আমি তোমায় খইয়েদি।

—ভুল করলি সুভাষ, আজইতো বোন উপোস করে থাকে।

—না, না, এ বিধান আমি মানতে পারবো না রীণাদি, বোনের কাছ থেকে ফোঁটা নেবে, পেট ভরে খাবে ভাই, আর বোন বেচারী থাকবে উপোস করে, এ কখনও হতে পারে না। বলে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই, হাসতে, হাসতে সুভাষের হাতটা ধরে লীনা বলে—ভুল করলে, যুদ্ধ করতে গেলে কত সৈন্যের দরকার। কত আরাধনার প্রয়োজন, তাইতো উপোস করে বোনেরা যমরাজের দুয়ারে কাঁটা ফেলতে মিনতি জানায়, যেন তার এই কাঁটা অক্ষয় পরমায়ুকে উজ্জ্বল করে যমরাজের দুয়ার বন্ধ করে দেয়, বুঝলে?

—তাই নাকি?—হাসির হো, হো, শব্দে ঘর ভরে যায়।

ফোঁটা দেওয়ার পর্ব্ব শেষ করে আবার উঠে আসে দুজনে ওপরের ঘরে। বসে ঠিক সামনাসামনি চেয়ারে।

সহসা সুভাষের মন যেন বিদ্রোহ করে ওঠে। ফেলে রাখা লীনার পেন্সিলটা নিয়ে টেবিলটার গায়ে আঁচড় কাটতে কাটতে সুভাষ বলে—আচ্ছা লীনা, এত যে যত্ন করলে, এত সুন্দর করে খাবার ফুল দিয়ে সাজিয়ে খাওয়ালে, খাইয়ে তো কিছু চাইলে না?

—চাইবো! কি চাইবো?—বিস্ময় ভরা দুটি সুরমা-পরা কালো চোখ তুলে তাকায় লীনা!

সুভাষ একটু হেসে বলে—তোমার খুব বুদ্ধি আছে লীনা, আশ্চর্য্য তোমার সরলতা, তোমায় বোধ হয় সকলেই খুব ভালবাসে, নয়?

—ভাল, —হ্যাঁ, তা বাসে।

—আচ্ছা লীনা, তুমি সিনেমা দেখ?

—সিনেমা? হ্যাঁ, তা দেখি, কেন? আপনি বুঝি খুব সিনেমা দেখতে ভালবাসেন?

—না, খুব যে একটা দেখি তা নয়। তবে যে সব ভাল বই আসে, সেগুলো দেখি। এই ধর, যেমন "শ্যামলের প্রেম", 'ধূপের ধোঁয়া',—সত্যি বইগুলো ভাল, তাই নয় কি?

—তাই নাকি? —আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে সুভাষের চোখে

—হ্যাঁ, "শ্যামলের প্রেম" যে সুন্দর তা অস্বীকার করতে পারবোনা, কিন্তু তবুও যে প্রেমকে সে সার্থক রূপ দিতে গিয়েছিল ঠিক সেই রূপকে কি সার্থক রূপ দিতে পেরেছে সুভাষ দা? আর এই যে সুদীপ্তার কথায় প্রতিভাকে বিয়ে করল প্রদীপ, সেকি সুদীপ্তার কথাতেই নাঃ?

—হাঁ, তা করেছিল, কিন্তু অত বুঝে আর সিনেমা কে দেখে বলো? তুমি কি সব সিনেমাই এত বুঝে দেখ লীনা?

—হ্যাঁ, বুঝে না দেখলে দেখবো কি?

—তাই নাকি?—আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে সুভাষের চোখে। কি ভেবে কিছুক্ষণের জন্য সুভাষ স্তব্ধ হয়ে যায়। পরক্ষণেই বলে—জগতের সবাইতো আর তোমার মত বুদ্ধিমান নয়, আর তোমার মত অত সুক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়েও কেউ সিনেমা দেখে না, তাই তোমার মনের মত সকলের মনকে আঘাত দিতে পারিনি।

কথাগুলি বলেই—চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে সুভাষ, এক পা এগিয়েই লীনার শান্ত নত মুখখানার দিকে তাকিয়ে থমকে যায়, পরে একটু কি ভেবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুভাষ।

* * *

দু বছর পর।'

—অসুখ—একি! তোমার যে অসুখ তাতো আমায় জানাওনি কোনদিন।

—না, জানাইনি, ভেবেছিলাম যখন এলেনা, একটি খবর ও নিলে না, তখন বোনকে নিশ্চয় ভুলে গেছ, তাই আর ভুলে যাওয়া স্মৃতির পাতাকে উল্টাতে চাইনি।

লীনার রুক্ষ চুলের মাঝে আঙুল চালাতে চালাতে ব্যথাভরা কণ্ঠে সুভাষ বলে—না, ভুলে তোমায় যায়নি লীনা; সম্ভবতঃ কোনদিনই ভুলতে তোমায় পারবোনা। যে ভালবাসা দিয়েছো সে ভালবাসা কি ভোলা যায়? তা ছাড়া তুমিতো বলেছ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভালবাসার জয় সর্ব্বত্র, তাইতো এ পরাজয় স্বীকার, বুঝলে? বলে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে সুভাষ।

অন্ধকার-আলোকের ধাঁধাঁয় পথ হারালো সুভাষ। অদ্ভুত রকমে কাটতে লাগল দিনের পর দিন। কাজে-অকাজে জড়িয়ে গেল সুভাষের কাজে লীনা। তাই একদিন অবিশ্রান্ত বর্ষার কিছুক্ষণ পরেই যাব না, যাব না করেও দাঁড়াল সুভাষ লীনার ঘরের দোরে।

এ রকম আজকাল প্রায়ই দেখা যায়।

লীনার কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। তাই আশ্চর্য্য হয়ে, শুয়ে শুয়ে এক একবার ভাবে সুভাষ। একরাশ

কালো চুলের খোঁপা বেঁধে যখন সুবিমল হাসি ছড়িয়ে অভ্যর্থনা করে ডেকে নিয়ে ঘরে বসায়, তখন ভারী সুন্দর মানায় ওর ছন্দে চলার গতির চাঞ্চল্য। তাই চেয়ে চেয়ে দেখে সুভাষ। তবু যেন দেখার শেষ নেই।

সেদিনও ঠিক এমনি সন্ধ্যাবেলা। হঠাৎ প্রশ্ন করে,—কি আমায় এত চেয়ে চেয়ে দেখ, সুভাষদা? যে দিনই আস, দেখি কি যেন অবাক্ দৃষ্টি খুঁজছে তোমার দুটি চোখের তারা; কি সে সুভাষ দা?

কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সুভাষ। আস্তে আস্তে জবাব দেয়, দেখছি, কৈ না তো!

সন্ধ্যার ফোটা শুকতারার দিকে তাকিয়ে লীনা বলে—এতক্ষণ কি তাহলে ওই শুকতারাকে দেখছিলে? আরো অপ্রস্তুত হয়ে হেসে সুভাষ উত্তর দেয়—না, আজ দেখছিলাম তোমাকে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ, তোমাকে—কেন, তোমাকে দেখতে নেই?

—না, তা নয়—কিন্তু এত কি দেখ?

—দেখি তুমি কত সুন্দর, আর এই যে আমায় এত ভালবাস সে ভালবাসার মূল্য আমি কি কোনদিন দিতে পারব তোমায়? তাই, কি মনে হয় জানো লীনা? কেন আমায় আবদ্ধ করলে এমন করে তোমার ভালবাসার বন্ধনে?—যে ভালবাসার মূল্য আমি কোনদিন দিতে পারব বলে মনে হয় না!

—যুগ যুগ মানুষ মানুষকে ভালবেসেই এসেছে, তাই বলে কি কেউ কোনদিন পেরেছে সত্যিকারে এই ভালবাসার মূল্য দিতে, সুভাষ দা?

—না, তা পেরেছে কি না জানি না—তবে জানি ভালবাসাই ভালবাসার মূল্য, কিন্তু আমি যে তোমায় সে ভালবাসাও দিতে পারলাম না। সত্যি করে বলবে, তুমি আমার কাছ থেকে কি পেলে তোমার ভালবাসা হয়ে উঠবে সার্থক?—বলে সাগ্রহে চোখ তুলে তাকায় সে লীনার পানে।

কিন্তু লীনার কোন সাড়াই পায় না।

আজ সুভাষের অন্তর-প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। যে প্রদীপ ছিল এতদিন অন্ধকারের অতলে ঘুমিয়ে, আজ সে শিখার স্পর্শ পেয়ে উঠল নতুন করে জ্বলে; আর কি তার নিভে যাওয়া সম্ভব? না, না—এরও এক সার্থকতা আছে বৈ কি। অনেক বৎসরের বহু চেষ্টায় জীবনধারণের যে একটা দাম আছে, সে দামের খরিদ্দারেরও তো প্রয়োজন। আজ সে সম্পূর্ণ উপযুক্ত খরিদ্দার পেয়েছে, তাই সমস্ত উজাড় করে দিতেও ওর কোন কুণ্ঠা নেই।

ওর সমস্ত সংযম আজ গেল টুটে, সম্বিৎ গেল হারিয়ে, তাই উন্মত্তের মত লীনার হাত-দুটো ধরে বলে—বল, বল লীনা, সত্যি তুমি কি চাও—কি দিয়ে তোমায় করে তুলতে পারি সম্পূর্ণ সুখী? বল লীনা, আর চুপ করে থেক না!

উন্মত্ত ঝড়ের দোলায় লীনাও যেন এতক্ষণ কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। এখন সম্বিৎ ফিরে পেতেই আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—সত্যি কি চাই জানো সুভাষ দা?—চাই, তুমি বড় হও, সুন্দর হও, দেশের ও দশের একজন হও—তাহলেই দেখবে তোমার ভালবাসা হয়ে উঠবে সার্থক, আমার ভালবাসও পাবে সেদিন সত্যিকারের রূপ।

বেশ, তাই হবে! দশজনের একজন যে দিন হতে পারবো, সেদিন আবার আসব তোমার কাছে—বলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুভাষ।

ক্ষুধিত শিক্ষক রাষ্ট্র ও সমাজের বিপদ স্বরূপ। বিদ্রোহ, বিপ্লব ও বিপর্য্যয়ের বীজ বপন করিতে তাহাদের বাধ্য করিবেন না। সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের জীবিকা ও মর্য্যাদা দিয়া কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করুন।

মানব সভ্যতায় উদ্ভিদ বীজের প্রসার

শ্রীতেজেশ সেন

পরিপক্ক অবস্থায় বীজ গাছ হ'তে মাটিতে ঝরে পড়ে। মাটিতে পড়ে কতক বীজ নষ্ট হ'য়ে, যায় কতক হয় অঙ্কুরিত, কতক শুকনো ডালপালা ইঁটপাথর মৃত্তিকা স্তূপের তলায় চাপা পড়ে সুরক্ষিত অবস্থায় দীর্ঘকাল অবস্থান করে। কতক মৃত্তিকাভ্যন্তরে ফসিলে পরিণত হয়।

মাটির তলায় সুরক্ষিত এক একটি বীজ প্রাচীন কালের মানব সভ্যতার এক একটি যেন ইঙ্গিত। সেই সব সুরক্ষিত বীজ হ'তে আমরা জানতে পারি সে যুগের প্রাকৃতিক অবস্থা, গাছপালার প্রকৃতি ও আজিকার গাছপালার সঙ্গে তাদের কিরূপ সম্বন্ধ।

প্রাচীন সভ্যতার বহু চিহ্ন আজও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত হ'য়ে আছে। সেই চিহ্ন উদ্ধার করতে গিয়ে তাদের সঙ্গে পাওয়া গেছে নানা জাতীয় ফল ও শস্যদানার বীজ। প্রাত্নতাত্ত্বিকের নিকট সেই সব বীজের মূল্য খুব্য খুব বেশি, তাঁরা সেই সব বীজকে মোটেই উপেক্ষার চোখে দেখেন না। তার ভিতর হ'তে তাঁরা উদ্ধার করেন প্রাচীনকালের লুপ্ত সভ্যতার ইতিহাস, আদি মানবের শক্তির বিভিন্ন দিক।

প্রাচীন প্রস্তর-যুগে (paleolithic) স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই পশুপক্ষীর ন্যায় সর্বদাই আহার অন্বেষণে ব্যস্ত থাকতে হতো। পুরুষরা বনে জঙ্গলে শিকার করতো বন্য জন্তু, স্ত্রীলোকেরা বন হ'তে সংগ্রহ ক'রে আনতো নানাবিধ ফলমূল ও নানা জাতীয় ঘাসের বীজ। বর্তমান কালের গম যব বজরা প্রভৃতি শস্যদানার পূর্বপুরুষ তাদেরই কোন কোন জাতীয় ঘাসের বীজ। বর্তমান সভ্যতার গোড়া পত্তনে তাদের দান সামান্য নয়।

নব্য-প্রস্তর যুগে (neolithic) মানুষ যখন সেই সব ঘাস বীজকে প্রথম নিজেদের আবাস সংলগ্ন ভূমিতে নিজেদের ইচ্ছামত জন্মাতে শেখে, তখন থেকে মানব সভ্যতার মোড় ঘুরে যায় এক নতুন পথে। এতদিন মানুষের ছিল যাযাবর জীবন—তাদের জীবনযাত্রা ছিল অনিশ্চিত। আহার্য সংস্থানের জন্য তাদের ঘুরে বেড়াতে হ'তো স্থান হ'তে স্থানান্তরে, দেশ হ'তে দেশান্তরে। মানুষ যেদিন অরণ্যজাত ঘাসের বীজকে নিজেদের আবাসস্থানে জন্মাতে শিখলো, সেদিন থেকে অবসান ঘটলো তাদের যাযাবর জীবনের অনিশ্চিত অবস্থা। সেদিন থেকে উর্বরভূমি আশ্রয় করে সভ্যতার আদিরূপ গ্রামপল্লী গড়ে উঠতে লাগলো। পল্লী সভ্যতার পত্তন হলো সেদিন থেকে।

জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক হীর্ (Dr. otto Heer) সাহেব বহুদিন গবেষণা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন সুইজারলেণ্ডের হ্রদবাসী মানব-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার পদ্ধতি উদ্ধারের চেষ্টায়। হ্রদের জলে মাচার উপর গৃহ নির্মাণ করে তাদের বাস করবার প্রধান কারণ ছিলো হ্রদের মৎস্য প্রাচুর্য। মাছ ধরবার নানাবিধ যন্ত্রপাতির সঙ্গে হ্রদের কাদামাটিতে পাওয়া গেছে নানাবিধ ফলের আঁটি বা বীচি। তাদের মধ্যে পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে প্লুম, চেরী, আঙ্গুর, নানাজাতীয় বেরি ফলের বীচি। গম, যব, বজরা প্রভৃতি শস্যদানার প্রচলনও তখন তাদের মধ্যে ছিল। এখন যে-জাতীয় গম বজরা প্রভৃতিতে রুটি তৈরি হয়, হ্রদের কাদামৃত্তিকায় পাওয়া গেছে সেই জাতীয় গম বজরা প্রভৃতি শস্যদানা ও তাদের খোসা। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, রুটি আহারে ওরাও তখন অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলো। তার পরবর্তী সময়কে বলা হয় পিত্তল যুগ (Bronze Age)। পিত্তল যুগের মানব সভ্যতার যে সব চিহ্ন মাটির তলা হতে উদ্ধার করা হয়েছে—তার মধ্যে পাওয়া গেছে বিন্ জাতীয় সবজীর বীজ। এই সময়েই মানুষ প্রথম বিন্ জাতীয় সবজী

আহার্যরূপে গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। পূর্বোক্ত সব জাতীয় বীজই আজিকার যুগের বীজ অপেক্ষা আকারে ছোট। সেই সব বীজই চাষের ভূমিতে ক্রমশ উৎকর্ষতা লাভ ক'রে আজিকার দিনের উৎকৃষ্টতর ফল, সবজী ও শষ্যদানায় পরিণত হয়েছে।

এ গেল প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের কথা। ঐতিহাসিক যুগের বীজের কাহিনী আরো বেশি চমকপ্রদ।

বর্তমান সভ্যতার আদি পীঠস্থান মিশরের নীল নদের উপত্যকা ভূমি। সেকালের মিশরের রাজাদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাঁরা নিজেদের তাঁদেরই আরাধ্য দেবতার অংশ ব'লে মনে করতেন। মৃত্যুর পর তাঁদের কোন অস্তিত্ব থাকবেনা, এ তাঁরা কল্পনাও করতে পারতেন না। তাই মৃত্যুর পর তাঁদের দেহ মাটিতে রূপান্তরিত ক'রে রক্ষিত হতো পিরামিডের অন্ধকার, গর্ভে মাটির তলায়। আর সেই মাটিতে থাকতো ইহলোকের যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ। সেই সব উপকরণের সঙ্গে মাটির পাকস্থলীতে পাওয়া গেছে নানাবিধ আহার্য বস্তু। সেই আহার্য বস্তুর কতক হচ্ছে গম, যব, বজরার দানা। এক সময়ে খবরের কাগজে রব উঠেছিলো মাটির উদরে ও হারকিউলেনিয়াম্ নগরীর ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত গমের বীজের প্রাণশক্তি তখনো লুপ্ত হয়নি—গমের বীজ হতে চারা জন্মানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে গমের বীজ ১৬ বৎসর পর্যন্ত প্রাণধারণে সক্ষম। তদপেক্ষা প্রাচীন গমের বীজ অঙ্কুর উৎপাদনে অসমর্থ।

কোন্ জাতীয় বীজ কত বৎসর পর্যন্ত অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ তা পরীক্ষা ক'রে দেখবার চেষ্টা হয়েছে। সে চেষ্টায় ফল পাওয়া গেছে অতিশয় আশ্চর্যজনক। পরীক্ষায় দেখা গেছে সুঁবি (Legume) জাতীয় উদ্ভিদ বীজের প্রাণ ধারণের সক্ষমতা সর্বাপেক্ষা অধিককাল। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায়।

ইংলণ্ডের কেনসিংটন্ উদ্যানের বীজাগারে নানা জাতীয় বহু পুরাতন বীজ রক্ষিত ছিলো। গত যুদ্ধে ১৯৪০ সনে জার্মেনীর বোমার গোলায় সেই বীজাগার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তিন মাস পরে দেখা গেলো বৃষ্টির জলে সিক্ত দু'জাতীয় বীজ হ'তে অঙ্কুর উদ্গম হয়েছে। তাদের প্রাচীনত্ব ১৪৭ বৎসর। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সর জর্জ ষ্টান্টন্ (Sir George Staunton) সাহেব চীনদেশে অভিযানের সময় সে-দেশ হতে এই বীজ সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন। এই সুদীর্ঘকালেও ইহাদের প্রাণশক্তি নষ্ট হয়নি।

উদ্ভিদবীজের পরমায়ু গণনায় ইহাই শেষ ফল নয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক লিনিয়ান্ সোসাইটিতে (Linnean Soceity) বক্তৃতালে ডঃ রেম্‌বটম্ (Dr. Rambottom) সাহেব শ্রোতাদের সামনে কয়েকটি পদ্মজাতীয় ফুলের চারা উপস্থিত করেছিলেন। মাঞ্চুরিয়ার প্রাগঐতিহাসিক যুগের একটি খনি হ'তে তিনি সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন কয়েকটি পদ্মজাতীয় ফুলের বীজ। সেই বীজ হ'তেই তিনি উপরোক্ত চারা কয়টি জন্মিয়েছিলেন। এই জাতীয় পদ্মেরই তিনি অন্য একটি চারা উৎপাদন করেছিলেন স্লোয়ান্ (Sloane) বীজাগারের বীজ হ'তে। সেস্থানে সেই চারার বীজটি সংগৃহিত হয়েছিলো অন্ততঃ ২৪০ বৎসর পূর্বে। যতদূর জানা গেছে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা রক্ষা করবার ইহাই সর্বাধিক বয়স।

জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বিগ্রহ ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারেও বীজের প্রভাব নিতান্ত সামান্য নয়। মাংসে পচন ধরলে তাতে গন্ধ হয়। সেই গন্ধ দূর করে মাংসকে সুস্বাদু করবার জন্য এক সময়ে মশলাজাতীয় দ্রব্যের আদর ছিলো ইউরোপে খুব বেশি। এই মশলার অধিকাংশই নানা জাতীয় উদ্ভিদের বীজ। তাদের জন্মস্থান এশিয়ার দক্ষিণাংশের দ্বীপ সমূহে। এই সব দ্বীপ সমূহে ইউরোপীয় জাতি সমূহের রাজ্য বিস্তারের প্রধান কারণ মশলার দ্বীপসমূহের উপর আধিপত্য লাভের চেষ্টা।

এক সময় রোগ নিবারণে নানা জাতীয় উদ্ভিদের ছাল, বাকল, পাতা ও বীজই ছিল প্রধান ঔষধ। কুষ্ঠ ব্যাধিতে চালমুগরা তেলের প্রয়োগ চলে আসছে বহু প্রাচীন কাল হ'তে। এই তেল তৈরি হয় চালমুগরা গাছের বীজ হ'তে। কিংবদন্তী আছে কোন বর্মদেশীয় রাজপুত্রের কুষ্ঠ ব্যাধি

হওয়ায় তাকে বনে নির্বাসিত করা হয়। সেই বনে ছিলো চালমুগরার গাছ। নির্বাসিত অবস্থায় রাজপুত্র অন্যান্য ফল মূলের সঙ্গে রোজই খেতেন কিছু পরিমাণ চালমুগরার বীজ। আর সেই বীজ আহারের ফলেই তিনি হন রোগমুক্ত। ডাক্তারী শাস্ত্রে বিষ হলেও ষ্ট্রিকনিন্ (Strychnine) খুব বড় একটি ঔষধ। ষ্ট্রিকনিন্ কুচিলা ফলের রস বা রস। কবিরাজী শাস্ত্রের অধিকাংশ ঔষধই উদ্ভিদ জাত, কিছু তাদের ছাল, বাকল, মূল, কিছু তাদের বীজ।

মানুষের পানীয়ে, বিশেষভাবে আরামপ্রদ পানীয়েও, উদ্ভিদ বীজের প্রভাব নিতান্ত সামান্য নয়। আজকাল সভ্য সমাজের আরামপ্রদ পানীয় চা ও কফি। কফি তৈরি হয় কফি-বীজ হ'তে, চা পাতা হ'তে তৈরি হলেও চারা জন্মানো হয় বীজ হতে। আজকাল কফির চাষ সর্বাপেক্ষা বেশি দক্ষিণ আফ্রিকায়। সে স্থানে বিস্তৃত চাষের ভূমির যাবতীয় কফি গাছের আদি-পুরুষ আমেষ্টারডামের উদ্ভিদ উদ্যানে উৎপন্ন একটি চারা। সেই চারাকে জন্মানো হয়েছিল একটি বীজ হতে। ভারতে চা গাছও প্রথম জন্মানো হয়ে ছিলো চীন হ'তে আনীত চা-বীজ হতে।

বিভিন্ন দেশে নানাবিধ অর্থকরী বৃক্ষ আমদানীর সঙ্গেও যুক্ত হয়ে আছে উদ্ভিদ-বীজের বিচিত্র কাহিনী। রবার সেইরূপ একটি অর্থকরী বৃক্ষ। ইহার আদি জন্মস্থানও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশ। ভারতে এই বৃক্ষ রোপণের জন্য বিলেতের কিউ গার্ডেনে প্রায় ৭০,০০০ বীজ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথম রোপণ করা হয়। সেই বীজেরই সহস্রাধিক চারা সিলোন্ দ্বীপে প্রেরিত হয় রোপণ করবার জন্য। আজ তাদেরই বীজের চারা হ'তে মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে রবারের চাষ হচ্ছে ব্যাপকভাবে।

কোন কোন অর্থকরী গাছের জন্য জাতিতে জাতিতে রেষারেষিও কম সৃষ্ট হয়নি। ম্যালেরিয়ার আক্রমণ রোধ করবার একমাত্র মহৌষধ এক সময় ছিল কুইনাইন্। এই কুইনাইন্ তৈরীর জন্য দরকার 'সিঙ্কোনা' নামক একপ্রকার গাছের। এই গাছের জন্মস্থানও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশে। ডাচেরা ইহা প্রথম আমদানী করে জাভা দ্বীপে। সিঙ্কোনা চাষে ডাচদের অর্থাগম হতো প্রচুর। পাছে তাদের এই লাভজনক ব্যবসা অন্য কোন জাতি, বিশেষ করিয়া ইংরেজরা কেড়ে নেয়, সেই জন্য জাভা দ্বীপের বাইরে বীজ প্রেরণ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইংরেজদের মধ্যে উদ্যোগী পুরুষসিংহের অভাব নেই। তাদের মধ্যে স্যার ক্লেমেন্ট মারখাম্ নামক একজন উদ্যোগী পুরুষ তাঁর দলবল নিয়ে বহু অনুসন্ধানে আণ্ডিজ পর্ব্বতে এই গাছ আবিষ্কার করেন। প্রথমে বিলেতের কিউ গার্ডেনে সিঙ্কোনার বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা হয় এবং সেই চারা থেকেই প্রথমে সিলোন ও পরে ভারতে সিঙ্কোনার চাষ আরম্ভ হয়।

ব্যবসাক্ষেত্রে বীজ ক্রমশঃই উচ্চস্থান অধিকার করছে; তাই আজকাল বীজ-ব্যবসায়ীর সংখ্যাও বাড়ছে। তাদের একমাত্র কাজ—নানাজাতীয় বীজ উৎপাদন করা। আজকাল খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাওয়া যায় নতুন নতুন বীজোৎপাদক নার্শারীর বিজ্ঞাপন। তারা কতক বীজ আমদানী করে বিদেশ থেকে, আর কতক নিজেরাই উৎপাদন করে তাদেব চাষের ভূমিতে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত মানুষের খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় কাঁচা মালের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। সেই তালিকার মধ্যে ছিল নানা জাতীয় শস্যদানা ও স্নেহজাতীয় উৎপাদক বীজ। লড়াইয়ে খাদ্য-সমস্যা একটি খুব বড় সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য উপরোক্ত তালিকা প্রস্তুত হয়েছিল। আধুনিক কালের যুদ্ধে রবারও একটি অপরিহার্য্য বস্তু। সিঙ্গাপুর, মালয় প্রভৃতি রবারের দেশ যখন শত্রুর হাতে পড়ে, তখন কৃত্রিম উপায়ে রবার প্রস্তুতের জন্য চেষ্টা হ'তে থাকে। সুখের বিষয়—সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে। এখন সেই তালিকায় প্রাপ্ত নানাজাতীয় শস্যদানা থেকে প্রাপ্ত সুরাসার (Alcohol) প্রস্তুত ক'রে তারই সাহায্যে রবার তৈরী হচ্ছে। গত লড়াইয়ে সমরোপকরণে, বিশেষ করিয়া মারণাস্ত্র নির্ম্মাণে নানাবিধ শস্যদানা ও অন্যান্য উদ্ভিদ-বীজকে কিভাবে ও কি পরিমাণে ব্যবহার করা যেতে পারে, তারও চেষ্টা হয়েছিল ব্যাপকভাবে; তবে সে সংবাদ সর্ব্বজন-গম্য নয় ব'লে তা প্রকাশিত হয়নি।

সহিষ্ণুতার অবতার যীশুখৃষ্টের একখানা বড় গ্লাস-পেন্টিং। একদৃষ্টে ছবিখানার দিকে তাকাইয়া আছি। ভাবিতেছি—কৃতিত্ব কাহার—চিত্রকরের, না সহিষ্ণুতার?

—'এ কি! আপনি এক ভাবেই ছবিখানার দিকে তাকিয়ে ব'সে আছেন! এই নিন সামান্য জলখাবার ও চা।'

স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়। অতীতের যুগে চলিয়া গিয়াছিলাম। যুগে যুগে মানুষ মানুষের জন্য আনিয়াছে দুঃখ, বেদনা, যাতনা—আবার মানুষই মানুষকে দিয়াছে সুখ, সান্ত্বনা, মাধুর্য্য আর পরম তৃপ্তি। বিস্তীর্ণ বালুকা-বক্ষ দামোদর অতিক্রম করিবার সময় বারংবার এই কথাই ভাবিতেছিলাম যে, এই বালুকারাশির নিম্নে যদি স্বচ্ছ সুশীতল পানীয় মিলিতে পারে—জীবনের চারিদিকে আজ যে গভীর হতাশা দেখা দিয়াছে—মানুষের জীবন আজ যে কালের নাগপাশ-বন্ধনে বিকৃত রূপ ধারণ করিতেছে—ইহার পশ্চাতেও কি রহিয়া গিয়াছে কোনও স্বচ্ছ বারি-ধারা, কোনও স্নিগ্ধ পেয়-রাশি—যাহাতে সমগ্র অন্তর পরিতৃপ্তি অর্জ্জন করিতে পারে?

—'এ ছবিখানার ভিতর আপনি কি দেখছেন? আমারই এ আঁকা ছবি—একটুও ভাল হয়নি; এখনও শেষ করি নি।'

—'তা'হলেও চমৎকার হয়েছে এ ছবি! যতই দেখছি—তৃপ্তি আসচে না! ভাবছি—কত বড় সহিষ্ণুতার প্রতীক। ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর দিব্যপুরুষ অম্লান বদনে সহ্য করে যাচ্ছেন ক্রুশবহনের বোঝা, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা! তিনি সে যুগেই ভবিষ্যকালের এ রূপ দেখেছিলেন যে মানুষ এমনি ভাবেই ক্রুশ বিদ্ধ ক'রে ভগবানের প্রিয় সন্তানদের তিলে তিলে শেষ ক'রে দেবে। যাঁরা সহ্য ক'রে যাচ্ছেন, তাঁরা হাসিমুখেই চিরদিন সহ্য ক'রে যাবেন।'

—'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন—এই ভেবে আমারও শান্তি নেই। মানুষের এর পরিণতি কোথায়? মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে দ্বন্দ্ব, এর পরিণতি কোথায়?'

অবাক হই, সামান্য শিক্ষক এরও আবার এ সমস্ত ভাববার আছে নাকি?

যাচাই করিবার ইচ্ছা হয়, পাথরকে তো ঘসিয়াই দেখিতে হয়।

—'আপনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন?'

'এই সামান্যই, আই, এ, পাশ করেছি কোনও মতে। আমার বাবা মারা গেলেন—সংসারের সমস্ত দারিত্ব ঘাড়ে পড়ল, তাই থেকে এ শিক্ষকতা নিয়েই আছি।'

—'আর আপনার এ ছবি আঁকা?'

—'এটা অনেকটা আমাদের পরিবারের ভগবান প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ। আমাদের বাড়ীর সকলেরই সঙ্গীত এবং চিত্রবিদ্যার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে।'

বিদ্যালয় পরিদর্শন বহু পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়াছিল। ত্রুটির সন্ধানেই ছিলাম—কেন না বেনামি চিঠি গিয়াছিল যে প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিজের বাড়ীর কাজেই এত বিব্রত যে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম্ম কিছুই দেখেন না। দেখিলাম প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের যথাযথ দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকা, হিসাবের খাতাপত্র, শ্রেণীর ছেলে মেয়েদের যথাযথ বিন্যাশ—সবই নিখুঁত। সকলের শেষে প্রশ্ন করি—'আপনার তো এ বিদ্যালয়ে বহুদিন হয়ে গেল—অন্যত্র বদলি হবেন কি?'

রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাত্রি কাটাইয়াছি, মুমূর্ষুর বেদনার্ত্ত মুখ দেখিয়াছি—কিন্তু এত ব্যথাতুর দৃষ্টির সন্ধান পাই নাই। সমস্ত মুখ নিমেষে রক্তহীন হইয়া—দুঃখের মূর্ত্তরূপ ভাসিয়া উঠিল।

শুনিলাম—'এ বিদ্যালয় আমার অস্থিমজ্জা দিয়ে গঠিত। দশ বছর আগে আমি সামান্য এম, ই, পাশ করে—কয়েকটি ছাত্রছাত্রী নিয়ে এ বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করি। আজ এ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দেড়শ দাঁড়িয়েছে, একে ছেড়ে যাওয়া কি সম্ভব? এ আজ বনিয়াদি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত, আমি এর প্রধান শিক্ষয়িত্রী।'

—'কিন্তু এখানে থেকে যদি আপনাকে অপমান সহ্য করতে হয়—তবুও এখানেই থাকা ভাল লাগবে কি ?'

—'সহ্যর কথা বলছেন ? সহ্যের প্রতীক যিনি তিনি তো আপনার সম্মুখেই রয়েছেন। তাঁর কাছেই প্রশ্নের উত্তর পাবেন। তিনি কি আমাদের এ কথাই বলে যাচ্ছেন না—যে যুগে যুগে মানব-সন্তান হবে নিপীড়িত, ভালবাসার পরিবর্ত্তে মিলবে নিগ্রহ, চরম দণ্ড—তবু ও তাঁর সন্তানকে ভালবাসতে হবে ? এই না তাঁর বাণী ? দুঃখবোধ আমার ও আছে। আমার মা আছেন এখানেই। আমার ভাইবোনেরা আছে। সকাল সন্ধ্যা বেলা আমাদের ঘরের নারায়ণকে আমরা প্রণাম করি। মা বলেন—তাঁর কাছেই আমরা মনের বল পাব, শান্তি পাব, শক্তি পাব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার দৃঢ়তা অর্জ্জন করতে পারব !'

-'আপনার মা ! আপনাদের বাড়ী কোথায় ছিল—মামার বাড়ীই বা কোথায় ?'

মামার বাড়ীর গ্রামের নাম শুনিয়া বিস্মিত হই। আমাদের নিজেদেরই গ্রাম। প্রশ্ন করি—আপনার মায়ের নাম ?

—'আমার মায়েব নাম সুরমা দেবী, আপনি কি তাঁকে চিনেন ?'

—'সুরমা দেবী। আপনার দাদুব নাম কি বামাচরণ বাবু ?

—'হাঁ, তা' হলে আপনি আমার 'মা'কে চিনেন ! যাই আমার মাকে ডেকে আনি !'

হাঁ, আমাদের সুরমা পিসিই বটে।

—'হ্যাঁরে—তুই এখানের স্কুল ইন্‌শপেক্টার ! আর আমার মেয়ে ভয়ে অস্থির, কে আসবে ! প্রায় সে রকমই আছিস যে রে ! আজ কিন্তু তোর কিছুতেই যাওয়া হবে না—এখানেই থাকতে হবে। বাড়ীর সবার খবর শুনব।'

আমি একটু আপত্তি করি। মা ও মেয়ের যুক্তিতে তাহা ভাসিয়া যায়।

শ্রাবণের সন্ধ্যা—ঘনায়মান অন্ধকার। আকাশের চারিদিকে মেঘ জমিয়া যে দাপাদাপির সৃষ্টি হয়েছে—তাহার জের কতক্ষণ চলিবে কে জানে। থাকিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে মনে করিলাম। একটা রাত্রি তো বিদ্যালয় গৃহে কাটাইয়া দেওয়া যাইবে।

রাত্রির খাওয়াব আয়োজন চলিতে থাকে।

সুরমা পিসিমা আমার কাছে আসিয়া বসেন।

—'আমাদের সে দুঃখের কথাই তোকে আজ বলব। যেদিন গ্রামের বাড়ী ছেড়ে চলে আসি অসুস্থ ওর বাবাকে নিয়ে, সেদিন একবারও ভাবিনি যে এ ভাবে শেষ পর্য্যন্ত রেণুই আমাদের একমাত্র সম্বল হ'য়ে দাড়াবে। ওর বাবার শরীর আর সারেনি। শরীর ভাঙ্গে মানুষের মনকে কেন্দ্র করেই। মনই যখন ক্লান্ত অবসন্ন, তখন আর দেহটাকে ধরে রাখা যায় কি ? ভাইরা সব নাবালক, রেণুই আমাকে ভরসা দিলে "মা, সবার যিনি ভরসা তিনি আমাদেরও ভরসা আমরা ও মুক্তির পথ খুঁজে পাব। আমাদেব ও সুদিন আসবে মা !"

'তারপর আরম্ভ হ'ল রেণুর অক্লান্ত পরিশ্রম। রেণু তখনও ম্যাট্রিক পাশ করে নি—সামান্য "গ" শ্রেণীর শিক্ষকরূপে এখানে কাজ আরম্ভ করে। সে বৎসরই ওর পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষা দিলও। পরীক্ষার ফল দেখে আমরা অবাক। প্রথম শ্রেণীতেই কেবল পাশ কবেছে তাই নয়—দু তিনটা বিষয়ে শতকরা ৮০র উপর নম্বর পেয়েছিল। এর পরই একদিন এলেন একজন বিদ্যালয় পরিদর্শক—তিনিই ওকে জোর করে বনিয়াদি শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। রেণু প্রথমে প্রবল আপত্তি কবে আমাদের আর্থিক দিক ভেবে। আমিই ওকে জোর করে পাঠাই। কোনও প্রকারে ওর মাইনের টাকা দিয়ে সংসারটা চালিয়ে দিই এক বৎসব। তারপর এই স্কুল বনিয়াদি স্কুল হ'য়ে গেল—শিক্ষকদের আবাস গৃহ প্রস্তুত হল। আজ আমরা একটা নিশ্চিন্ততার মধ্যে এসে পড়েছি। বড় ছেলেটা এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে, আশা করা যায় পাশ ও করে যাবে। রেণু বলছে—ওকে কলেজে পড়াবে।

বেণু আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

শুচিস্মিতা—সন্ধ্যারতি করিয়া এইমাত্র ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

'মা, তুমি বুঝি আবার এঁর কাছে আমাদের সেই পুরাণো কথা বলতে আরম্ভ করেছ?'

মা উত্তর দেন—'এঁর কাছে মানে? এই বিদেশে, বিভূয়ে এ আমাদের পরমাত্মীয়। ওর মার সঙ্গে ছিল আমার কৈশোরের সখ্য। নূতন বৌ ঘরে এসেছি, পল্লীগ্রাম, দিনরাত্র ভয়ে ভয়ে কাটাতাম। একমাত্র পুকুর পাড়ে ওর মার কাছে মনটা খুলে হাসতাম। পাড়া-গাঁয় নূতন বৌয়ের জোরে হাসাও নিষিদ্ধ ছিল!'

রেণু বলে—'মা, ছেড়ে দেও ওসব কথা। অতীতের দুঃখের মধ্যে তোমরা কি যে আনন্দের সূত্র খুঁজে বেড়াও! যাই, এবার রান্নার যোগাড় দেখি। খিচুড়ি খেতে নিশ্চয়ই আপনার কোনও আপত্তি হবে না। আজ যে বর্ষা নেমেছে—কোথায়ও যাওয়াও চলবে না আপনার!'

রেণু চলিয়া যায়।

ওর মাকে প্রশ্ন করি, 'এই শিক্ষকতা, বাড়ীর পরিশ্রম, এর উপর আবার কখন ছবি আঁকে, কখনই বা অন্যান্য কাজ করে?'

—'আর সে কথা বলোনা। কত বলি বিশ্রাম কর একটু, —তোর কি কোনও ক্লান্তিই নেই? ও বলে মা আমি যদি তোমার ছেলে হতাম—তা হলে কি এসব কাজ কাজ করতে হত না? কেবল কি তাই? এবার হতে লেগেছে বি, এ, পরীক্ষাও দিবে। কারুর কোনও কথা গ্রাহ্য করবে না। ঐ যে তরিতরকারির বাগান দেখছ—ভাইবোনে মিলে ঐ বাগানটা করেছে। আজ আমাকে প্রায় সারা বৎসর কোনও তরকারি কিনে খেতে হয় না। আমি দেখছি যখনই ক্লান্ত হয় তখনই এসে ওর নিজের আঁকা ঐ স্বামী বিবেকানন্দ ও যীশুখৃষ্টের ছবির কাছে একমনে তাকিয়ে থাকে। শোয়ার আগে ছোট ভাইবোনদের ও এদের কাছে দাঁড় করিয়ে প্রতিজ্ঞা করায়—সত্যিকার মানুষ হওয়ার ব্রত।'

* * *

রান্না হইয়া গিয়াছে, খাওয়ার ডাক পড়িয়া যায়। আমি ঠাট্টা করিয়া বলি—বিদুষীদের হাতের রান্না হজম হ'লে হয়।'

'মা, তুমি বুঝি আবার এঁর কাছে আমাদের সেই পুরাণো কথা বলতে আরম্ভ করেছ?

রেণু বলে, 'ইস, তা আর হয় না। দেখুন না খেয়ে কেমন রান্না করেছি।'

বাস্তবিকই অমৃত।

আহারের পর শোবার বন্দোবস্ত। প্রায় সংলগ্ন স্কুল গৃহেই শয্যা প্রস্তুতই আছে। না, এদের কোনও দিকে ত্রুটি হবার সুযোগ ইহারা দিবে না।

* * *

বিছানায় শুইয়া—ভাবিতেছি ওদের কথাই। আমি

আজ ওদের অতিথি। সামান্য বাসগৃহে সামান্য আয়—তার মধ্যেও কত তৃপ্তি—কত মধুরতা মিশ্রিত।

ঘুম আসিতেছে না।

চার পাঁচটি কিশোর কণ্ঠের সম্মিলিত কণ্ঠ শুনি—

'শক্তি দাও, বল দাও, দৃঢ়তা দাও, বলিষ্ঠতা দাও—অন্যায়কে প্রতিরোধ করার জন্য দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করার, ন্যায়কে সমর্থন করায়, ইতরতাকে ঘৃণা করার। আমাদের আদর্শ যেন হয় বীরত্বের, তেজস্বীতার, সত্যনিষ্ঠার। আমরা ভয়কে মানব না, আমরা অমৃতের সন্তান, অমৃতকেই পাব।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

তার পর আবার শুনি—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই—
নিঃশেষে যে প্রাণ করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

এ ছবি যেন আমার সম্মুখে দেখিতেছি। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীদেবী নীরবে নিভৃতে অন্তরের পরম দুঃখ পুঞ্জীভূত রাখিয়া নীরবে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছেন।

তন্দ্রা আসিয়া পড়িয়াছিল কি?

ক্ষীণ আলোক রশ্মি যেন শয্যায় আসিয়া পড়িল।

মহীয়সী বর্ত্তিকাধারিণী মহিলার ন্যায় কেহ যেন আসিয়া দেখিয়া গেল আমি সুখসুপ্ত রহিয়াছি কি না।

ধরিত্রী?

শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

* * *

বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, সরকারি চাকুরী, স্থান হইতে স্থানান্তরে বদলি হইয়া চলিয়াছি। রেলগাড়ী যেমন পশ্চাতে ফেলিয়া আসার কোনও বিন্দুর জন্য মায়া মোহ রাখিয়া যায় না—আমাদেরও তেমনি নূতন নূতন পরিবেশকে মানাইয়া চলিতে হয়।

তবুও এরই মধ্যে একটি দুইটি স্মৃতি, একটি দুইটি কাহিনী, একটি দুইটি ঘটনা—জীবন হইতে যেন একেবারে ঝাড়িয়া ফেলা যায় না।

বারংবার মনের দরজায় যেন সহিষ্ণুতার প্রতীক প্রভু যীশুকে দেখি।

ছবি দেখি ক্ষমার অবতার চৈতন্যদেবের।

কানে যেন শুনিতে পাই বীরবাণী।

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, উঠ, জাগ, তোমাদের সম্মুখে অনন্ত কর্ম্মময় জগত!'

আর ও দেখি—

বর্ত্তিকাহস্তে মহিলা চলিয়াছেন—অতন্দ্র রজনীতে কে কোথায় সুখে ও শান্তিতে সুপ্ত রহিয়াছে কি না!

সামান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর ছবিটি বারবার মনে জাগে কেন? এর কথা, এর ইতিহাস নিশ্চয়ই কোনও বড় যুদ্ধের কাহিনীর সহিত বিশ্বের ইতিহাসে স্থান পাইবে না।

তবুও! তবুও।

বারবার পোড়া চোখে জল আসে কেন? রেণু ভাল আছে তো?

আমার এ লেখা যদিই রেণুদের কাহারও হাতে পড়ে—তাহারা যেন আমার অন্তরের পূত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে। আমি জানি বাংলাদেশে এ রকম অনেক রেণু আছে, আজ এ পূজার দিনে আমি বারবার বলি—.

তোমরা বেঁচে থাক, তোমরা বেঁচে থাক, সবাইকে বাঁচাও।

(১২৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আমেরিকায় নানা ভাবে হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, তেজস্ক্রিয় পদার্থে পরিপুষ্ট জীবাণু প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের সাবানের কাপড় জামা পরিষ্কার করিবার শক্তি পরীক্ষা করা হইতেছে।

বৃটেনের ন্যায় আমেরিকাতেও চিকিৎসা কার্য্যে আণবিক শক্তি ব্যবহার করা হইতেছে। কোবাল্টকে তেজস্ক্রিয় করিয়া যে সকল গামা রশ্মি নির্গত করা হইতেছে তাহার সাহায্যে টেনেসির ওকরিজ হাসপাতালে ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গের চিকিৎসায় প্রচুর সাফল্য লাভ করা গিয়াছে। কোবাল্ট হইতে নিঃসৃত এই গামা রশ্মি রেডিয়াম হইতে প্রাপ্ত গামা রশ্মি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী অথচ সমপরিমাণে রেডিয়াম রশ্মি অপেক্ষা প্রায় এক সহস্র গুণ সুলভ বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

কালো চুলের খোঁপা বেঁধে যখন সুবিমল হাসি ছড়িয়ে অভ্যর্থনা করে ডেকে নিয়ে ঘরে বসায়, তখন ভারী সুন্দর মানায় ওর ছন্দে চলার গতির চাঞ্চল্য। তাই চেয়ে চেয়ে দেখে সুভাষ। তবু যেন দেখার শেষ নেই।

সেদিনও ঠিক এমনি সন্ধ্যাবেলা। হঠাৎ প্রশ্ন করে,—কি আমায় এত চেয়ে চেয়ে দেখ, সুভাষদা? যে দিনই আস, দেখি কি যেন অবাক্ দৃষ্টি খুঁজছে তোমার দুটি চোখের তারা; কি সে সুভাষ দা?

কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সুভাষ। আস্তে আস্তে জবাব দেয়, দেখছি, কৈ না তো!

সন্ধ্যার ফোটা শুকতারার দিকে তাকিয়ে লীনা বলে—এতক্ষণ কি তাহলে ওই শুকতারাকে দেখছিলে?

আরো অপ্রস্তুত হয়ে হেসে সুভাষ উত্তর দেয়—না, আজ দেখছিলাম তোমাকে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ, তোমাকে—কেন, তোমাকে দেখতে নেই?

—না, তা নয়—কিন্তু এত কি দেখ?

—দেখি তুমি কত সুন্দর, আর এই যে আমায় এত ভালবাস সে ভালবাসার মূল্য আমি কি কোনদিন দিতে পারব তোমায়? তাই, কি মনে হয় জানো লীনা? কেন আমায় আবদ্ধ করলে এমন করে তোমার ভালবাসার বন্ধনে?—যে ভালবাসার মূল্য আমি কোনদিন দিতে পারব বলে মনে হয় না!

—যুগ যুগ মানুষ মানুষকে ভালবেসেই এসেছে, তাই বলে কি কেউ কোনদিন পেরেছে সত্যিকারে এই ভালবাসার মূল্য দিতে, সুভাষ দা?

—না, তা পেরেছে কি না জানি না—তবে জানি ভালবাসাই ভালবাসার মূল্য, কিন্তু আমি যে তোমায় সে ভালবাসাও দিতে পারলাম না। সত্যি করে বলবে, তুমি আমার কাছ থেকে কি পেলে তোমার ভালবাসা হয়ে উঠবে সার্থক?—বলে সাগ্রহে চোখ তুলে তাকায় সে লীনার পানে।

কিন্তু লীনার কোন সাড়াই পায় না।

আজ সুভাষের অন্তর-প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। যে প্রদীপ ছিল এতদিন অন্ধকারের অতলে ঘুমিয়ে, আজ সে শিখার স্পর্শ পেয়ে উঠল নতুন করে জ্বলে; আর কি তার নিভে যাওয়া সম্ভব? না, না—এরও এক সার্থকতা আছে বৈ কি। অনেক বৎসরের বহু চেষ্টায় জীবনধারণের যে একটা দাম আছে, সে দামের খরিদ্দারেরও তো প্রয়োজন। আজ সে সম্পূর্ণ উপযুক্ত খরিদ্দার পেয়েছে, তাই সমস্ত উজাড় করে দিতেও ওর কোন কুণ্ঠা নেই।

ওর সমস্ত সংযম আজ গেল টুটে, সম্বিৎ গেল হারিয়ে, তাই উন্মত্তের মত লীনার হাত-দুটো ধরে বলে—বল, বল লীনা, সত্যি তুমি কি চাও—কি দিয়ে তোমায় করে তুলতে পারি সম্পূর্ণ সুখী? বল লীনা, আর চুপ করে থেক না!

উন্মত্ত ঝড়ের দোলায় লীনাও যেন এতক্ষণ কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। এখন সম্বিৎ ফিরে পেতেই আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—সত্যি কি চাই জানো সুভাষ দা?—চাই, তুমি বড় হও, সুন্দর হও, দেশের ও দশের একজন হও—তাহলেই দেখবে তোমার ভালবাসা হয়ে উঠবে সার্থক, আমার ভালবাসও পাবে সেদিন সত্যিকারের রূপ।

বেশ, তাই হবে! দশজনের একজন যে দিন হতে পারবো, সেদিন আবার আসব তোমার কাছে—বলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুভাষ।

ক্ষুধিত শিক্ষক রাষ্ট্র ও সমাজের বিপদ স্বরূপ। বিদ্রোহ, বিপ্লব ও বিপর্য্যয়ের বীজ বপন করিতে তাহাদের বাধ্য করিবেন না। সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের জীবিকা ও মর্য্যাদা দিয়া কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করুন।

মানব সভ্যতায় উদ্ভিদ বীজের প্রসার

শ্রীতেজেশ সেন

পরিপক্ক অবস্থায় বীজ গাছ হ'তে মাটিতে ঝরে পড়ে। মাটিতে পড়ে কতক বীজ নষ্ট হ'য়ে, যায় কতক হয় অঙ্কুরিত, কতক শুকনো ডালপালা ইঁটপাথর মৃত্তিকা স্তূপের তলায় চাপা পড়ে সুরক্ষিত অবস্থায় দীর্ঘকাল অবস্থান করে। কতক মৃত্তিকাভ্যন্তরে ফসিলে পরিণত হয়।

মাটির তলায় সুরক্ষিত এক একটি বীজ প্রাচীন কালের মানব সভ্যতার এক একটি যেন ইঙ্গিত। সেই সব সুরক্ষিত বীজ হ'তে আমরা জানতে পারি সে যুগের প্রাকৃতিক অবস্থা, গাছপালার প্রকৃতি ও আজিকার গাছপালার সঙ্গে তাদের কিরূপ সম্বন্ধ।

প্রাচীন সভ্যতার বহু চিহ্ন আজও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত হ'য়ে আছে। সেই চিহ্ন উদ্ধার করতে গিয়ে তাদের সঙ্গে পাওয়া গেছে নানা জাতীয় ফল ও শস্যদানার বীজ। প্রাত্নতাত্ত্বিকের নিকট সেই সব বীজের মূল্য খুব বেশি, তাঁরা সেই সব বীজকে মোটেই উপেক্ষার চোখে দেখেন না। তার ভিতর হ'তে তাঁরা উদ্ধার করেন প্রাচীনকালের লুপ্ত সভ্যতার ইতিহাস, আদি মানবের শক্তির বিভিন্ন দিক।

প্রাচীন প্রস্তর-যুগে (paleolithic) স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই পশুপক্ষীর ন্যায় সর্বদাই আহার অন্বেষণে ব্যস্ত থাকতে হতো। পুরুষরা বনে জঙ্গলে শিকার করতো বন্য জন্তু, স্ত্রীলোকেরা বন হ'তে সংগ্রহ ক'রে আনতো নানাবিধ ফলমূল ও নানা জাতীয় ঘাসের বীজ। বর্তমান কালের গম যব বজরা প্রভৃতি শস্যদানার পূর্বপুরুষ তাদেরই কোন কোন জাতীয় ঘাসের বীজ। বর্তমান সভ্যতার গোড়া পত্তনে তাদের দান সামান্য নয়।

নব্য-প্রস্তর যুগে (neolithic) মানুষ যখন সেই সব ঘাস বীজকে প্রথম নিজেদের আবাস সংলগ্ন ভূমিতে নিজেদের ইচ্ছামত জন্মাতে দেখে, তখন থেকে মানব সভ্যতার মোড় ঘুরে যায় এক নতুন পথে। এতদিন মানুষের ছিল যাযাবর জীবন—তাদের জীবনযাত্রা ছিল অনিশ্চিত। আহার্য সংস্থানের জন্য তাদের ঘুরে বেড়াতে হ'তো স্থান হ'তে স্থানান্তরে, দেশ হ'তে দেশান্তরে। মানুষ যেদিন অরণ্যজাত ঘাসের বীজকে নিজেদের আবাসস্থানে জন্মাতে শিখলো, সেদিন থেকে অবসান ঘটলো তাদের যাযাবর জীবনের অনিশ্চিত অবস্থা। সেদিন থেকে উর্বরভূমি আশ্রয় করে সভ্যতার আদিরূপ গ্রামপল্লী গড়ে উঠতে লাগলো। পল্লী সভ্যতার পত্তন হলো সেদিন থেকে।

জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক হীর্ (Dr. otto Heer) সাহেব বহুদিন গবেষণা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন সুইজারলেণ্ডের হ্রদবাসী মানব-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার পদ্ধতি উদ্ধারের চেষ্টায়। হ্রদের জলে মাচার উপর গৃহ নির্মাণ করে তাদের বাস করবার প্রধান কারণ ছিলো হ্রদের মৎস্য প্রাচুর্য। মাছ ধরবার নানাবিধ যন্ত্রপাতির সঙ্গে হ্রদের কাদামাটিতে পাওয়া গেছে নানাবিধ ফলের আঁটি বা বীচি। তাদের মধ্যে পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে প্লুম, চেরী, আঙ্গুর, নানাজাতীয় বেরি ফলের বীচি। গম, যব, বজরা প্রভৃতি শস্যদানার প্রচলনও তখন তাদের মধ্যে ছিল। এখন যে-জাতীয় গম বজরা প্রভৃতিতে রুটি তৈরি হয়, হ্রদের কাদামৃত্তিকায় পাওয়া গেছে সেই জাতীয় গম বজরা প্রভৃতি শস্যদানা ও তাদের খোসা। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, রুটি আহারে ওরাও তখন অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলো। তার পরবর্তী সময়কে বলা হয় পিত্তল যুগ (Bronze Age)। পিত্তল যুগের মানব সভ্যতার যে সব চিহ্ন মাটির তলা হতে উদ্ধার করা হয়েছে—তার মধ্যে পাওয়া গেছে বিন্ জাতীয় সবজীর বীজ। এই সময়েই মানুষ প্রথম বিন্ জাতীয় সবজী

আহার্যরূপে গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। পূর্বোক্ত সব জাতীয় বীজই আজিকার যুগের বীজ অপেক্ষা আকারে ছোট। সেই সব বীজই চাষের ভূমিতে ক্রমশ উৎকর্ষতা লাভ ক'রে আজিকার দিনের উৎকৃষ্টতর ফল, সবজী ও শষ্যদানায় পরিণত হয়েছে।

এ গেল প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের কথা। ঐতিহাসিক যুগের বীজের কাহিনী আরো বেশি চমকপ্রদ।

বর্তমান সভ্যতার আদি পীঠস্থান মিশরের নীল নদের উপত্যকা ভূমি। সেকালের মিশরের রাজাদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাঁরা নিজেদের তাঁদেরই আরাধ্য দেবতার অংশ ব'লে মনে করতেন। মৃত্যুর পর তাঁদের কোন অস্তিত্ব থাকবেনা, এ তাঁরা কল্পনাও করতে পারতেন না। তাই মৃত্যুর পর তাঁদের দেহ মাটিতে রূপান্তরিত ক'রে রক্ষিত হতো পিরামিডের অন্ধকার, গর্তে মাটির তলায়। আর সেই মাটিতে থাকতো ইহলোকের যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ। সেই সব উপকরণের সঙ্গে মাটির পাকস্থলীতে পাওয়া গেছে নানাবিধ আহার্য বস্তু। সেই আহার্য বস্তুর কতক হচ্ছে গম, যব, বজরার দানা। এক সময়ে খবরের কাগজে রব উঠেছিলো মাটির উদরে ও হারকিউলেনিয়াম্ নগরীর ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত গমের বীজের প্রাণশক্তি তখনো লুপ্ত হয়নি—গমের বীজ হতে চারা জন্মানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে গমের বীজ ১৬ বৎসর পর্যন্ত প্রাণধারণে সক্ষম। তদপেক্ষা প্রাচীন গমের বীজ অঙ্কুর উৎপাদনে অসমর্থ।

কোন্ জাতীয় বীজ কত বৎসর পর্যন্ত অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ তা পরীক্ষা ক'রে দেখবার চেষ্টা হয়েছে। সে চেষ্টায় ফল পাওয়া গেছে অতিশয় আশ্চর্যজনক। পরীক্ষায় দেখা গেছে সুঁষি (Legume) জাতীয় উদ্ভিদ বীজের প্রাণ ধারণের সক্ষমতা সর্বাপেক্ষা অধিককাল। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায়।

ইংলণ্ডের কেনসিংটন্ উদ্যানের বীজাগারে নানা জাতীয় বহু পুরাতন বীজ রক্ষিত ছিলো। গত যুদ্ধে ১৯৪০ সনে জার্মেনীর বোমার গোলায় সেই বীজাগার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তিন মাস পরে দেখা গেলো বৃষ্টির জলে সিক্ত দু'জাতীয় বীজ হ'তে অঙ্কুর উদ্গম হয়েছে। তাদের প্রাচীনত্ব ১৪৭ বৎসর। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সর জর্জ ষ্টান্টন্ (Sir George Staunton) সাহেব চীনদেশে অভিযানের সময় সে-দেশ হতে এই বীজ সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন। এই সুদীর্ঘকালেও ইহাদের প্রাণশক্তি নষ্ট হয়নি।

উদ্ভিদবীজের পরমায়ু গণনার ইহাই শেষ ফল নয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক লিনিয়ান্ সোসাইটিতে (Linnean Soceity) বক্তৃতালে ডঃ রেম্‌বটম্ (Dr. Rambottom) সাহেব শ্রোতাদের সামনে কয়েকটি পদ্মজাতীয় ফুলের চারা উপস্থিত করেছিলেন। মাঞ্চুরিয়ার প্রাগঐতিহাসিক যুগের একটি খনি হ'তে তিনি সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন কয়েকটি পদ্মজাতীয় ফুলের বীজ। সেই বীজ হ'তেই তিনি উপরোক্ত চারা কয়টি জন্মিয়েছিলেন। এই জাতীয় পদ্মেরই তিনি অন্য একটি চারা উৎপাদন করেছিলেন স্লোয়ান্ (Sloane) বীজাগারের বীজ হ'তে। সেস্থানে সেই চারার বীজটি সংগৃহিত হয়েছিলো অন্ততঃ ২৪০ বৎসর পূর্বে। যতদূর জানা গেছে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা রক্ষা করবার ইহাই সর্বাধিক বয়স।

জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বিগ্রহ ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারেও বীজের প্রভাব নিতান্ত সামান্য নয়। মাংসে পচন ধরলে তাতে গন্ধ হয়। সেই গন্ধ দূর করে মাংসকে সুস্বাদু করবার জন্য এক সময়ে মশলাজাতীয় দ্রব্যের আদর ছিলো ইউরোপে খুব বেশি। এই মশলার অধিকাংশই নানা জাতীয় উদ্ভিদের বীজ। তাদের জন্মস্থান এশিয়ার দক্ষিণাংশের দ্বীপ সমূহে। এই সব দ্বীপ সমূহে ইউরোপীয় জাতি সমূহের রাজ্য বিস্তারের প্রধান কারণ মশলার দ্বীপসমূহের উপর আধিপত্য লাভের চেষ্টা।

এক সময় রোগ নিবারণে নানা জাতীয় উদ্ভিদের ছাল, বাকল, পাতা ও বীজই ছিল প্রধান ঔষধ। কুষ্ঠ ব্যাধিতে চালমুগরা তেলের প্রয়োগ চলে আসছে বহু প্রাচীন কাল হ'তে। এই তেল তৈরি হয় চালমুগরা গাছের বীজ হ'তে। কিংবদন্তী আছে কোন ব্রহ্মদেশীয় রাজপুত্রের কুষ্ঠ ব্যাধি

হওয়ায় তাকে বনে নির্বাসিত করা হয়। সেই বনে ছিলো চালমুগরার গাছ। নির্বাসিত অবস্থায় রাজপুত্র অন্যান্য ফল মূলের সঙ্গে রোজই খেতেন কিছু পরিমাণ চালমুগরার বীজ। আর সেই বীজ আহারের ফলেই তিনি হন রোগমুক্ত। ডাক্তারী শাস্ত্রে বিষ হলেও ষ্ট্রিকনিন্ (Strychnine) খুব বড় একটি ঔষধ। ষ্ট্রিকনিন্ কুচিলা ফলের কষ বা রস। কবিরাজী শাস্ত্রের অধিকাংশ ঔষধই উদ্ভিদ জাত, কিছু তাদের ছাল, বাকল, মূল, কিছু তাদের বীজ।

মানুষের পানীয়ে, বিশেষভাবে আরামপ্রদ পানীয়েও, উদ্ভিদ বীজের প্রভাব নিতান্ত সামান্য নয়। আজকাল সভ্য সমাজের আরামপ্রদ পানীয় চা ও কফি। কফি তৈরি হয় কফি-বীজ হ'তে, চা পাতা হ'তে তৈরি হলেও চারা জন্মানো হয় বীজ হতে। আজকাল কফির চাষ সর্বাপেক্ষা বেশি দক্ষিণ আফ্রিকায়। সে স্থানে বিস্তৃত চাষের ভূমির যাবতীয় কফি গাছের আদি-পুরুষ আমেষ্টারডামের উদ্ভিদ উদ্যানে উৎপন্ন একটি চারা। সেই চারাকে জন্মানো হয়েছিল একটি বীজ হতে। ভারতে চা গাছও প্রথম জন্মানো হয়ে ছিলো চীন হ'তে আনীত চা-বীজ হতে।

বিভিন্ন দেশে নানাবিধ অর্থকরী বৃক্ষ আমদানীর সঙ্গেও যুক্ত হয়ে আছে উদ্ভিদ-বীজের বিচিত্র কাহিনী। রবার সেইরূপ একটি অর্থকরী বৃক্ষ। ইহার আদি জন্মস্থানও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশ। ভারতে এই বৃক্ষ রোপণের জন্য বিলেতের কিউ গার্ডেনে প্রায় ৭০,০০০ বীজ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথম রোপণ করা হয়। সেই বীজেরই সহস্রাধিক চারা সিলোন্ দ্বীপে প্রেরিত হয় রোপণ করবার জন্য। আজ তাদেরই বীজের চারা হ'তে মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে রবারের চাষ হচ্ছে ব্যাপকভাবে।

কোন কোন অর্থকরী গাছের জন্য জাতিতে জাতিতে রেষারেষিও কম সৃষ্ট হয়নি। ম্যালেরিয়ার আক্রমণ রোধ করবার একমাত্র মহৌষধ এক সময় ছিল কুইনাইন্। এই কুইনাইন্ তৈরীর জন্য দরকার 'সিঙ্কোনা' নামক একপ্রকার গাছের। এই গাছের জন্মস্থানও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশে। ডাচেরা ইহা প্রথম আমদানী করে জাভা দ্বীপে। সিঙ্কোনা চাষে ডাচদের অর্থাগম হতো প্রচুর। পাছে তাদের এই লাভজনক ব্যবসা অন্য কোন জাতি, বিশেষ করিয়া ইংরেজরা কেড়ে নেয়, সেই জন্য জাভা দ্বীপের বাইরে বীজ প্রেরণ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইংরেজদের মধ্যে উদ্যোগী পুরুষসিংহের অভাব নেই। তাদের মধ্যে স্যার ক্লেমেণ্ট মারখাম্ নামক একজন উদ্যোগী পুরুষ তাঁর দলবল নিয়ে বহু অনুসন্ধানে আণ্ডিজ পর্ব্বতে এই গাছ আবিষ্কার করেন। প্রথমে বিলেতের কিউ গার্ডেনে সিঙ্কোনার বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা হয় এবং সেই চারা থেকেই প্রথমে সিলোন ও পরে ভারতে সিঙ্কোনার চাষ আরম্ভ হয়।

ব্যবসাক্ষেত্রে বীজ ক্রমশঃই উচ্চস্থান অধিকার করছে; তাই আজকাল বীজ-ব্যবসায়ীর সংখ্যাও বাড়ছে। তাদের একমাত্র কাজ—নানাজাতীয় বীজ উৎপাদন করা। আজকাল খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাওয়া যায় নতুন নতুন বীজোৎপাদক নার্শারীর বিজ্ঞাপন। তারা কতক বীজ আমদানী করে বিদেশ থেকে, আর কতক নিজেরাই উৎপাদন করে তাদের চাষের ভূমিতে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত মানুষের খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় কাঁচা মালের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। সেই তালিকার মধ্যে ছিল নানা জাতীয় শস্যদানা ও স্নেহজাতীয় উৎপাদক বীজ। লড়াইয়ে খাদ্য-সমস্যা একটি খুব বড় সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য উপরোক্ত তালিকা প্রস্তুত হয়েছিল। আধুনিক কালের যুদ্ধে রবারও একটি অপরিহার্য্য বস্তু। সিঙ্গাপুর, মালয় প্রভৃতি রবারের দেশ যখন শত্রুর হাতে পড়ে, তখন কৃত্রিম উপায়ে রবার প্রস্তুতের জন্য চেষ্টা হ'তে থাকে। সুখের বিষয়—সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে। এখন সেই তালিকায় প্রাপ্ত নানাজাতীয় শস্যদানা থেকে প্রাপ্ত সুরাসার (Alcohol) প্রস্তুত ক'রে তারই সাহায্যে রবার তৈরী হচ্ছে। গত লড়াইয়ে সমরোপকরণে, বিশেষ করিয়া মারণাস্ত্র নির্ম্মাণে নানাবিধ শস্যদানা ও অন্যান্য উদ্ভিদ-বীজকে কিভাবে ও কি পরিমাণে ব্যবহার করা যেতে পারে, তারও চেষ্টা হয়েছিল ব্যাপকভাবে; তবে সে সংবাদ সর্ব্বজন-গম্য নয় ব'লে তা প্রকাশিত হয়নি।

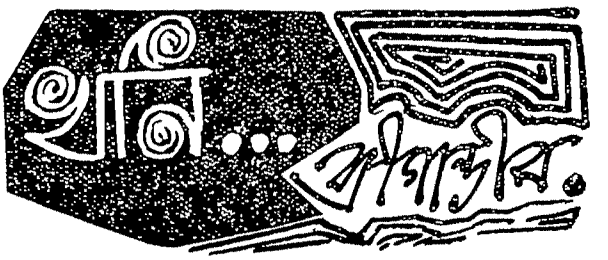

সহিষ্ণুতার অবতার যীশুখৃষ্টের একখানা বড় গ্লাস-পেণ্টীং। একদৃষ্টে ছবিখানার দিকে তাকাইয়া আছি। ভাবিতেছি—কৃতিত্ব কাহার—চিত্রকরের, না সহিষ্ণুতার?

—'এ কি! আপনি এক ভাবেই ছবিখানার দিকে তাকিয়ে ব'সে আছেন! এই নিন সামান্য জলখাবার ও চা।'

স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়। অতীতের যুগে চলিয়া গিয়াছিলাম। যুগে যুগে মানুষ মানুষের জন্য আনিয়াছে দুঃখ, বেদনা, যাতনা—আবার মানুষই মানুষকে দিয়াছে সুখ, সান্ত্বনা, মাধুর্য্য আর পরম তৃপ্তি। বিস্তীর্ণ বালুকা-বক্ষ দামোদর অতিক্রম করিবার সময় বারংবার এই কথাই ভাবিতেছিলাম যে, এই বালুকারাশির নিম্নে যদি স্বচ্ছ সুশীতল পানীয় মিলিতে পারে—জীবনের চারিদিকে আজ যে গভীর হতাশা দেখা দিয়াছে—মানুষের জীবন আজ যে কালের নাগপাশ-বন্ধনে বিকৃত রূপ ধারণ করিতেছে—ইহার পশ্চাতেও কি রহিয়া গিয়াছে কোনও স্বচ্ছ বারি-ধারা, কোনও স্নিগ্ধ পেয়-রাশি—যাহাতে সমগ্র অন্তর পরিতৃপ্তি অর্জ্জন করিতে পারে?

—'এ ছবিখানার ভিতর আপনি কি দেখছেন? আমারই এ আঁকা ছবি—একটুও ভাল হয়নি; এখনও শেষ করি নি।'

—'তা'হলেও চমৎকার হয়েছে এ ছবি! যতই দেখছি—তৃপ্তি আসচে না! ভাবছি—কত বড় সহিষ্ণুতার প্রতীক। ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর দিব্যপুরুষ অম্লান বদনে সহ্য করে যাচ্ছেন ক্রুশবহনের বোঝা, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা! তিনি সে যুগেই ভবিষ্যকালের এ রূপ দেখেছিলেন যে মানুষ এমনি ভাবেই ক্রুশ বিদ্ধ ক'রে ভগবানের প্রিয় সন্তানদের তিলে তিলে শেষ ক'রে দেবে। যাঁরা সহ্য ক'রে যাচ্ছেন, তাঁরা হাসিমুখেই চিরদিন সহ্য ক'রে যাবেন।'

—'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন—এই ভেবে আমারও শান্তি নেই। মানুষের এর পরিণতি কোথায়? মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে দ্বন্দ্ব, এর পরিণতি কোথায়?'

অবাক হই, সামান্য শিক্ষক এরও আবার এ সমস্ত ভাববার আছে নাকি?

যাচাই করিবার ইচ্ছা হয়, পাথরকে তো ঘসিয়াই দেখিতে হয়।

—'আপনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন?'

'এই সামান্যই, আই, এ, পাশ করেছি কোনও মতে। আমার বাবা মারা গেলেন—সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ল, তাই থেকে এ শিক্ষকতা নিয়েই আছি।'

—'আর আপনার এ ছবি আঁকা?'

—'এটা অনেকটা আমাদের পরিবারের ভগবান প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ। আমাদের বাড়ীর সকলেরই সঙ্গীত এবং চিত্রবিদ্যার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে।'

বিদ্যালয় পরিদর্শন বহু পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়াছিল। ত্রুটির সন্ধানেই ছিলাম—কেন না বেনামি চিঠি গিয়াছিল যে প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিজের বাড়ীর কাজেই এত বিব্রত যে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম্ম কিছুই দেখেন না। দেখিলাম প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের যথাযথ দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকা, হিসাবের খাতাপত্র, শ্রেণীর ছেলে মেয়েদের যথাযথ বিন্যাশ—সবই নিখুঁত। সকলের শেষে প্রশ্ন করি—'আপনার তো এ বিদ্যালয়ে বহুদিন হয়ে গেল—অন্যত্র বদলি হবেন কি?'

রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাত্রি কাটাইয়াছি, মুমূর্ষুর বেদনার্ত্ত মুখ দেখিয়াছি—কিন্তু এত ব্যথাতুর দৃষ্টির সন্ধান পাই নাই। সমস্ত মুখ নিমেষে রক্তহীন হইয়া—দুঃখের মূর্ত্তরূপ ভাসিয়া উঠিল।

শুনিলাম—'এ বিদ্যালয় আমার অস্থিমজ্জা দিয়ে গঠিত। দশ বছর আগে আমি সামান্য এম, ই, পাশ করে—কয়েকটি ছাত্রছাত্রী নিয়ে এ বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করি। আজ এ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দেড়শ দাঁড়িয়েছে, একে ছেড়ে যাওয়া কি সম্ভব? এ আজ বনিয়াদি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত, আমি এর প্রধান শিক্ষয়িত্রী।'

—'কিন্তু এখানে থেকে যদি আপনাকে অপমান সহ্য করতে হয়—তবুও এখানেই থাকা ভাল লাগবে কি ?'

—'সহ্যর কথা বলছেন ? সহ্যের প্রতীক যিনি তিনি তো আপনার সম্মুখেই রয়েছেন। তাঁর কাছেই প্রশ্নের উত্তর পাবেন। তিনি কি আমাদের এ কথাই বলে যাচ্ছেন না—যে যুগে যুগে মানব-সন্তান হবে নিপীড়িত, ভালবাসার পরিবর্ত্তে মিলবে নিগ্রহ, চরম দণ্ড—তবু ও তাঁর সন্তানকে ভালবাসতে হবে ? এই না তাঁর বাণী ? দুঃখবোধ আমার ও আছে। আমার মা আছেন এখানেই। আমার ভাইবোনেরা আছে। সকাল সন্ধ্যা বেলা আমাদের ঘরের নারায়ণকে আমরা প্রণাম করি। মা বলেন—তাঁর কাছেই আমরা মনের বল পাব, শান্তি পাব, শক্তি পাব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার দৃঢ়তা অর্জ্জন করতে পারব !'

-'আপনার মা ! আপনাদের বাড়ী কোথায় ছিল—মামার বাড়ীই বা কোথায় ?'

মামার বাড়ীর গ্রামের নাম শুনিয়া বিস্মিত হই। আমাদের নিজেদেরই গ্রাম। প্রশ্ন করি—আপনার মায়ের নাম ?

—'আমার মায়ের নাম সুরমা দেবী, আপনি কি তাঁকে চিনেন ?'

—'সুরমা দেবী। আপনার দাদুর নাম কি বামাচরণ বাবু ?

—'হাঁ, তা' হলে আপনি আমার 'মা'কে চিনেন ! যাই আমার মাকে ডেকে আনি।'

হাঁ, আমাদের সুরমা পিসিই বটে।

—'হ্যাঁরে—তুই এখানের স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টার ! আর আমার মেয়ে ভয়ে অস্থির, কে আসবে ! প্রায় সে রকমই আছিস যে রে ! আজ কিন্তু তোর কিছুতেই যাওয়া হবে না—এখানেই থাকতে হবে। বাড়ীর সবার খবর শুনব।'

আমি একটু আপত্তি করি। মা ও মেয়ের যুক্তিতে তাহা ভাসিয়া যায়।

শ্রাবণের সন্ধ্যা—ঘনায়মান অন্ধকার। আকাশের চারিদিকে মেঘ জমিয়া যে দাপাদাপির সৃষ্টি হয়েছে—তাহার জের কতক্ষণ চলিবে কে জানে। থাকিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে মনে করিলাম। একটা রাত্রি তো বিদ্যালয় গৃহে কাটাইয়া দেওয়া যাইবে।

রাত্রির খাওয়াব আয়োজন চলিতে থাকে।

সুরমা পিসিমা আমার কাছে আসিয়া বসেন।

—'আমাদের সে দুঃখের কথাই তোকে আজ বলব। যেদিন গ্রামের বাড়ী ছেড়ে চলে আসি অসুস্থ ওর বাবাকে নিয়ে, সেদিন একবারও ভাবিনি যে এ ভাবে শেষ পর্য্যন্ত রেণুই আমাদের একমাত্র সম্বল হ'য়ে দাড়াবে। ওর বাবার শরীর আর সারেনি। শরীর ভাঙ্গে মানুষের মনকে কেন্দ্র করেই। মনই যখন ক্লান্ত অবসন্ন, তখন আর দেহটাকে ধরে রাখা যায় কি ? ভাইরা সব নাবালক, রেণুই আমাকে ভরসা দিলে "মা, সবার যিনি ভরসা তিনি আমাদেরও ভরসা আমরা ও মুক্তির পথ খুঁজে পাব। আমাদের ও সুদিন আসবে মা !"

'তারপর আরম্ভ হ'ল রেণুর অক্লান্ত পরিশ্রম। রেণু তখনও ম্যাট্রিক পাশ করে নি—সামান্য "গ" শ্রেণীর শিক্ষকরূপে এখানে কাজ আরম্ভ করে। সে বৎসরই ওর পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষা দিলও। পরীক্ষার ফল দেখে আমরা অবাক। প্রথম শ্রেণীতেই কেবল পাশ করেছে তাই নয়—দু তিনটা বিষয়ে শতকরা ৮০র উপর নম্বর পেয়েছিল। এর পরই একদিন এলেন একজন বিদ্যালয় পরিদর্শক—তিনিই ওকে জোর করে বনিয়াদি শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। রেণু প্রথমে প্রবল আপত্তি করে আমাদের আর্থিক দিক ভেবে। আমিই ওকে জোর করে পাঠাই। কোনও প্রকারে ওর মাইনের টাকা দিয়ে সংসারটা চালিয়ে দিই এক বৎসর। তারপর এই স্কুল বনিয়াদি স্কুল হ'য়ে গেল—শিক্ষকদের আবাস গৃহ প্রস্তুত হল। আজ আমরা একটা নিশ্চিন্ততার মধ্যে এসে পড়েছি। বড় ছেলেটা এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে, আশা করা যায় পাশ ও করে যাবে। রেণু বলছে—ওকে কলেজে পড়াবে।

রেণু আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

শুচিস্মিতা—সন্ধ্যারতি করিয়া এইমাত্র ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

'মা, তুমি বুঝি আবার এঁর কাছে আমাদের সেই পুরাণো কথা বলতে আরম্ভ করেছ?'

মা উত্তর দেন—'এঁর কাছে মানে? এই বিদেশে, বিভূয়ে এ আমাদের পরমাত্মীয়। ওর মার সঙ্গে ছিল আমার কৈশোরের সখ্য। নূতন বৌ ঘরে এসেছি, পল্লীগ্রাম, দিনরাত্র ভয়ে ভয়ে কাটাতাম। একমাত্র পুকুর পাড়ে ওর মার কাছে মনটা খুলে হাসতাম। পাড়া-গাঁয় নূতন বৌয়ের জোরে হাসাও নিষিদ্ধ ছিল!'

রেণু বলে—'মা, ছেড়ে দেও ওসব কথা। অতীতের দুঃখের মধ্যে তোমরা কি যে আনন্দের সূত্র খুঁজে বেড়াও! যাই, এবার রান্নার যোগাড় দেখি। খিচুড়ি খেতে নিশ্চয়ই আপনার কোনও আপত্তি হবে না। আজ যে বর্ষা নেমেছে—কোথায়ও যাওয়াও চলবে না আপনার!'

রেণু চলিয়া যায়।

ওর মাকে প্রশ্ন করি, 'এই শিক্ষকতা, বাড়ীর পরিশ্রম, এর উপর আবার কখন ছবি আঁকে, কখনই বা অন্যান্য কাজ করে?'

—'আর সে কথা বলোনা। কত বলি বিশ্রাম কর একটু, —তোর কি কোনও ক্লান্তিই নেই? ও বলে মা আমি যদি তোমার ছেলে হতাম—তা হলে কি এসব কাজ কাজ করতে হত না? কেবল কি তাই? এবার হতে লেগেছে বি, এ, পরীক্ষাও দিবে। কারুর কোনও কথা গ্রাহ্য করবে না। ঐ যে তরিতরকারির বাগান দেখছ—ভাইবোনে মিলে ঐ বাগানটা করেছে। আজ আমাকে প্রায় সারা বৎসর কোনও তরকারি কিনে খেতে হয় না। আমি দেখছি যখনই ক্লান্ত হয় তখনই এসে ওর নিজের আঁকা ঐ স্বামী বিবেকানন্দ ও যীশুখৃষ্টের ছবির কাছে একমনে তাকিয়ে থাকে। শোয়ার আগে ছোট ভাইবোনদের ও এদের কাছে দাঁড় করিয়ে প্রতিজ্ঞা করায়—সত্যিকার মানুষ হওয়ার ব্রত।'

* * *

রান্না হইয়া গিয়াছে, খাওয়ার ডাক পড়িয়া যায়। আমি ঠাট্টা করিয়া বলি—বিদুষীদের হাতের রান্না হজম হ'লে হয়।'

'মা, তুমি বুঝি আবার এঁর কাছে আমাদের সেই পুরাণো কথা বলতে আরম্ভ করেছ?

রেণু বলে, 'ইস, তা আর হয় না। দেখুন না খেয়ে কেমন রান্না করেছি।'

বাস্তবিকই অমৃত।

আহারের পর শোবার বন্দোবস্ত। প্রায় সংলগ্ন স্কুল গৃহেই শয্যা প্রস্তুতই আছে। না, এদের কোনও দিকে ত্রুটি হবার সুযোগ ইহারা দিবে না।

* * *

বিছানায় শুইয়া—ভাবিতেছি ওদের কথাই। আমি

আজ ওদের অতিথি। সামান্য বাসগৃহে সামান্য আয়—তার মধ্যেও কত তৃপ্তি—কত মধুরতা মিশ্রিত।

ঘুম আসিতেছে না।

চার পাঁচটি কিশোর কণ্ঠের সম্মিলিত কণ্ঠ শুনি—

'শক্তি দাও, বল দাও, দৃঢ়তা দাও, বলিষ্ঠতা দাও—অন্যায়কে প্রতিরোধ করার জন্য দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করার, ন্যায়কে সমর্থন করার, ইতরতাকে ঘৃণা করার। আমাদের আদর্শ যেন হয় বীরত্বের, তেজস্বীতার, সত্যনিষ্ঠার। আমরা ভয়কে মানব না, আমরা অমৃতের সন্তান, অমৃতকেই পাব।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

তার পর আবার শুনি—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই—
নিঃশেষে যে প্রাণ করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

এ ছবি যেন আমার সম্মুখে দেখিতেছি। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীদেবী নীরবে নিভৃতে অন্তরের পরম দুঃখ পুঞ্জীভূত রাখিয়া নীরবে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছেন।

তন্দ্রা আসিয়া পড়িয়াছিল কি?

ক্ষীণ আলোক রশ্মি যেন শয্যায় আসিয়া পড়িল।

মহীয়সী বর্ত্তিকাধারিণী মহিলার ন্যায় কেহ যেন আসিয়া দেখিয়া গেল আমি সুখসুপ্ত রহিয়াছি কি না।

ধরিত্রী?

শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

* * *

বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, সরকারি চাকুরী, স্থান হইতে স্থানান্তরে বদলি হইয়া চলিয়াছি। রেলগাড়ী যেমন পশ্চাতে ফেলিয়া আসার কোনও বিন্দুর জন্য মায়া মোহ রাখিয়া যায় না—আমাদেরও তেমনি নূতন নূতন পরিবেশকে মানাইয়া চলিতে হয়।

তবুও এরই মধ্যে একটি দুইটি স্মৃতি, একটি দুইটি কাহিনী, একটি দুইটি ঘটনা—জীবন হইতে যেন একেবারে ঝাড়িয়া ফেলা যায় না।

বারংবার মনের দরজায় যেন সহিষ্ণুতার প্রতীক প্রভু যীশুকে দেখি।

ছবি দেখি ক্ষমার অবতার চৈতন্যদেবের।

কানে যেন শুনিতে পাই বীরবাণী।

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, উঠ, জাগ, তোমাদের সম্মুখে অনন্ত কর্ম্মময় জগত!'

আর ও দেখি—

বর্ত্তিকাহস্তে মহিলা চলিয়াছেন—অতন্দ্র রজনীতে কে কোথায় সুখে ও শান্তিতে সুপ্ত রহিয়াছে কি না!

সামান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর ছবিটি বারবার মনে জাগে কেন? এর কথা, এর ইতিহাস নিশ্চয়ই কোনও বড় যুদ্ধের কাহিনীর সহিত বিশ্বের ইতিহাসে স্থান পাইবে না।

তবুও! তবুও।

বারবার পোড়া চোখে জল আসে কেন? রেণু ভাল আছে তো?

আমার এ লেখা যদিই রেণুদের কাহারও হাতে পড়ে—তাহারা যেন আমার অন্তরের পূত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে। আমি জানি বাংলাদেশে এ রকম অনেক রেণু আছে, আজ এ পূজার দিনে আমি বারবার বলি—

তোমরা বেঁচে থাক, তোমরা বেঁচে থাক, সবাইকে বাঁচাও।

(১২৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আমেরিকায় নানা ভাবে হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, তেজস্ক্রিয় পদার্থে পরিপুষ্ট জীবাণু প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের সাবানের কাপড় জামা পরিষ্কার করিবার শক্তি পরীক্ষা করা হইতেছে।

বৃটেনের ন্যায় আমেরিকাতেও চিকিৎসা কার্য্যে আণবিক শক্তি ব্যবহার করা হইতেছে। কোবাল্টকে তেজস্ক্রিয় করিয়া যে সকল গামা রশ্মি নির্গত করা হইতেছে তাহার সাহায্যে টেনেসির ওকরিজ হাসপাতালে ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গের চিকিৎসায় প্রচুর সাফল্য লাভ করা গিয়াছে। কোবাল্ট হইতে নিঃসৃত এই গামা রশ্মি রেডিয়াম হইতে প্রাপ্ত গামা রশ্মি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী অথচ সমপরিমাণে রেডিয়াম রশ্মি অপেক্ষা প্রায় এক সহস্র গুণ সুলভ বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

কবিতার প্রতি বিতৃষ্ণা

কবিশেখর কালিদাস রায়—

Ajit

এক তরুণ কবির সঙ্গে দেখা পার্কে। একটা বেঞ্চিতে আমার পাশে সে বস্‌ল।

আমি বল্‌লাম—কি হে, আজকাল খুব লিখ্‌ছ?

কবি—না, স্যার, আর লিখে কি হবে? কবিতা কেউ পড়ে না। আমাদের লেখার পাঠক এখনো দেশে তৈরী হয়নি।

আমি—কবিতা যে কেউ পড়ে না, আর এখন সাহিত্য বল্‌লে যে শুধু কথাসাহিত্যই বুঝায়, তার জন্য দায়ী তোমরা।

কবি—কেন, আমরা গদ্য-কবিতা লিখি ব'লে বল্‌ছেন—রবীন্দ্রনাথই ত গদ্য-কবিতা লেখার সূত্রপাত ক'রে গিয়েছেন।

আমি—রবীন্দ্রনাথের নাম তোমরা ক'রো না। তোমরা রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ধারা ত অনুসরণ করছ না। রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা লিখেছেন—কিন্তু তোমরা যা লিখছ তা গদ্যও নয়, কবিতাও নয়। তবে রবীন্দ্রনাথও কবিতার প্রতি ঔদাসীন্য সৃষ্টির জন্য অংশতঃ দায়ী।

তিনি গদ্য-কবিতা লিখেছেন ব'লে নয়; তিনি শেষের দিকে এমন ভাষায় কবিতা লিখলেন যে, দেশের লোক আদৌ বুঝ্‌ল না। তাঁর শেষ বয়সের লেখা কবিতা কেউ বড় পড়ে না। কারণ, প'ড়ে বুঝতেই পারে না।

কবি—আপনারাও বুঝলেন না?

আমি—দেখ, গোড়া হ'তে রবীন্দ্রনাথের লেখা অনুসরণ ক'রে চলেছি ৫০ বছর ধ'রে—তিনি তাঁর লেখার ধারা, ভঙ্গী, টেকনিক যেমন যেমন বদলাচ্ছেন—ধাপে ধাপে সে সবও অনুসরণ ক'রে চলেছিলাম—ক্রমে আমাদেরও দুর্বোধ্য হচ্ছিল—তবু তাঁর কবি-মানসের সঙ্গে পরিচয় থাকার জন্য এবং তাঁর শিষ্যত্বের গৌরবটা বজায় রাখার জন্য রীতিমত ক্লেশ স্বীকার ক'রে তাঁর লেখা বুঝবার চেষ্টা করেছি। দুর্বোধ্য মনে হয়েছে, কিন্তু আজগুবি, এলোমেলো, উদ্‌ভট ব'লে মনে হয়নি। সাধারণ লোক ধাপে ধাপে তাঁর রচনার অনুসরণ করেনি—তারা সে-সব লেখা একেবারেই বুঝল না। ফলে, এ যুগের কবিতার উপরই তারা চটে গেল।

কবি—তবে তিনিই ত দায়ী।

আমি—তিনি অংশতঃ দায়ী তা'ত বলেছি। কিন্তু তোমরা কি কাণ্ড করছ বল ত। রবীন্দ্রনাথের রাশি রাশি সোজা সরল সরস লেখা লোকে পেয়েছে—রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের লেখাগুলো না বুঝলেও তাদের ক্ষতি কিছু হয়নি। ক্ষোভও কিছু নেই। তোমরা ছন্দোমিল সব ছেড়ে দিলে—সাধারণ পাঠকের কান ছিল ছন্দোমিলে অভ্যস্ত—তারা তা পেল না। ছন্দোমিল, হিল্লোল ইত্যাদি কানকে তৃপ্ত ক'রে প্রাণকে স্পর্শ করে। কানের দ্বারীকে তুষ্ট না করলে প্রাণের দরবারে প্রবেশ করা কঠিন। ছন্দোমিল শ্রুতিকে তৃপ্ত ক'রে স্মৃতিকে দখল করত ব'লে সেকালে সকল বিষয়ই ছন্দে লেখা হ'ত—আয়ুর্বেদ পর্য্যন্ত। এই স্মৃতিই আগেকার লেখাকে বাঁচিয়ে রাখত।

কবি—এখন ত সে কথা চলে না—এখন ত সকল লেখাই ছাপা হয়। এখন স্মৃতি নয়, পুঁথিই বাহন।

আমি—এটা ভুল। ছাপা হলেই বই ঘরে ঘরে পঞ্জিকা, টাইমটেবল কিংবা অভিধানের মত বিরাজ করে না। কোথায়, কিসে, কোন বইয়ে ছাপা আছে—তা কারই বা চোখে পড়ছে। এখনও শ্রুতি ও স্মৃতিই বাহন। যে লেখা শ্রুতিতর্পণ নয়, তা কারো মুখস্থ হয়ে যায় না, দু'চার লাইনও মনে থাকে না। কোন কবিতার চোখা চোখা

দু'চার লাইনও যদি মনে থেকে যায়—তা হ'লে, যে শোনে তার গোটা কবিতাটারই খোঁজ করতে প্রবৃত্তি হয়। এইভাবে কবিতা যেরূপ প্রচারিত হয়, কেবল ছাপা থাকলে তা হয় না। তোমরাও ত কবিতা আবৃত্তি করো সভায় সভায় এবং রেডিওতে। কিন্তু কারো মুখে ত তোমাদের লেখার ২।৪ লাইন মুখস্থ বলতে শুনি না।

কবি—নতুন ধারার রচনা ব'লে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ত উচিত।

আমি—দৃষ্টি আকর্ষণ যে করেনি তা নয়। তবে প'ড়ে তারা কিছুই বুঝতে পারে না। কি তোমরা বলতে চাও, গদ্যে তার একটা ব্যাখ্যা কবিতার নীচে দিয়ে দাও। তোমাদের ঐ সাংকেতিক ভাষা তো কেউ বোঝে না। এ ভাষার কোন ব্যাকরণ নেই, অভিধান নেই, এ ভাষায় লেখা আগে কোন প্রাথমিক স্তরের বই নেই, ইংরাজীতে অনুবাদ ক'রেও বুঝবার উপায় নেই, অথচ ইংরাজীতে ভেবেই বোধহয় মনে মনে তর্জ্জমা করেই লেখ। কি ক'রে পাঠক অর্থোদ্ধার করে বলো। সাধারণ পাঠক যৌক্তিকতা (rationality) চায়। তারা একটা নির্দিষ্ট ক্রমিকতা বা পারম্পর্য্য (sequence) চায়,—সে পরম্পরা যুক্তিমূলকই (logical) হোক, আর আবেগাত্মকই (emotional) হোক, আর আলঙ্কারিকই (rhetorical) হোক। একটা নির্দিষ্ট অনুক্রম না পেলে আগাতেই পারে না। এই শৃঙ্খলানিষ্ঠ মনোবৃত্তির সঙ্গে তাল রেখে, সামঞ্জস্য রেখে এতকাল কবিতা লেখা হয়ে আসছিল। তোমাদের লেখার অনুক্রম কি তা আমরা ধরতে পারি না। এই অনুক্রমটা বোঝাবার জন্য তোমাদের আগে বই বা প্রবন্ধ লেখা উচিত—আমাদের পক্ষে সুবোধ্য বাংলা ভাষায়। আমরা নাই বুঝলাম, তরুণ পাঠকরা যাতে বুঝে অন্ততঃ তার চেষ্টা কর। এক হাতে লেখ, অন্য হাতে মানসক্ষেত্র প্রস্তুত কর। রবীন্দ্রনাথ তাই করেছিলেন।

আমরা বুঝতে পারছি না বলেই তোমাদের লেখার কোন মূল্য নেই তা বলছি না; তোমাদের ভাব, ভাষা, ভঙ্গী আমাদের পরিচিত নয়। এসবের সঙ্গে পরিচিত হবার বয়স আর আমাদের নেই। যারা এসবের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে—তারা বুঝবে এবং আদর করবে। হতাশ হবার কি আছে? তবে তাদের চিত্তকে আকর্ষণ করবার জন্য একটা কিছু আয়োজন করতে হয়।

এতগুলি বুদ্ধিমান বিদ্বান লোক যে ভঙ্গী ও ভাষায় লিখছেন, এক কথায় তা উড়িয়ে দেওয়ার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে ভাষার সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলি—

তোমাদের ভাষার মধ্যে অনেক শক্ত সংস্কৃত শব্দ থাকে, সেগুলো আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না, অনেক নতুন শব্দ তোমরা তৈরী কর ব্যাকরণের নিয়ম না মেনে, সেগুলো কি অর্থে তোমরা ব্যবহার কর তা বুঝতে পারা যায় না—বিদেশী শব্দ অনেক থাকে, সেগুলো আমরা বুঝলেও সাধারণ পাঠকে বোঝে না। বিশেষ করে বিদেশী প্রসঙ্গ-সূত্রের (allusion reference) উল্লেখ থাকে সেগুলো পাঠক-সাধারণের অধিগম্য নয়। সংস্কৃতে একে উদ্‌ঘাত বলে। এই উদ্‌ঘাতগুলো তোমাদের পাঠকের চলার ভূমিকে উদ্‌ঘাতিনী ক'রে তোলে। পরিচিত বিষয়বস্তু নিয়েও তোমরা লেখ না। তোমাদের লেখার বিষয়বস্তু যেন আন্তর্জাতীয় (international). এরূপ আন্তর্জাতিক প্রতীক (international symbolism) বুঝবার একটা শিক্ষা বা training ত চাই।

কবি—Trainingটা ইংরাজী বর্ত্তমান (up-to-date) কবিতা পড়েই নিতে হবে।

আমি—দেখ, ইংরাজী কাব্যসাহিত্যপাঠ এদেশে দিন দিন ক'মে আসছে। আমরা সেকালে আমাদের পাঠ্যের অতিরিক্ত অজস্র ইংরাজী কবিতা পড়েছিলাম। কলেজে কলেজে ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের একটা আবহাওয়া ছিল। এ যুগে পাঠ্যের অতিরিক্ত ইংরাজী কবিতা খুব কম ছেলেই পড়ে। ধীমান ছাত্রেরা Medical line, Engineering line, B. Com, B. Sc. ইত্যাদির দিকে চ'লে যায়—B.A. খুব কম ভালো ছেলেই পড়ে। তাদের মধ্যে ইংরাজীতে Honours নেয় জন-কয়েক—

তাদের অধেকেরও কম অনার্সে পরীক্ষা দেয়। তারাও পাঠ্যাতিরিক্ত কবিতা পড়ে না। কাজেই ইংরাজী হালনাগাদ কবিতা পড়ে কবিতা বুঝবার Training ক'জন নিচ্ছে বল।

রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বছর ধ'রে সর্বজনবোধ্য কবিতা লিখে তাঁর নিজস্ব পাঠক-সংঘ তৈরী করলেন—তারপর তিনি যদি দুর্বোধ্য কবিতা কিছু লিখে থাকেন—তবে তাঁর পাঠকসংঘ ক্লেশ স্বীকার করেও তা বুঝতে চেষ্টা করে। তোমরা সহজ-বোধ্য প্রচলিত ধারার কবিতা লিখে আগে তোমাদের পাঠকসংঘ তৈরী করলে না; তোমরা প্রমাণ করলে না—তোমরাও বিবিধ ছন্দে রচনা-চাতুর্য্য দেখিয়ে কবিতা ইচ্ছা করলে লিখতে পারো। লোকে ভাবল, তোমরা প্রচলিত ধারার কবিতা লিখতে পারো না ব'লে ঐ শ্রেণীর অনায়াস-সাধ্য কবিতা লেখ—অনেকে মনে করে তোমরা ফাঁকি দিচ্ছ। তোমরাও যে অ-স্থবির রবীন্দ্রনাথের মত কবিতা অনায়াসে লিখতে পারো—তার নিদর্শন দেখালে না কেন? প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব একসময় তা করেছিল—তাই তাদের এখনো পাঠক আছে।

তারপর একটা কথা। রবীন্দ্রনাথের লেখা ক্লেশ স্বীকার ক'রে লোকে বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু তোমরা ত তাঁর সে পদবী-প্রতিষ্ঠা অর্জন করোনি, লোকে কেন ক্লেশ স্বীকার করে তা বুঝতে চেষ্টা করবে, বল। এসব কথা ভেবে দেখবে। ইংরাজী সাহিত্যের পাঠক সমস্ত পৃথিবী—কোটি কোটি লোকের মধ্যে হাজার হাজার পাঠক তারা পেতে পারে। তোমাদের বাংলা দেশটা ছোট, ইদানীং আরও অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে—এখানে ক'জনই বা কবিতা পড়ে? তাদের মধ্যে আবার ক'জন পাঠক তোমরা পাচ্ছ—এটা ভেবে দেখার দরকার।

কবি—আপনাদের কবিতারও ত পাঠক নেই—আপনাদের কবিতা ত প্রচলিত ধারায় লেখা।

আমি—আমাদের কবিতার পাঠক ছিল। এখনো প্রবীণ লোকদের মুখে আমাদের লেখার ২।৪ লাইন শুনতে পাবে।

মাথার উপর রবীন্দ্রনাথ প্রখর কিরণ বর্ষণ করলেও আমরা শুকিয়ে কাঠ হইনি। আমরা দেশে যথেষ্ট আদর পেয়েছিলাম। তোমরা কবিতা জিনিসটাকেই বর্জ্জনীয় ক'রে তুল্লে—তোমাদের দলই ত পুরু। সেই সঙ্গে আমরাও গেলাম! আমরাও আজ বর্জ্জনীয় হয়েছি। কবিতার প্রতিই দেশের লোকের বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছে। তোমরা তরুণ নিজেদের মধ্যেই মেশামিশি কর। তোমরা বলতে পারো, তারা বোঝে কিনা! আমার সঙ্গে বহু ধীমান তরুণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—কারণ, তারা আমার প্রাক্তন ছাত্র। তারা তোমাদের লেখা বোঝে না ব'লে পড়ে না—অবশ্য আমাদের লেখা বুঝলেও পড়ে না। তবে আমাদের লেখা সম্বন্ধে তাদের যা হোক একটা মোটামুটি ধারণা আছে।

আমাদের লেখারও পাঠক নেই স্বীকার করি—তবু প্রত্যেককেই আমাদের লেখা পড়তে হয়েছে বাধ্য হয়ে। কারণ, সকল বাংলা Text bookএই আমাদের লেখা থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলনেও আমাদের লেখা আছে। স্কুলকলেজে যে কবিতাগুলো পড়ে—সেইগুলোতেই কবিতা পড়া শেষ। ছাত্রজীবনে পড়া অনেকেরত কবিতাগুলো তাদের মনে থাকে—কবিকেও মনে থাকে। তোমাদের লেখা স্কুলকলেজের পাঠ্যপুস্তকে ক্রমে উঠবে, আমাদের লেখাগুলোকে অপসারিত ক'রে। শিক্ষকেরা তখন ঐ সব কবিতা নিজেরা চেষ্টা ক'রে বুঝবে। তবে মনে রেখ ছাত্র চিরদিন ছাত্রই—ছাত্রদের উপযোগী লেখা ত তোমরা লেখ না! এখনো তোমরা পূর্ব্ববর্ত্তী আমাদের কথা যেমন ভাবনি, তেমনি পরবর্ত্তী ছাত্রদের কথাও ভাব নি।

—এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখি—অনাদিরসের কবিতাও উৎকৃষ্ট কবিতা হ'তে পারে এবং উৎকৃষ্ট কবিতাও ছাত্রপাঠ্য হ'তে পারে। Shelley, Keats, Wordsworth, Tenny Scott, Byron ও রবীন্দ্রনাথের বহু উৎকৃষ্ট, কবিতাই ছাত্রপাঠ্য। অবশ্য এঁদের তোমরা বড় কবি ব'লে মনে কর কিনা জানি না।

(শেষাংশ ১৬৮ পৃষ্ঠায়)

(গল্প)

শ্রান্ত নিঃসঙ্গ দুপুর সেলাই করে কাটিয়ে দিতে চায় নীলিমা। ঘুম আসে না চোখে। সংসারের শত কাজ, শত দাবী মিটিয়ে নিজের ঘরে আসতে তার বাজে একটা। সংসারটী ছোট হলেও কাজ তার অনেক, কারণ একলা হাতেই প্রায় সব কাজ করে নিতে হয় আজকাল। ঝি চাকর প্রায়ই রাখে না। অজয়ের চিকিৎসায় অনেক খরচ হয়ে গেছে এই ছ' মাসে। তার ওপর এখন থেকে সুরু হবে বিনা মাইনের ছুটী। নিজের শিরা-বহুল হাত দুটোর দিকে তাকায়। কি বিশ্রী হলুদের ছোপ; সোডা আর সাবান কাচা খসখসে হাত। হাতে খালি লোহা আর দু গাছি করে শাঁখা। অভাবের জন্য বিক্রী হয়ে যায় নি, ইচ্ছে করেই নীলিমা খুলে রেখেছে সোনার চুড়ীগুলো। ক্ষার কাচা বাটনা বাটা হাতে সোনার চুড়ীর বিড়ম্বনা করে লাভ কি? লাভের মধ্যে ত সোনা ক্ষয়ে যাওয়া; তাই সেগুলো খুলে রেখেছে।

আজ দু'দিন হল অজয় কলকাতায় তার মামার বাড়ী গিয়ে উঠেছে। মামার কড়া চিঠি এসেছিল, ছেলেখেলা নাকি! ছ'মাস ধরে পাড়াগাঁয়ে বসে চিকিৎসার প্রহসন করছো! সকালে বিকালে ৯৯°।১০০° করে জ্বর উঠ্‌ছে, রোজ সর্দ্দি, কাসি। সপ্তাহে সপ্তাহে ওজন কমে একমণ পঁচিশ সের থেকে একমণ পনের সেরে দাঁড়িয়েছে। তিনটী ছেলেমেয়ের বাপ, বিধবা মা, দায়িত্ববোধ একেবারে নেই!

জায়গাটা ঠিক পাড়া গাঁ নয়। মফঃস্বল সহর। কিন্তু মামার কাছে ঐ একই কথা। কলকাতার অভিজাত পল্লীতে প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তিনি।

ভাল লাগেনা পাড়ার মহিলা সমিতি, ভাল লাগে না কোন উৎসব, ভাল লাগেনা পাড়ার সরল কিশোরদের। যুবকরা যারা দিনরাত পিছনে পিছনে বেড়াত বৌদি, বৌদি করে, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মীয়তা হয়ে গেছে জোলো, পান্‌সে। ওষুধ আর অজয় এই নিয়ে কাটে ওর দিন। নানান রকমের ওষুধ আর নানান রকমের পথ্যের ব্যবস্থা—এর মধ্যে ডুবিয়ে দেয় ও নিজেকে, নিজের ভবিষ্যৎকে। শাশুড়ী সুহাসিনী দেবী কোনমতে দুটি সিদ্ধ করে নেন সকলের জন্য।

ক্লান্ত নিঃসঙ্গ কাক ডাকা দুপুরে মনে পড়ছে নীলিমার এই ছ'মাস আগেকার জীবন। ছ'বছর, কিম্বা কত বছর কে জানে, দূরে সরে গেছে সে জীবন। মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে তুহিন শীতল বরফের পাহাড়। গলার অপেক্ষায় বুঝি বা চিরকাল কাটিয়ে দেবে সে অচল অনড় হয়ে। এমনি বোধহয় নীলিমার ভবিতব্য।

অজয় কলকাতা গেছে। এর আগেও কতবার গেছে। সেটা ছিল মধুর স্মৃতি। কলকাতা ফেরৎ অজয়ের স্যুটকেশ তখন ছিল তাদের কাছে আনন্দের খনি। লজেন্স, বিস্কুট, ছোটদের রঙীন চেনটানা গেঞ্জী, সুন্দর ক্লিপ আর সবশেষে অজয়ের সাধ্যের প্রায় অতীত দামের একটী করে সুন্দর শাড়ী। আর এবার? শিউরে ওঠে নীলিমা। মামা লিখেছিলেন বুকের এক্সরে ফটো নিতে হবে, কিনে আনতে হবে দামী দামী বিলাতী ওষুধ।

বেলা গড়িয়ে এল। ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে ফেরা দেখার জন্য নীলিমা হাতের সেলাই রেখে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

এর আগে ও কোনদিন দেখেনি, দেখবার সময়ও পাইনি কোলের ছেলে বুনু কেমন করে পাঠশালা থেকে ফেরে, কেমন করে আসে মিঠু আর রাণু। কাঁধ থেকে ব্যাগ ঝুলিয়ে ঐ আসছে তারা। ওরা জানেনা অজয় কেন কলকাতা গেছে। বড় ছেলে মিঠু যদি ছেলে না হয়ে মেয়ে হত, তবে টের পেয়ে যেত তাদের বাবার এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা। জীবনের মাঝপথে ওদের বাবা যে সর্ত্তভঙ্গের যোগাড় করতে উদ্যত হয়েছে বেচারারা সে খবর পায়নি। ওরা এসে ঘণ্টাখানেকের জন্য নীলিমাকে ভুলিয়ে বর্ত্তমানকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে অতীতে, না হয় উজ্জ্বল ভবিষ্যতে।

কিন্তু তার পরে আবার নিঃসঙ্গতা, অশান্তি আর নিষ্ঠুর বর্ত্তমান!

দেখ্‌তে দেখতে কেটে গেল দিন চার পাঁচ। নীলিমার দুপুর আর শ্রান্ত নয়; তবে শ্রমহীন পরিশ্রমের ক্লান্তিতে দীর্ঘতর। শুধু সেলাই করে কাটিয়ে দেওয়া যায় না। দুপুর না গড়াতেই আবার ইচ্ছা করে গিয়ে ঢোকে রান্নাঘরে। রান্নাই আরম্ভ করে দেয় নীলিমা। তবু ত একটা কাজ! এই শ্রমহীন ক্লান্তি দূর করার উপায়! কিছুদিন আগে এই রান্নার কথা উঠলে নীলিমা বল্‌তো, বাবা আর সব কাজ ভাল কেবল ঐ রান্নাটা ছাড়া। উনুনে কড়া চাপিয়ে বসেই থাক, ঝোল আর ফোটে না, যদি বা ফুটলো, ঝ'লই শুকাতে চায় না। বাবা রে ওর চেয়ে সারা বাড়ী ঝাট দেওয়া, গাদা গাদা বাসন মাজা, বালতি খানেক কাপড় কাচা ও ভাল, সে কাজে বৈচিত্র্য আছে! এ হল ছ' মাস আগেকার চপলা মুখরা নীলিমার কথা। আজকের নীলিমার কথা স্বতন্ত্র।

রান্না হয়ে গেল। আবার নির্জ্জন বিকাল, নির্জ্জন সন্ধ্যা। সন্ধ্যা হতে না হতেই ছেলেমেয়েরা তাদের সামান্য দু'চারখানি বইএর পড়া শেষ করে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। শাশুড়ীর হাতে নিদ্রায় জাগরণে জপের মালা ঘোরে পৃথিবীর আবর্ত্তনের মত পুরাণো অভ্যাসে।

গিয়ে পর্য্যন্ত অজয় একটী পত্রও দেয়নি, পৌঁছ সংবাদও নয়। ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। নীলিমা ভারী উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। প্রকাশ করতে পারছে না বলে আরও খারাপ লাগ্‌ছে। বিধবা শাশুড়ীকে সে আর এ উদ্বেগের ভাগ দিয়ে ভারাক্রান্ত করতে মন চাইছিল না। তাই কাল সকালে রন্ধনরতা শাশুড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের অল্প আলোয় একটা বাক্সে পুরাণো পোষ্ট কার্ড নিয়ে নীলিমা পড়েছে, এখানে এসে একটু সুস্থবোধ করছি, ডাক্তার দেখিয়েছি। বুক পরীক্ষা করে কি ফলাফল হয় জেনে শীঘ্র যাব। তোমরা সাবধানে থেকো, আমার জন্য ব্যস্ত হোয়োনা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

—ও মা, ফ্যানের গামলায় পোষ্টকার্ড খানা পড়ে গেল, সব লেখা মুছে একাকার হয়ে গেল, ব্যস্ত হয়ে নীলিমা ফ্যানের গামলার মধ্যে হাত ডোবায়।

নীলিমার দুশ্চিন্তা নীলিমার মনের মধ্যেই থাক্! কে বুঝবে ওর অন্তরের কথা! ছেলেমেয়েরা এখনও অবুঝ শিশু, অনুভূতির গাঢ়তা আসেনি ওদের স্বভাবে। শাশুড়ীও বুঝবেন না আজ স্বামী হারাণোর দুঃখ। বড়জোর পুত্রশোক অনুভব করার ক্ষমতা আছে তাঁর প্রাচীন মনে।

বাপের বাড়ীর দিক থেকে একটী একটী শোক এসেছে, বাবা, ভাই, ছোট্ট ভাই পো—অজয়ের সুস্নিগ্ধ সান্ত্বনা আর সস্নেহ করস্পর্শে দুঃখ পাওয়া তার সার্থক হয়ে উঠেছে। সেই অজয় আজ তাকে দুঃখ দেওয়ার ষড়যন্ত্র সুরু করেছে। নিজেকে হাজার অপরাধে অপরাধী মনে করে ম্লান মুখে বিদায় নিয়েছে সে পাঁচদিন আগে। চিঠি না দেওয়ার এই অস্বাভাবিকতা তাই নীলিমার কাছে মনে হয় হয় ত তারই ভুল, হয়ত রোজই সে পাচ্ছে একটী করে চিঠি। কি ভেবে নীলিমা নিজের হাত বাক্সটা খুলে বসলো। কত আজে বাজে কাগজ, কতটুকি টাকি জিনিষ। হঠাৎ বাক্সের পিছনে গোঁজা একটী খামের দিকে নজর পড়লো। অজয়ের ঠিকুজী। নীলিমা একবার জোর করে তৈরী করিয়েছিল এই ঠিকুজী। গণক ঠাকুর বলেছিলেন সত্তর বছর পরমায়ু আছে তার। মনে পড়ছে সে রাত্রের কথা। উজ্জ্বল আনন্দে নীলিমা অজয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, মনে থাকবে ত, সত্তর বছর; সর্ত্ত ভঙ্গ করে পালানো চলবে না,

আমি ঘড়ি ধরে ঘণ্টা মিনিটের হিসেব নেব। হেসে উত্তর দিয়েছিল অজয়, নীলিমার ওপর একচাল চেলে—তাহলে তুমি বিধবা হতে রাজী আছ?

পরদিন দুপুরে সব রান্না শেষ করে বিকালে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে দাইয়ে বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়ে বেরোল নীলিমা পাড়ার একটা পরিচিত বাড়ীর উদ্দেশ্যে। ভাল শাড়ীই একটা পরলো, খুলে রাখা চুড়ীগুলো ওঠালো হাতে। এমন অসহায় নিরাভরণ বেশে অপরের সামনে দাঁড়াতে তার বাধবে, না হলে এই কি লজ্জা করার সময়!

ধীরে ধীরে মেঘ কেটে গেল মনের, প্রতিবেশীদের সস্নেহ ব্যবহারে। নীলিমা সকলের কাছেই ছিল আনন্দের প্রতিমূর্ত্তির মত। অনেকদিন পরে তাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে এ বাড়ীর মেয়ে বীণা, বউ সুরমা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। পাড়ায় ত সকলেই জানে নীলিমার বিপর্য্যয়ের কথা, সকলেরই আছে সহানুভূতি।

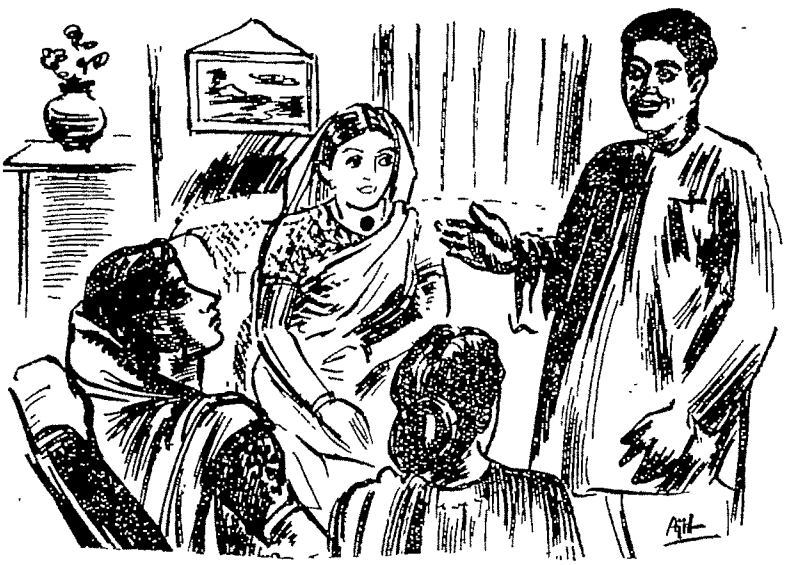

একি বৌদি, এখনও এখানে যে!

বীণা বল্ল, ও মা, বৌদি, এর মধ্যে কাজ সেরে নিয়েছেন। কি কাজের মেয়ে আপনি! এতদিন আমরা ভাবতাম বৌদি বুঝি খালি সভা সমিতি করে বেড়াতেই পারেন!

সুরমা বল্ল, কি সুন্দর লেস বুনেছেন দেখলাম রাণুর জামায়। নাঃ ভাই, আপনার মত সব কাজেই যোগ্যতা আমার নেই!

কথাগুলির মধ্যে যে কিছুটা অতিরঞ্জিত আছে নীলিমা সেটা বোঝে। তবু উপভোগ করে বহু দুঃখের সম্ভাবনায় কেনা এই যৎকিঞ্চিৎ সহানুভূতিটুকু।

সবাই যথাসাধ্য স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে। নানা রকম গল্পের অবতারণা করে সুকৌশলে। কার কবে একটী বছর ধরে সর্দ্দি, কাসি, জ্বর কিছুতেই সারে না, শেষে দেখা গেল ক্রনিক ফেরিণজাইটিস, অটোভ্যাক্সিন করে সারে, আবার কারুর দেখা গেল নাকের মধ্যে অতিরিক্ত মাংসের থলি হয়েছে, অপারেশন করে সারলো।

হাসি, গল্প, উলের ডিজাইন আর কার্পেটের ফুলে তলিয়ে গেল জীবনের বড় বড় সমস্যা।

হঠাৎ এ সভায় ঢুকলো লম্বা ফর্সা মত একটী বাইশ তেইশ বছরের যুবক, কলকাতার এম-এ ক্লাশের ছাত্র, শনি রবিবারে দেশে আসে মাঝে মাঝে। এ কি, বৌদি—এখনও এখানে যে, দেখুন, দেখুন, অজয়দার দূত এসে গেছে হয়ত দরজায়।

চমকে ওঠে নীলিমা, তবু যথাসাধ্য স্বাভাবিক ভাবে বলে, বড্ড ফাজিল হয়েছ তুমি রণেন, এসে ছোট ছেলেটী দেখেছি তোমায়।

তৎপরতার সঙ্গে উত্তর দেয় রণেন, তাতে কি, আমিও ত সেই ছোট মেয়েটী থেকে দেখছি আপনাকে। তাইতো আগাগোড়া জানি আপনাদের কথা। লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে নীলিমা।

—যাক্‌গে সোজা কথায় ব্যাপারটা বল, নীলিমা জিজ্ঞাসা করলো।

—ব্যাপার দেখলাম এই যে, মিনিট কুড়িক আগে অজয়দা এই পথ দিয়ে রিক্সা করে ষ্টেশন থেকে ফিরছেন। দেখুন গিয়ে আপনার ওপর কি রকম চটে মটে লাল হয়ে আছেন।

শোভন সীমার মধ্যে যতদূর সম্ভব ব্যস্ত হয়ে অথবা অশোভন ভাবে ব্যস্ত না হয়ে নীলিমা উঠে পড়লো। এমন পরিস্থিতিতে জরুরী তলব নিয়ে দূত এসেছে যখন তখনকার কথা আলাদা। আজ কেউই আসেনি। জোরে পা চালিয়ে দিল নীলিমা।

সন্ধ্যা হয় হয়। সূর্য্যের আলো ম্লান হয়ে এসেছে অথচ সন্ধ্যার বাতি ঘরকে আলোকিত করতে পারছে না, এমন কি সেই অন্ধকারকে উজ্জ্বল করতেও পারছে না এমনি চাপা আর বেদনার্ত্ত অন্ধকার জমা হয়েছে ঘরের মধ্যে।

খাটের উপর ক্লান্ত দেহ এলিয়ে শুয়ে পড়েছে অজয়, চোখ দুটী প্রায় বোজা। মা পাশেই দাঁড়িয়ে; গরম না থাকলেও একটী পাখা সামান্য নেড়ে ক্লান্ত পুত্রের প্রতি যত্নের বহিঃপ্রকাশ দেখাচ্ছেন। দু'জনেই নির্ব্বাক। নীলিমাও তাই; ভীতত্রস্ত মুখে বসে আছে পাশের একটা চেয়ারে। ছেলেমেয়েরা এখনও ফেরেনি কেন কে জানে। এই বোবা পরিবেশে যেন ইচ্ছে করেই তারা প্রবেশ করেনি। কিম্বা হয়ত আছে কোথায় আশে পাশে নিঃসাড়ে। নীলিমার সামনে অজয়ের পড়ার টেবিলের ওপর রয়েছে দুটী বস্তু, কলকাতা ফেরৎ স্যুটকেশটা খোলা পড়ে আছে শূন্য গহ্বরে। নেই লজেন্স, নেই বিস্কুট, নেই সুন্দর গেঞ্জী। শুধু দুটী বস্তু রয়েছে টেবিলের ওপর। নীলিমা জানে ও দুটী কি। পাৎলা কাগজে মোড়া একটী এন্লরে ফটো, আর একটী···আর একটী কলেজ ষ্ট্রীটের অভিজাত দোকানের শাড়ীর বাক্স। পরিহাস নাকি! এমনভাবে দুটো জিনিষ পাশাপাশি রাখা। অজয় কি আজ ওকে পরিহাস করতে চায়!

মা দাঁড়িয়ে আছেন নীলিমা আর অজয়ের মধ্যে। অসুস্থ পুত্রের গৃহাগমনের সময় বধূর অনুপস্থিতি তাঁর কাছে ভাল লাগেনি। তাঁর ধারণা কালকের পত্রেই ছিল এর আভাষ। কিন্তু অজয়ও কি আজ এমনি করে তাকে সংশয়ে বিঁধিয়ে রাখতে চায়!

কয়টা মুহূর্ত্তই বা, তবু অসহ্য লাগছে নীলিমার এই নীরবতা। হঠাৎ বাড়ী চলে এল কেন অজয়? গিয়ে পর্য্যন্ত পত্রই বা দেয়নি কেন? চিঠি দেওয়ার কি মুখ ছিল না ওর? না, কি ডাক্তার দেখান হয়নি এবার।

কিম্বা হয়ত ডাক্তার দেখে বলেছে—এই মুহূর্ত্তে ভর্ত্তি হতে হবে যাদবপুর হাঁসপাতালে তাই বাড়ীর ব্যবস্থা ও টাকার ব্যবস্থা করার জন্য পরের ট্রেণেই বাড়ী চলে এসেছে! না, কি, কিছুই হয়নি অজয়ের!

সামান্য একটু উদ্যম, সামান্য একটু চেষ্টা। হাত বাড়িয়ে ঐ ছবিটা দেখলেই ত হয় ডাক্তারের মন্তব্য।

হাত বাড়াল নীলিমা ফটোটার দিকে। কিন্তু পাশেই রয়েছে শাড়ীর প্যাকেট; ওটা আগে দেখবে, না ফটোটা? ফটোটা দেখা হলে আর কোন মুখে সে শাড়ীর বাক্সটা খুলবে? ফটো, মানে, সব শেষ! মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি, ডিক্রী জারী, উচ্ছেদের নোটিস্। কোথায় থাকবে তখন শাড়ী। ছবিটা দেখার পর আর যার মূল্য থাকবে না সেটা আগেই দেখা যাক্।

শাড়ীর বাক্স পর্য্যন্ত গিয়ে ফের হাত টেনে নিল নীলিমা। ছিঃ ছিঃ, এত লোভী ওর মন। হাত বাড়াল ফটোটার দিকে। হাত কাঁপছে, বিবর্ণ হয়ে এসেছে ওর মুখ।

ততক্ষণে বাইরে অন্ধকার আর একটু গাঢ় হয়েছে। ঘরের আলোটাও তাই হয়েছে আর একটু উজ্জ্বল। অজয় চোখ খুলে ততক্ষণ দেখতে সুরু করেছে নীলিমাকে। বেশ খানিকটা জব্দ ত হয়েছে নীলিমা।

সংযত হল নীলিমা, ছবি যে উচ্ছেদের নোটিশ হবে তার মানে কি? হয়ত ওটা দলিল কায়েমী স্বত্বের, মৌরসী মকরারী স্বত্ব! নইলে আনে কেউ এখন শাড়ী। ঠিক আছে, শাড়ীটাই দেখবে আগে।

প্যাকেটের উপর হাত বুলিয়েই নিরস্ত হল নীলিমা।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিক্ষকের চিন্তা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

শক্তি যেটুকু, ব্যয় যে করছি—
নিজের স্বার্থ নিয়া।
স্বেচ্ছায় মোরা করিতেছি দীন
আপনাকে দেউলিয়া।
আদর্শ হতে হইয়াছি বিচ্যুত,
সে কৃচ্ছ্র তপ আজিকে মোদের কুতঃ ?
অবাধ্যতায় তাই বিবেকের
বিদ্ধন পায় হিয়া।

২

যোগ্যতার কি কথা কভু ভাবি ?
অতৃপ্ত চিত্ত—
স্মরণ করি কি ? বরণ করি কি ?
নিজের দায়িত্ব ?
পথভ্রান্ত ভ্রাতার ধরিয়া হাত—
রক্ষা কি করি হইতে অধঃপাত ?
ছাত্রগণের হিত-চিন্তা কি
করি আর নিত্য ?

৩

আভিজাত্য যে বিপুল মোদের,
না থাকুক ধন জন,
আমরা দেশের কল্যাণকৃৎ
নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ।
ত্যাগের পথ তো আগেই দিয়াছি ছাড়ি,
সাধারণ সাথে বাঁধিয়াছি এক সারি।
ডাকৃছি দেশের অভিশাপ-আর
নিজের বিড়ম্বন।

৪

আচার্য্যত্ব করা যায় না কো
কলুষিত মন লয়ে।
আমাদিগকে সদা থাকিতে হইবে
দেহে মনে শুচি হয়ে।
ভকতি শ্রদ্ধা করিতে আকর্ষণ,
চাই ত্যাগ, চাই নিষ্ঠা সে পুরাতন,
তবে জনগণ ভয়ে যশ মান.
দুয়ারে আনিবে বয়ে।

(১৬১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অজয়ের স্বভাব ত জানে। হয়ত জন্মের মত নীলিমার শাড়ী পরা তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করেছে নিয়তি। তাই শেষ উপহারের মত এনেছে অজয় এই শাড়ীটা।

না, চুপ। হাত দুটী গুটীয়ে চুপ করে বসে রইলো স্তম্ভিতের মত, অপ্রস্তুতের মত।

হঠাৎ অজয়ের কণ্ঠস্বরে তার সম্বিৎ ফিরে এল। মা কখন পাখা রেখে চলে গেছেন। 'ক' মুহূর্ত্ত তা জানে ঘড়ি,' কিন্তু নীলিমা জানে প্রায় এক যুগ।

হেমন্তের ঝিঁ ঝিঁ ডাকা করুণ হিমেল সন্ধ্যার মাঝে ফুটে উঠ্‌লো দীপ্তি, ফুটে উঠলো স্নিগ্ধ তাপ; ফুটে উঠ্‌লো দুর্লভ আশ্বাস—

—খোল, খোল, ও দু'টোই খুলে দেখ। ভাল আছি আমি।

শিলায়ন

ধীরানন্দ ঠাকুর

এখন আমার এমনি করেই দিন কাটে :
কখন্ যে রাত পোহায়, তপন যায় পাটে,
আকাশ-গাঙে কখন্ আলোর পাল তুলে
তারার ডিঙিগুলো ভাসে বাঁধ খুলে,
কী সুরভি ছড়ায় যখন ফুল ফোটে,
গাছের আড়াল হতে কখন চাঁদ ওঠে,
কতই সুরে পাখীরা গায় ঝোপে ঝাড়ে,
কী কলতান বাজে নদীর পাড়ে পাড়ে—
কিছুই ধরা দেয় না মনে হাসিমুখে,
আপন মনে থাকি আমি মনের সুখে ॥

ভর্-বোশেখে তপ্ত হাওয়ার ঘাঘ্‌রা পরে
ধুলোর ওড়না জড়িয়ে গায়ে নৃত্য করে—
কালবোশেখী বন-মাদলের তালে তালে,
মাতন লাগে জলে স্থলে সাঁঝ বিকালে।
বর্ষা আসে মিছিল করে আকাশপথে
বিজয় নিশান উড়িয়ে কালো মেঘের রথে,
বাজে বিষাণ, দুন্দুভি আর জয়-ভেরী,
ছড়ায় শান্তি-বারি শান্তিপর্বেরই :
এ সব ছবি দাগ কাটে না আমার মনে,
এদের যেন দেখেছি সেই কোন্ স্বপনে ॥

কখন্ জাগে নীল গগনের সাগরবুকে
শাদা মেঘের দ্বীপগুলো যে কি কৌতুকে,
কোন্ খুশিতে শালিখ শ্যামা কাশের শাখে
লীলায় দোলে মন-সজনীর ভাবের ডাকে,
কিসের টানে কাহার পানে দেয় সঁপিয়া
ফুটে ঝরে শিউলি, চাঁপা, চামেলিয়া,
সবুজ সোনাল ধানের শীষে মঞ্জরী
তৃপ্তিসুধা দেয় যে কেন সঞ্চারি
বুঝতে নারি এমন কথা এই আমি,
এমনি করেই কাটে আমার দিনযামী ॥

শীতের বেলা কুজ্‌ঝটিকা জাল বোনে
দূর আকাশে, মাঠে বাটে, বনে বনে,
কিসের তার হিমেল হাওয়ায় শোক বাজে
ঝরা পাতার বিলাপ যে ছাই কোন্ কাজে ;
আবার কেন চাপা হাসির আভায় ভরা
শিউরে ওঠে কম্প্র-তনু বসুন্ধরা,
রূপে-রসে-গন্ধে-গানে পাগল হিয়া
কেনই ডাকে কোন্ খেয়ালে পিক-পাপিয়া,—
অর্থ কিছুই পাইনা খুঁজে মনের মাঝে,
সময় তবু কাটে আমার সকাল সাঁঝে ॥

জীবনধারা যায় যে বয়ে চার পাশে
প্রাণের পরশ পাইনা তবু থির আশে,
কভু যে মন-পরাণ ছিল দেহে আমার
হয়না মনে ঘুণাক্ষরে একটিও বার।
রূপের মিছিল ধরার পথে নিত্য চলে,
স্বপ্ন না হয় স্মৃতির পটে ছবির দলে—
তারা যেন মিলায় আমার সীমার পারে ;
বিদেশী কোন্ পথিক আমি ধারে ধারে
উদাস মনে ঘুরে বেড়াই পথে ঘাটে,—
এমনি করেই এখন আমার সময় কাটে ॥

এই পৃথিবীর নানা প্রাণের ফুলবাগিচায়
আমি পাষাণমূর্তি যেন দাঁড়িয়ে ঠায়
দেখি কুসুম অলির লীলা কতোই ছাঁদের,
বাদাবাদি, সাধাসাধি কতোই সাধের,
আমার শুধু চোখে দেখা, চেয়ে-থাকা—
অপলকে, ভাবনাহীন সত্তা রাখা ;
বুঝতে নারি আছি বেঁচে কিংবা মরে,
পায়ের তলায় জীবন-বালি যায় কি সরে ?
আছে সবই, কিছুই তবু নয় আমার,
আছি, তবু কেউ তো কাছে টানে না আর ॥

শিক্ষক জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। শিক্ষকের অবনতি জাতীয় জীবনের ধ্বংসের পূর্ব্বাভাষ। সুতরাং তাঁহাকে যোগ্য মর্যাদা দান কর।

সোমনাথ

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

গরজি উঠিল গজনী সৈন্য
জয়, মামুদের জয়!
পঞ্চ হাজার ব্রাহ্মণ হাঁকে
নয়, নয়, কভু নয়।
করি না স্বীকার ক্রূর সুলতানে,
ভরি নাক তরবারি,
জানি দন্তীম দিতে উত্তর
পুরুষ, নহি ত নারী!
অবরোধ করি মন্দির দ্বার
এই ত দাঁড়ানু সবে,
দেবের সেবায় না হয় জীবন
বলিদান দিতে হবে।
সুলতান হয়ে দস্যুবৃত্তি
শুনি নাই হেন কভু!
তস্কর সম যার গতি বিধি
বীর হইল সে তবু!
ফুকারি শঙ্খ ব্রাহ্মণ দল
দাঁড়াল ত্রিশূল হাতে,
রণ-দুন্দুভি বাজিল আবার
রক্ত-রঙীন রাতে।
তার পর যাহা সে শুধু কেবল
ধ্বংসের ইতিহাস,
কলঙ্ক কালি লেপা হয়ে আছে
দীর্ঘ বরষ মাস।
অতি মানবের আসন পেয়েছে
মামুদ দেশের কাছে;
সোমনাথ ভাঙি লুণ্ঠনকারী
অমর হইয়া বাঁচে!
মিথ্যা, মিথ্যা, সকলি মিথ্যা
মিথ্যা সে অভিযান।
মানুষ পারে কি কভু মুছে দিতে
দেবতার সম্মান?
ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টির লীলা
তাই যুগে যুগে চলে,
শিব ও সত্য, লয় পায় কি রে
অন্ধ আসুরী বলে?
"পরম দেও" এর বাহিনী আসিছে
মামুদ পলায় ছুটে,
পিছু না ফিরিতে ভগ্ন-পাষাণে
নব মন্দির উঠে।
কতবার কত মূঢ় বিধর্মী
ভাঙে মন্দির রোষে,
নব-মন্দির হেরিয়া তারাই
মরিয়াছে আপশোষে।
সাগর বেলায় প্রভাস তীর্থে
সোমনাথ মন্দির,
সোমের স্থাপিত বিগ্রহ এ যে
দীর্ঘ শতাব্দীর।
ত্রেতায় রাবণ গড়েছে ইহারে
শুভ্র রজত আনি,
দ্বাপরে কৃষ্ণ দারুময় করে
রচে মন্দির খানি।
রূপ কথা এক বলে কেহ কেহ—
কাবা মন্দির মাঝে
মনাৎ মূর্ত্তি শোভা পেত কবে
মক্কাতে নব সাজে।
ইসলাম যবে হইল প্রচার
মনাৎ-এর ভক্তেরা,
সৌরাষ্ট্রের উপকূলে এসে
বাঁধিল তাদের ডেরা।
তাহাদের আনা মনাৎ মূর্ত্তি
"সো-মনাৎ" নামে খ্যাত।
কালক্রমেতে সোমনাথ রূপে
হ'ল তাই প্রতিভাত!
হউক যাহাই সত্য, মিথ্যা,
শাশ্বত সোমনাথ।
প্রতিষ্ঠা এঁর যুগ যুগ ধরি
চির সত্যের সাথ!

প্রশ্ন

মানবেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক :
যুগে যুগে পৃথিবীতে বিদ্রোহের অগ্নিবর্ণ রূপকথা
মরিয়া যৌবন রচে, রচে।
কিন্তু, এই দুর্ভিক্ষের দেশে, হায়,
এখানে যৌবন ক্রমাগত ক্রন্দনের গুঞ্জরণ তোলে।
তীব্র বেগে ছুটে চলা যৌবনের খরস্রোতা প্রাণ-বন্যা
প্রস্তর-শৃংখলে বাঁধা। প্রতিহত যুব-বন্যা ক্রন্দনের
ঢেউ তোলে তাই। জরাজীর্ণ বৃদ্ধদের চলে চিরকেলে
ষড়যন্ত্র : প্রস্তরের বাঁধ দিয়ে প্রাণ-বন্যা প্রতিহত
করার প্রচেষ্টা। যৌবনের বীর্য্যবান দেহে জরাজীর্ণ
বৃদ্ধদের রূঢ়, ক্রুর কুটীল আঘাত।
হায় এই দেশ!
এখানে বার বার রুদ্ধ-ছুট যৌবনের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস
বায়ুর প্রবাহ তোলে ভারি ক'রে। প্রাণের বন্যার বেগ
পাথরের বাঁধে প্রতিহত হয়ে এসে নিষ্ফল আক্রোশে
বারংবার মুষড়িয়া পড়ে।
কিন্তু, কেউ কখনো শুনেছে
প্রস্তরের বাঁধ দিয়ে তীব্র বন্যা আট্‌কিয়ে রাখা গেছে?

দুই :
আরো একদিন! আরো বহুদিন! আরো দিন, আরো,
কাটে প্রতীক্ষায়, অতলান্ত প্রতীক্ষায়, দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।
তবে, এই ক'রে শুধু কি খামোকা ব'সে ব'সে প্রতীক্ষাতে
দিন, আরো দিন, চলবো কাটিয়ে? সে তো বহু, কতো
দিন দেখেছি শুধুই আফিমের ঘোর-লাগা চোখ মেলে
জীবনের সুবিশাল রাজ্যপাটে আধিপত্য কালো মরণের।
দেখেছি ঘুমেল চোখে ফসলের মাঠে, বহু মাঠে ঝাঁক বেঁধে
ধেয়ে-আসা কালো বুলবুলির আসা-যাওয়া, ধান খোঁটা,
ধান খাওয়া, ধান শেষ করা। দেখেছি প্রচুর বর্গীরা এসেছে
ধেয়ে ফেনা-নীল অশ্বে চেপে তীব্র—তীক্ষ্ণ বেগে ওই—
বুলবুলির ঝাঁকের পেছনে। দেখেছি, দেখেছি, আর শুধু
ঘুমিয়েছি কাল ঘুমে, কাল ঘুমে, আর শুধু বুনে গেছি
স্বপনের মায়াজাল, ক'রে গেছি স্বপনের তন্তুর সীবন।
কিন্তু, বলো, আর কতো দিন যাবে প্রতীক্ষায়—বলো?
আর কতো দিন বাকী বর্গী-বুলবুলির সাথে সংগ্রামের?
না, কি শুধু দেখে যাবো চোখ মেলে, বৃথা প্রতীক্ষায়,
মৃত্যুর আঘাত জীবনেব আর সৃজনের মহা পাদপীঠে??

—

শিক্ষক

শ্রীঅনিলকুমার রায়

ইতিহাস খুলি'। পৃথিবীটা ঘোরে। মৃতপ্রায় হে জীবন
বড় নিষ্ঠুর নির্মম তুমি—তোমার এ আয়োজন।
বহুদিন আগে বেশ মনে পড়ে—আমাদেরি এই দেশে
দিশি দিশি ভেদি' শিক্ষাব্রতী নিমেষে মিলেছে এসে।
দ্বন্দ্ব-ঈর্ষ্যা কোন ভেদাভেদ সেদিন জাগেনি মনে
হাতে হাত দিয়ে সবাই মিলেছে গুরুগৃহ অঙ্গনে।
বিদায়ের ক্ষণে ব্যাকুল ব্যথায় চোখ ভরে যেত জলে
বছরে বছরে বিদায় লভিত শিষ্যেরা দলে দলে।
বিনয়, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা জ্ঞান, মনের শুচিতা লয়ে
গৃহধর্ম্মের জীবনে ফিরিত প্রকৃত মনুষ্য হয়ে।
হে ভারত মহামিলনতীর্থ, ইতিহাস ভুলিবেনা
তোমার আতিথ্য কথা, তব উদারতা দেনা।
সকল ধর্ম্ম সব সাধনার সু-আরাধনার জয়
তন্ত্রে-মন্ত্রে সকল ধর্ম্ম করেছ সমন্বয়।
এই মাটিতেই নালন্দা আর শীলভদ্রের নাম
একলব্যের গুরুভক্তির পরিচয় জানলাম।
তারপর এলো জীবনে কালবৈশাখী ঝড়
এলো মহামারী চৌদিক ছেয়ে মহামন্বন্তর।
শিক্ষার নামে কুশিক্ষাঘাতে বিদ্যার বেদীমূল
কলুষিত হল অন্যায়ে পাপে আশঙ্কাসঙ্কুল।
তিলে তিলে দ্রোণ ক্ষুধার আগুনে পুড়ে পুড়ে হল ছাই
তবু···তবু হায় একলব্যের সাক্ষাৎ মিলে নাই।
হায় শিক্ষক, কত ফুল এই জীবনের বাগিচায়
তোমারি প্রাণের মুকুতার মাঝে নয়ন মেলিয়া চায়।
পলে পলে তুমি নিঃশেষ করি আপনার যৌবন
কম্বুকণ্ঠে শত জীবনের করিলে উদ্বোধন।
অথচ তোমারি অন্ন জোটেনা, ভুখা পেটে কাটে দিন,
তোমারি দুহিতা গত বৈশাখে মৃত্যুর সব ঋণ
শোধ ক'রে গেল! সন্তান তব জীবনের অবেলায়
এ-পৃথিবী হতে লইল বিদায় নিরন্ন মূর্চ্ছায়!
হে মহান যোগী! এ-পোড়া দেশেতে মিলিল না-সম্মান,
লভিলে শুধুই অবজ্ঞা, ঘৃণা, অবহেলা, অপমান!
যারে দিলে ভাষা, যে মূক-মুখেতে ফুটাইলে তব বাণী,
সে তোমারে দিল রৌপ্যের তাপে শুধু কলঙ্ক গ্লানি!
হে পৃথিবী, তাকে ক্ষমা কোরোনাক, দিও আর এক ঝড়,
হে ভারত, নব ইতিহাসে লিখো জীবনের উত্তর।

—

'বুভুক্ষু শিক্ষক, সমাজের বিপদ স্বরূপ'—পণ্ডিত অমর নাথ ঝা

বিজয়া

শ্রীবিশ্বমংগল দাশশর্ম্মা

আমার ছোট ভাই-বোনেরা,

নীলাকাশ অবারিত,
উজ্জ্বল-আলোক-দীপ্ত সবুজ প্রান্তর,
স্রোতোহীন শীর্ণা নদী রূপালী বিছানো,
যূথিকার সুরভি-মাখানো
আলসে মেদুর শ্রান্ত শারদ বাতাস।
শেফালির শুভ্র বুকে ঝরেছে শিশির।
দশমীর করুণ সানাই
গাহিতেছে বিজয়ার অশ্রু-আনা গান।
মুক্তদ্বার বাতায়নে একাকী বসিয়া
দেখিতেছি বসুধার অমল অঞ্চল।
শুনিতেছি প্রকৃতির না-বলা ঝংকারে
যে বাণী উচ্ছ্বসি উঠি
নানা রূপে, নানা সুরে, গানে
মর্মরিছে ধরণীর গোপন অন্তরে।
আকাশ কহিছে যেন,
"অনন্ত নীলিমা-ভরা মোর বক্ষো-মাঝে
সংখ্যাহীন তারকার নিত্য আনাগোনা,
মেঘদল চলিছে ছুটিয়া কোথা উদ্দেশ-বিহীন।
সবারে ল'য়েছি টানি' মোর বক্ষোতলে
দ্বিধাহীন নির্বিচারে,
ডাকিয়া নিয়েছি মোর উদার প্রাংগণে।"

যূথিকা কহিছে শুনি,
"নিঃশেষ করিয়া মোর সুরভি-সঞ্চয়
ঝরে যাই সর্ব-অগোচরে;
তাই মোরে সহসা স্মরিয়া
অশ্রু নামে ভ্রমরের, কৃষ্ণ চক্ষু ভরি।"

ঝরে-পড়া শেফালিকা কহিতেছে যেন,
"ক্ষুদ্র মোর শুভ্র বক্ষোপুটে
তুলি লই শিশিরের কণা,
মোর বৃন্ত বসে
আঁকি দিয়া গেরুয়ায় বিরাগী-সাধনা
ঝরে যাই দেবতার রাতুল চরণে।"

* * *

সহসা ফিরিয়া এনু
নিত্যকার সেই পরিবেশে।
বিজয়ার এই শুভক্ষণে
আশিস পাঠাতে হবে তোমাদের লাগি
—এ কথা স্মরণে এলো,
দূর কোন্ সানায়ের করুণ বিলাপে।

* * *

তোমাদের লাগি মোর এই আশীর্বাদ—
চিত্ত হোক্ সদা মুক্ত
মহোদার আকাশের মত,
অন্তর ভরিয়া থাক্
সুরভি-সঞ্চিত-করা যূথিকার সম
ক্ষমা, ধৈর্য, বিনয়ের অনন্ত সঞ্চয়ে;
নিলোভ বাসনা হোক্
শেফালীর গীত বৃন্ত হেন,
কামনা পবিত্র হোক্
নির্মল শিশির ধৌত শেফালির শুভ্র দল সম।
ভুবন উঠুক্ ভরি'
তোমাদের বিমল সুযশে।

আকাংখা

শ্রীরণজিৎকুমার রায় চৌধুরী

বিছানো রয়েচে সবুজ জাজিম্ আউশের মাঠে মাঠে—
এমন জাজিম্ মেলেনা ত খুঁজে বাজারে, দোকানে হাটে।
কোন্ কারিগর ওস্তাদি হাতে
বুনিল গালিচা মেঠো আঙিনাতে,
সোণা মাণিকের ফুলগুলি যেন তাহাতে রয়েছে খচা
সারা রাত ধরে শিশির কুড়ায়ে বুটিকুলি তার রচা॥
আলোর পরশ পাইয়া সবুজ উজল হইয়া ওঠে
হেথায় আসর বসেছে বলিয়া মজলিসি সব জোটে,
প্রজাপতি এসে নাচ দিয়ে যায়,
অলি মৌমাছি যন্ত্র বাজায়—
বিহগের দল উড়িয়া উড়িয়া, আসর জমায় গানে—
দোল দিয়ে যায় মলয় বাতাস, রঙ্গ করিতে জানে॥
লক্ষ্মী জননী, তুমি এলে জানি সবুজ সোণালী হবে
তোমার পরশে শ্যামলিমা রূপ ভ'রে যাবে গৌরবে,
সবুজের দূত পাঠায়েছ তুমি
আশার বাণীটি কহিতেছে ভূমি
আউশের ভূঁয়ে মুসুরী ছোলাতে সবুজ বন্যা আনে,
ধূসর, উসর মনের জমিটি, চেয়ে রই তার পানে॥

কোথা তুমি তথাগত !

শ্রীশশাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী

"রাজগিরি" আজ নীরব শ্মশান, "বোধিমূল" নিশ্চুপ,
"নালন্দা" আজ সমাধি-ক্ষেত্র হৃত-গৌরব-রূপ !
স্তূপে পরিণত হেরি "সারনাথ," আর যেন প্রাণ নাই,
প্রাণের শান্তি পায় না মানুষ কোন তীর্থের ঠাঁই !
হিংসা-আয়ুধে ধরণীর মাটী ভরেছে শোণিত-রাগে,
মানুষের ক্ষুধা মেটে নাকো তবু-আরো তা'র ক্ষুধা জাগে !
সমুখে মৃত্যু, পিছনে মৃত্যু, ঘিরে আছে চারিধার,
দীন-অসহায় পীড়িত-আত্মা করিতেছে চীৎকার !

কোথা তুমি তথাগত !
হিংসার বিষে কলুষিত আজ তব জীবনের ব্রত !
মানুষের দুঃখে কেঁদেছিলে তুমি, বেদনায় ভ'রি প্রাণ,
শান্তির পথ— মুক্তির—পথ ক'রেছিলে সন্ধান !
সংখ্যা-বিহীন আর্ত-কণ্ঠ তোমারে দিল না সুখ,
তাই ত' হ'লে না বিলাসে আলসে সম্ভোগে উৎসুক !
পিছনে তোমার রহিল পড়িয়া রাজার সিংহাসন,
স্বজন গণের সীমাহীন স্নেহ, প্রিয়ার আকর্ষণ !
সদ্য প্রসূত সন্তান তব মায়ার কাজল পরি',
রঙীন আশার রচিল মাধুরী তব দু'নয়ন ভ'রি !

বিরাগী তোমার মন,
চাহিল না কিছু—তাই ত' ছুটিল কাটি সব বন্ধন !
সর্ব্ব তেয়াগি' হ'লে সন্ন্যাসী, চ'লে গেলে একা একা,
যদি কোন দিন পথ মাঝে পাও আঁধারে আলোর দেখা!
মৃত্যু-গরল-পূরিত বিশ্বে অমৃত-লাভ-আশে,
শত হুতাশায় ভ'রে নিলে প্রাণ আশ্বাসে আশ্বাসে !
সুগভীর ধ্যানে ডুবে গেলে তুমি দেহের দিকে না চাহি',
একদিন শেষে হইলে ধন্য অমৃতে অবগাহি' !
পেলে সাধনার সব-শেষ জ্ঞান, পেলে মুক্তির পথ,
বুদ্ধ হইলে বোধি-তরু-মূলে, পুরাইলে মনোরথ !

তোমার অভয় বাণী,
দিকে দিকে তুমি প্রচার করিলে জীবনের স্বাদ দানি' !
তব উদাত্ত আহ্বান-রবে জাগিল বিশ্বলোক,
মৃত্যু আঁধারে ফুটিয়া উঠিল অভিনব জ্ঞানালোক !
মিলিল পতিত-আর্ত-পীড়িত অভয়-চরণ-তলে,
মহাদর্পীর টুটিল দর্প ভাসিয়া নয়ন-জলে !
হিংসা-স্বার্থপরতার মাঝে জাগিল প্রেমের রূপ,
গড়িয়া উঠিল নূতন বিশ্ব—অপূর্ব অপরূপ !
সেবার ধর্মে, পুণ্য কর্মে মানুষ লইল ব্রত,
ধরার ধূলায় রচিলে তীর্থ হে বুদ্ধ তথাগত।

করাল-কালের মাঝে—
তব অবদান আজি কি লুপ্ত—চিহ্ন-বিহীন-সাজে ?
কোথা সে তোমার সাধনার আলো—অমৃতময়ী বাণী ?
হাজার হাজার বৎসর পরে স্বপ্ন বলিয়া মানি!
জীবনের রূপ যা' দেখালে তুমি, কল্পনা মনে হয়,
আমাদের কাছে মৃত্যু যে আজ বাস্তবে ভ'রে র'য় !
মোরা শুধু জানি দুঃখ বেদনা, মোরা জানি হাহাকার,
মোহের নিগড়ে বদ্ধ আমরা—নাহি পাই নিস্তার !
আজ কোথা তুমি হে পথ-দিশারি ! কোথা তব বরাভয় ?
আমাদের মাঝে আসিবেনা আর, হে চির-জ্যোতির্ময় ?
তথাগত, কোথা তুমি ?
ধন্য হইবে আবার বিশ্ব কবে ও চরণ চুমি' ?

হে মহাকাল

শ্রীজ্যোতি কুমার

হে মহা অতীত, হে মহাকাল!
তোমার কোলে অনন্তকাল ধরে
পেতেছি আমি স্বপ্ন-বাসর,
অলকার ঐশ্বর্য্যপুরী।
তোমার প্রাণে দেখেছি আমি অসীম বিস্ময়
আমার প্রাণের কল্পলোকের রূপে।
কী যে রহস্য
সে রহস্য লোকের রাজপুরীতে!
তুমি কি কল্পময়—স্বপ্নময়
চিরন্তন স্মৃতির দেবতা!
এটুকু জেনেছি শুধু—
কোন স্থান নেই মোর তোমার অতীতে,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আদিগন্তরূপে
তুমি ইতিহাস অনন্ত কালের
আর অনন্ত মনের।
তাই মনে জাগে শঙ্কা,
মানুষ কেন যে সময়ের পটে
উদ্ধত গম্ভীর
মনে মনে ভাগ করে লঙ্কা?
কত বিভীষণ ন্যায় আর নীতির দলিলে
আজিও তো কবে স্বাক্ষর,
ভাগ শেষে তবু থাকে বাকী
স্বাধিকার আর প্রবঞ্চনা।
হে মহাতীত,
কালান্তরের ইতিহাসে জানি
তবু তুমি অবশেষ,
নেই সেথা ভাগ শেষ—
তুমি অনাদি অনন্তকালের
চিরন্তনী বাণীসুর
কালের বীণায়
অপরূপ মধুর
রূপহীন রূপোত্তর স্বয়ম্ভু অতীত।

কবিতার প্রতি বিতৃষ্ণা (১৫৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তারপর, গানের আকারেও তোমরা লেখ না—গায়কের কণ্ঠে কণ্ঠে ওগুলো কোন দিন প্রচারিত হবে—সে সম্ভাবনা নেই। কাজী তা লিখেছিল ব'লেই তার অত নাম; নইলে 'বিদ্রোহী' বা পাস্যের গান তার খ্যাতি বাঁচিয়ে রাখতে পারত না। তোমরা নিজেরা তোমাদের কবিতা আবৃত্তি কর, শুনতে পাই; কিন্তু এক সুকান্তের কবিতা ছাড়া এখনও কোন আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায়, স্কুলকলেজের সভা-সমিতিতে তোমাদের কবিতার আবৃত্তি শুনিনি।

চোখ দিয়ে পড়ে যে কবিতার অর্থ বোঝা যায় না, একবার কানে শুনলে ত আরও দুর্বোধ হয় অর্থ খুব স্পষ্ট না হলে, সরাসরি হৃদয় স্পর্শ না করলে, direct appeal না হলে আবৃত্তি জমে না।

যে কবিতায় একটা কোন অনুভূতি (sentiment) রূপ লাভ করেনি—তা ত মর্ম্মস্পর্শ করে না। একটা তত্ত্বকথা সাংকেতিক (Symbolic) ভাষায় ব্যক্ত হ'লে তা বিশ্লেষণের ফলে একটা বোধানন্দের (intellectual sentiment) সৃষ্টি করতে পারে। সাংকেতিক ভাষার কবিতায় কোন একটা তত্ত্বগত ভিত্তি থাকলে বা কোন ধর্ম্মতত্ত্বগত মতবাদের ইঙ্গিত আভাস থাকলে চর্য্যাপদের মত সম্প্রদায়-বিশেষের সাধনভজনের অঙ্গ হতে পারে। কিন্তু পাঠক সাধারণের মর্ম্মস্পর্শ না করলে কোন সাহিত্য সমাদর লাভ করতে পারে না। সকল প্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত ভাব, আদর্শ, মতবাদ, বিধিবিধানের ধারাকে ন স্যাৎ করবার প্রয়াস (Negation of all established ideas and ideals, dogmas and doctrines) চমক লাগাতে পারে, কিন্তু তাকে সাহিত্য বা শিল্পে উপভোগ্য করে তুলতে হ'লে রসস্রষ্টা ও উপভোক্তা সমাজকে বহু বৎসর ধরে তদনুরূপ ভাবসাধনা করতে হবে। বাল্মীকি হ'তে কাজী নজরুল পর্য্যন্ত কাব্য-সাহিত্যের যে ধারা চলে আসছে—তাকে ন স্যাৎ করতে হ'লে বহুবর্ষ লাগবে—সে ধারার পাঠক তৈরী হ'তে আরও বহুকাল লাগবে। তাছাড়া, দেশের মনোভূমিতে শিকড় না গাড়লে কোন সাহিত্যই স্থায়িত্ব লাভ করে না ব'লে আমার বিশ্বাস।

আকাশ সাধনা

শ্রীমুরারীমোহন বিশ্বাস

হে মানুষ, নির্য্যাতিত, মুছে নাও চোখ ;
মুছে নাও অপমান।
ব্যথা ও বেদনা সৌম্য শান্ত হোক।
ভীরু ওই মাথা তুলে দাঁড়াও, তাকিয়ে দেখ,
আকাশের উজ্জ্বল আলোক।

হে মানুষ, মানব হৃদয়,
দেখেছো নিশ্চয়—
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে পড়েছে শিবির,
হিংস্র লোলুপ এক আত্মঘাতী পাশব শক্তির !
এরা স্থূল জীবন বিলাসী,
শিল্পীর জিজ্ঞাসা নেই,
জীবন-দেবের বেদী দু'পায়ে মাড়িয়ে এরা
হাসে অট্টহাসি !

তুমি এতো নির্য্যাতিত—
হে মানুষ, তবু তুমি এতো নিবিকার ?
মাথা পেতে মৃত্যু নিয়ে
অনুভব করো নাকি কতো তীক্ষ্ণ সেই তলোয়ার ?

হে মানুষ, জেগে ওঠো !
তোমাদের ভেঙে যাক ঘুম !
দাঁড়াও, মাথাটি তোলো—
যা' হবার হলো ;—
যা' হবার হোক :
নত ওই মাথা তুলে দাঁড়াও,
তাকিয়ে দেখো আকাশের উজ্জ্বল আলোক !

হে মহামানব, তারপর—
তোমাকে দিলো না অবসর,
তোমার ইঁটের নয় তোমার মাটির গড়া
মান রাখা ঘর
ভেঙে দিলো যারা :
রামধনু স্বপ্ন আঁকা হৃদয় দুয়ারে তব
যারা দিলো মেঘের পাহারা—
তাদেরো জুটিয়ে এনে
এক যোগে তৈরী করো গুড়িয়ে গুড়িয়ে ;
কানে দাও গান,—
অস্তিমে অন্তরতম ওড়াও নিশান !

হে মহামানব, তারপর—
এক দুই তিন করে মানহারা মানুষের
বেঁধে দাও মান রাখা ঘর।
আকাশ বাতাস বেয়ে
সোনালী বরণা—
সেই সব ঘরে ঘরে
শরতের নামুক জোছনা।

যা' হবার হোক্—
তোমার দু'হাতে গড়া
ঘরে ঘরে চাঁদের আলোক
আসে তো আসুক—
শেফালী ফুলের হাসি
আকাশ-সৌরভ নিয়ে আনে তো আসুক।

যা হবার হ'লো—
শারদ চাঁদিমা রাতি !
হে, মানুষ খোলো, দ্বার খোলো।
বন্ধ দ্বার হোক অবারিত।
বিজেতা বিজিত
হে মহামানব, উপরে তাকাও !
উদ্ধত ও নত মাথা আকাশের দিকে তুলে
স্নেহাশীষ নাও !

নিরন্ন ক্ষুধিত শিক্ষক, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিপদ স্বরূপ। যোগ্য পারিশ্রমিক ও মর্য্যাদা দিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ কর।

পশ্চিমবঙ্গে কারিগরী শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধা

দেশের যুবক-যুবতীরা অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা ক'রে যাতে উপার্জ্জনক্ষম হ'তে পারে, তার জন্য পঃ বঃ সরকার ব্যাপকভাবে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করছেন। মাধ্যমিক অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিংবা উত্তীর্ণ হ'তে না পেরে যারা ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কোন্ পথে যাবে চিন্তা করছে, তাদের পক্ষে কারিগরী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধাগুলি জেনে রাখার মূল্য অনেক। এই উদ্দেশ্যে পঃ বঃ শিল্প অধিকার থেকে ফেসিলিটিজ অব ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্রেণিং ইন্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল (Facilities of Industrial Training in West Bengal) নামে একখানি চার আনা দামের ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে সব কিছুর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে।

কারিগরী শিক্ষা প্রসারের সরকারী পরিকল্পনায় পোষ্ট-গ্রাজুয়েট থেকে আরম্ভ ক'রে সামান্য লেখাপড়া জানা সমস্ত যুবক এবং উদ্বাস্তু নারীরা যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে, তার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা অর্থকরী ও কারিগরী—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য মনোনীত প্রার্থীদের সরকারানুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে ট্রেণিং লাভের পর প্রার্থীদের সার্টিফিকেট অথবা ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। ট্রেণিংকালে উপযুক্ত বিবেচনায় প্রার্থীদের বৃত্তিও দেওয়া হয়।

(ক) **পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ও ডিগ্রী কোর্সে শিক্ষা দানের প্রতিষ্ঠানের নাম,** বিষয়, শিক্ষাকাল ও শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ দেওয়া গেল :

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি, খড়্গপুর (বি, এল, আর) : কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং ও বিল্ডিং ইঞ্জিনীয়ারিং (এই বৎসর ছাত্রদের ন্যাভাল আর্কিটেকচার ও এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্সেও ভর্ত্তি করা হয়েছে) চার বৎসর ; প্রথম বিভাগে আই-এস-সি পাশ।

বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, বোটানিকাল গার্ডেন হাওড়া : ডিগ্রী কোর্স—সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, মেটালারজিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, আর্কিটেকচার। আর্কিটেকচারে পাঁচ বৎসর আর অন্যান্যগুলির শিক্ষাকাল চার বৎসর ; ফিজিক্স,, কেমিষ্ট্রি ও ম্যাথমেটিকস নিয়ে আই এস-সি পাশ। পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স—টাউন অ্যাণ্ড রিজিওন্যাল (প্ল্যানিং) ; সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রাজুয়েটদের শিক্ষাকাল দুই বৎসর এবং আর্কিটেকচারের ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা যাদের আছে, তাদের শিক্ষাকাল এক বৎসর।

কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনোলজি, যাদবপুর, কলিকাতা : ডিগ্রী কোর্স—ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ; চার বৎসর ; ২য় বিভাগে আই এস-সি অথবা সমপর্য্যায়ভুক্ত পরীক্ষায় পাশ। পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স—ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ; ন্যূনতম এক বৎসর ; অনার্স গ্রাজুয়েট।

(খ) **নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সে শিক্ষালাভের সুযোগ আছে।**

এই সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার বিষয়, শিক্ষাকাল ও শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণও নীচে দেওয়া হ'ল :

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনোলজি, বর্দ্ধমান : সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং লাইসেন্সিয়েট (ডিপ্লোমা), ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং লাইসেন্সিয়েট (ডিপ্লোমা) ; তিন বৎসর। ড্রাফটস্ম্যানশিপ সার্টিফিকেট ; দুই বৎসর। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা চাই ম্যাট্রিক অথবা সমপর্য্যায়ভুক্ত পরীক্ষা পাশ।

জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, পাটকাটা, জলপাইগুড়ি : সিনিয়র কোর্স—সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিঙে ডিপ্লোমা (লাইসেন্সিয়েট অব সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং); ৩ বৎসর; ম্যাট্রিক অথবা সমপর্য্যায়ভুক্ত পরীক্ষায় পাশ। জুনিয়র কোর্স—ইলেকট্রিসিয়ান, দুই বৎসর; অটোমোবাইল—৩ বৎসর; ব্ল্যাকস্মিথ, কার্পেনট্রি, জেনারেল ফিটার, ম্যাসন, টেলারিং ও বুক বাইণ্ডিং—এক বৎসর; জুনিয়র কোর্সে আণ্ডার-ম্যাট্রিক প্রার্থী নেওয়া হয়।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল সার্ভে ইনষ্টিটিউট, হুগলী : জুনিয়র ও সিনিয়র কোর্স (জুনিয়র ও সিনিয়র সার্টিফিকেট); এক বৎসর; ম্যাট্রিক পাশ। এ ছাড়া রয়েছে স্পেশ্যাল কোর্স; নয় মাস; ম্যাট্রিক পাশ।

যাদবপুর পলিটেকনিক, যাদবপুর কলেজ, কলিঃ, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিঙে লাইসেন্সিয়েটশিপ (এল সি ই, এল এম ই এবং এল ই ই); ৩ বৎসর; ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন বেঙ্গল কর্তৃক পরিচালিত ফাইন্যাল স্কুল ষ্ট্যাণ্ডার্ড পরীক্ষা অথবা সমপর্য্যায়ভুক্ত পরীক্ষা পাশ। ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্সেও শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা উক্তরূপ আর শিক্ষাকাল দুই বৎসর। ডিসপার্শাল স্কীমের অন্তর্গত ট্রেণিংয়ের বিষয়—কার্পেন্ট্রি, ফিটিং, আই সি ইঞ্জিন ড্রাইভিং, অটোমোবাইল মেকানিক, ইলেকট্রিসিয়ান, রেডিও মেকানিক, ওয়েল্ডিং (গ্যাস ও ইলেকট্রিক), মোল্ডিং, প্লাম্বিং, বয়লার অ্যাটেণ্ডাণ্টস, ইলেকট্রোপ্লেটিং মেকানিষ্ট, টার্ণিং, ব্ল্যাকস্মিথ ও ম্যাসিনরি; এক বৎসর; ম্যাট্রিক পাশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তবে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে নন-ম্যাট্রিকও নেওয়া হয়।

হুগলী ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি, হুগলী : ট্রেড কোর্স—কার্পেন্ট্রি, জেনারেল ফিটিং, ম্যাসনারি, স্প্রে পেন্টিং, ইলেকট্রিসিয়ান, ব্ল্যাকস্মিথ; এক বৎসর। জুনিয়র কোর্স—মেকানিক্যাল অ্যাণ্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, মোটর মেকানিকস; দুই বৎসর; উভয় ক্ষেত্রে প্রার্থীর উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া চাই। সিনিয়র কোর্স—সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে লাইসেন্সিয়েট (এল সি ই); ৩ বৎসর; ড্রাফটসম্যান কোর্স: দুই বৎসর; ম্যাট্রিক পাশ। মোটর ড্রাইভিং কোর্স—৩ মাস।

মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রেণিং কোর্স, ভারত সরকারের পরিবহন মন্ত্রক, ৩০, গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা : সেকেণ্ড ক্লাশ মেরিন ইঞ্জিনীয়ার্স কোর্স; ৩ বৎসর ওয়ার্কসপ ও সান্ধ্য ক্লাশ; তা ছাড়া আরও উচ্চতর কোর্সের জন্য মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে এক বৎসরের ট্রেণিং। ম্যাথমেটিকস সহ ও শতকরা ৫০ নম্বর পেয়ে ২য় বিভাগে আই এস-সি পাশ অথবা সমপর্য্যায়ভুক্ত পরীক্ষা পাশ। ফার্ষ্টক্লাশ মেরিন ইঞ্জিনীয়ার্স কোর্স—সেকেণ্ড ক্লাশ সার্টিফিকেট পাওয়ার পর ১৮ মাস সি সার্ভিস; যাদের সেকেণ্ড ক্লাশ সার্টিফিকেট আছে।

ইনষ্টিটিউট অব জুট টেকনোলজি, ৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা : জুট টেকনোলজি; ৩ বৎসর, আই এস-সি পাশ।

দি ক্যালকাটা টেক্‌নিক্যাল স্কুল—১১০, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা : মেকানিক্যাল অ্যাণ্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্স; পাঁচ বৎসর; ম্যাট্রিকুলেশন অথবা সমপর্য্যায়ভুক্ত পরীক্ষা পাশ এবং ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুল এণ্ট্রান্স পরীক্ষা অথবা বি-ও-এ-টি ভর্ত্তি পরীক্ষা অথবা আই এস-সি অথবা তার সমপর্য্যায়ভুক্ত পরীক্ষা পাশ এবং প্রার্থীর কোন অনুমোদিত কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিস থাকা আবশ্যক। প্লাম্বিং অ্যাণ্ড স্যানিটারী ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্স; ৩ বৎসর। শিপরাইটস্ কোর্স; দুই বৎসর; এ ক্ষেত্রে অ্যাপ্রেন্টীস নয় এমন প্রার্থীকে নেওয়া যেতে পারে, তবে ভর্ত্তি হবার পর এক বৎসরের মধ্যে প্রার্থীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ খুঁজে নিতে হবে। ইলেকট্রিক সুপারভাইজার কোর্স; দুই বৎসর; বিজ্ঞান অঙ্ক ও ইংরাজীতে প্রাথমিক জ্ঞান; কোন ইলেকট্রিকের কারখানায় দুই বৎসর কাজ করা চাই। ইলেকটিক ওয়ার্কমেন্স কোর্স; দুই বৎসর; লাইসেন্সধারী কণ্টাক্টারের অধীনে

অথবা অনুমোদিত ইলেকট্রিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। মাতৃভাষা ও অঙ্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ট্রেড অ্যাপ্রেনটিসশিপ কোর্স (মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ) তিন বৎসর; অনুমোদিত কারখানার অ্যাপ্রেন্টীস। মাতৃভাষা ও অঙ্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউট, ক্যানাল সাউথ, পাগলাডাঙ্গা, কলিকাতা: বিশ্ববিদ্যালয় সার্টিফিকেট (কোর্স-এ) তিন বৎসর; ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রি সহ আই এস-সি পাস। বিভাগীয় সার্টিফিকেট (কোর্স বি); দুই বৎসর; ম্যাট্রিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষা পাস। বুট, স্যু ও চামড়ার জিনিস তৈরি সম্পর্কে বিভাগীয় সার্টিফিকেট (কোর্স সি); এক বৎসর; উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫ষ্ঠ শ্রেণী পর্যায়ের শিক্ষা।

বেঙ্গল টেক্সটাইল ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীরামপুর, হুগলি পশ্চিমবঙ্গ:—হায়ার ডিপ্লোমা কোর্স; তিন বৎসর; ম্যাটিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষা পাস। আর্টিজান কোর্স; এক বৎসর; ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যায়ের শিক্ষা। অপারেটিভ কোর্স; ৬ মাস; অক্ষর জ্ঞান। উইমেন্‌স আর্টিজান কোর্স; দুই বৎসর; অক্ষর জ্ঞান।

বেঙ্গল সেরিকালচার ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), পশ্চিমবঙ্গ—সিনিয়র সার্টিফিকেট কোর্স; এক বৎসর; কেমিষ্ট্রি সহ বি-এস-সি পাস; যাদের বোটানি, জুলজি অথবা ফিজিওলজি ছিল তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। জুনিয়র সার্টিফিকেট; এক বৎসর; ম্যাট্রিক; কেমিষ্ট্রি এবং বোটানি, বায়োলজি অথবা ফিজিওলজি সহ আই এস-সি পাস প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সার্টিফিকেট কোর্স। ৬ মাস; সপ্তম শ্রেণী; ম্যাটিক পাস প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

বহরমপুর টেক্সটাইল ইন্‌ষ্টিটিউট, বহরমপুর:—ডিপ্লোমা কোর্স; তিন বৎসর; ম্যাট্রিক অথবা তার সমপর্য্যায়ভুক্ত পরীক্ষা পাস। আর্টিজান কোর্স; দুই বৎসর; উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যায়ের শিক্ষা। শর্ট কোর্স; ৬ মাস; আক্ষরিক জ্ঞান।

(গ) নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে জুনিয়র সার্টিফিকেট কোর্সে ট্রেনিং দিবার ব্যবস্থা আছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রফিসিয়েন্সি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এই সব প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং-এর বিষয়, শিক্ষাকাল ও শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ যথাক্রমে উল্লিখিত হইল:

আসানসোল পলিটেকনিক (ধাদকা), আসানসোল, বর্ধমান:—অটোমোবাইল, বয়লার অ্যাটেণ্ডান্ট, ব্লাকস্মিথ, কার্পেন্ট্রি, ইলেকট্রিসিয়ান, গ্যাস অ্যাণ্ড ফিটিং, মেসিনিষ্ট, ম্যাসন, মাইনিং মেকানিকাল অপারেটর, মোলডার, টিন অ্যাণ্ড কপারস্মিথ, টার্নার। এক বৎসর। ম্যাটিক, কেবলমাত্র কয়েকটি বিষয়ে নন-ম্যাটিকও নেওয়া হয়।

শিবপুর পলিটেকনিক, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, পো: বোটানিক গার্ডেন হাওড়া:—টুল মেকার্স, ফিটার্স, টার্নারস, মেসিনিষ্ট, প্লাম্বার্স, রেডিও মেকানিকস, ইলেকট্রিসিয়ানস, অটোমোবাইল মেকানিকস, কার্পেন্টার্স, ওয়েলডার্স, টিনস্মিথ, মোলডার্স, ল্যাবরেটরী হেলপার্স, পেণ্টার্স, বয়লার অ্যাটেণ্ডান্টস, টেলার্স, ম্যাসনস, রোনিও প্রিণ্টার্স, রেফ্রিজারেশন মেকানিকস, প্যাটার্ন মেকার্স, সীট মেটাল ওয়ার্কার্স। এক বৎসর। ম্যাটিক বাঞ্ছনীয়। কতকগুলি বিষয়ে নন-ম্যাট্রিকেও নেওয়া হয়।

(ঘ) বয়স্ক নাগরিক ও উদ্বাস্তুদের ট্রেনিং পরিকল্পনা:

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমমন্ত্রকের এই পরিকল্পনাটি স্থানীয়ভাবে পরিচালনা করেন রিজিওন্যাল ডাইরেক্টার অব রিসেটেলমেণ্ট, পশ্চিমবঙ্গ। ২৮, থিয়েটার রোড, কলিকাতা, ঠিকানায় এঁর আফস। উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্গত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শিল্প কেন্দ্রের ব্যয় রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তভাবে বহন বহন করেন। নীচে

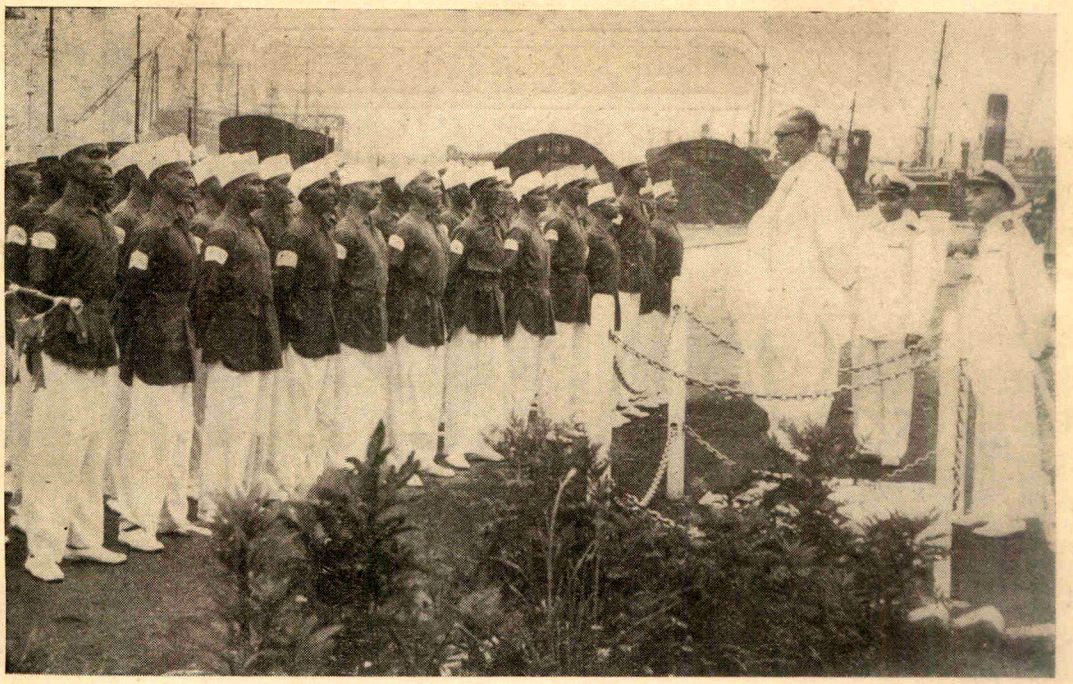

নাবিক বিদ্যা শিক্ষার জাহাজ 'ভদ্রায়' পশ্চিমবঙ্গের যুবকরা নৌচালনা শিক্ষা করিতেছেন। এই শিক্ষার্থীদের এক সমাবেশে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত ভাষণ দিতেছেন।

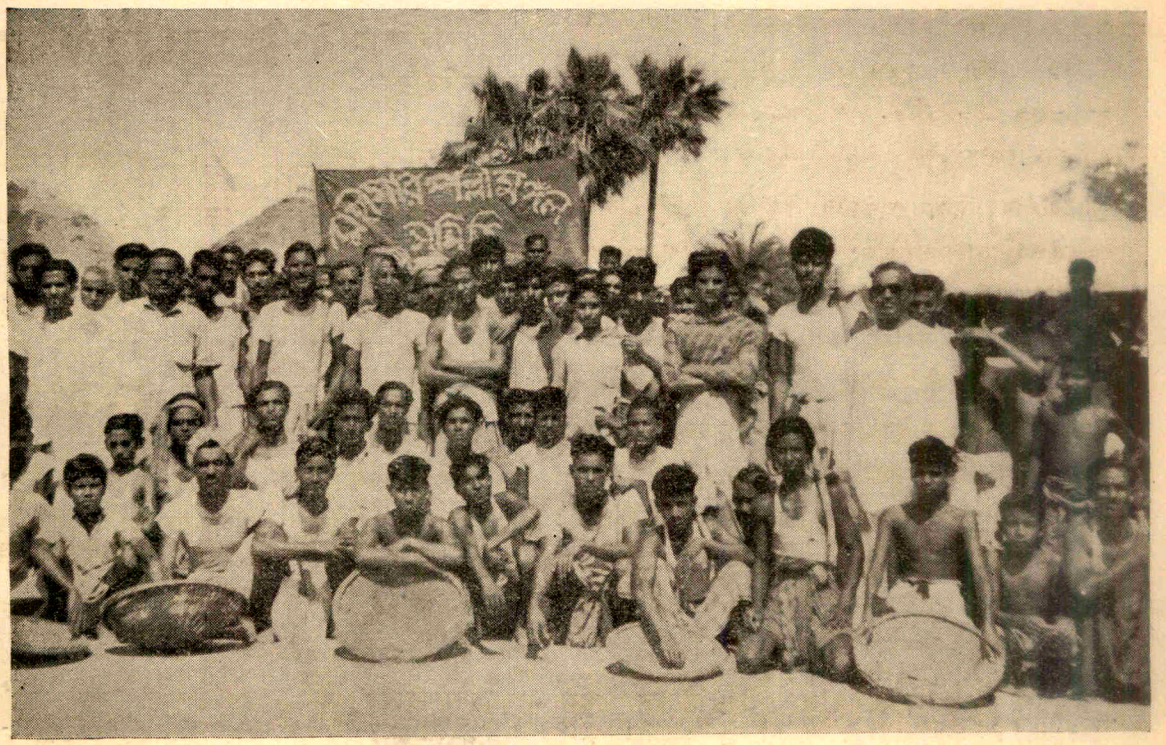

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রদল শ্রমিকের কাজকেও আর নীচ বলিয়া মনে করে না। মুর্শিদাবাদের মহীষার গ্রামে স্বেচ্ছায় তাহারা রাস্তা মেরামত করার কাজ করিতেছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রের নাম, শিক্ষার বিষয়, শিক্ষার সময় ও শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ যথাক্রমে দেওয়া হ'ল :

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্রেনিং, চণ্ডী ঘোষ রোড, টালিগঞ্জ কলিকাতা :—ব্ল্যাকস্মিথ, কার্পেণ্টার ড্র্যাফটসম্যান (মেঃ), ড্র্যাফটসম্যান (সিভিল), ইলেকট্রিসিয়ান, লাইনম্যান অ্যাণ্ড ওয়ারম্যান, মেসিনিষ্ট, মেকানিক (মোটর), মেকানিক (রেডিও), ওভারসিয়ার, পেণ্টার, সার্ভেয়ার (ইঃ ও গ্যাস)। বৃত্তিশিক্ষার জন্য এক বৎসর এবং টেকনিক্যাল বিষয়ে ১৮ মাস এবং কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৬ মাসের হাতে কলমে শিক্ষা। অষ্টম শ্রেণী পর্যায়ের শিক্ষা; কতকগুলি বিষয়ের ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক পাস।

ক্যালকাটা টেকনিক্যাল স্কুল, কলিকাতা :—ড্র্যাফটসম্যান (সিভিল), ড্র্যাফটসম্যান (মেঃ), ফিটার, গ্রাইণ্ডার, মেসিনিষ্ট, মেকানিক (ডোমেষ্টিক রেফ্রিজারেটর) প্লাম্বার, টার্নার।

বি, পি, চৌধুরী টেকনিক্যাল স্কুল, কৃষ্ণনগর :—ব্ল্যাকস্মিথ, কার্পেণ্টার, ড্র্যাফটসম্যান (সিভিল), ফিটার, লাইনম্যান অ্যাণ্ড-ওয়্যারম্যান, মোটর মেকানিক, পেণ্টার। ।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্রেনিং সেণ্টার, গড়িয়াহাট, কলিকাতা : ব্ল্যাকস্মিত, ব্রিকলেয়ার, কার্পেণ্টার, ড্র্যাফটসম্যান, মেসিনিষ্ট, মোলডার, প্যাটার্ন মেকার্স, ইলেকট্রিসিয়ান, সীট মেটাল ওয়ার্কার, টার্নার, ওয়েলডার (গ্যাস ও ইঃ) মোটর মেকানিক, ইণ্টারন্যাল কমবাস্‌সন ইঞ্জিন মেকানিক, বুক বাইণ্ডিং, কাটিং ও টেলারিং।

হাওড়া হোমস, সাঁত্রাগাছি :—বৃত্তিশিক্ষা : বুক বাইণ্ডিং, কাটিং ও টেলারিং, হ্যাণ্ড কম্পোজিশন ও প্রুফ রিডিং, ম্যানুফ্যাকচার অব ফুট ওয়্যার (লেদার), প্রিণ্টিং মেসিন অপারেটার।

সেণ্ট আলফোনসাস ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল, কার্শিয়াং :—বুক বাইণ্ডিং, কাটিং ও টেলারিং, হ্যাণ্ড উইভিং অব উলেন ফেবরিকস, নিটিং উইথ হ্যাণ্ড মেসিন, স্যুটকেস ও অন্যান্য চামড়ার জিনিস তৈরি, জুতা তৈরি, প্রিণ্টিং মেসিন অপারেটার।

জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট কলিকাতা :—টেকনিক্যাল বিষয় : অয়ারলেস অপারেটর। বৃত্তিশিক্ষা—রেলওয়ে সিগন্যালিং ও এ, এস, এম, কোর্স, অ্যাকাউণ্টেন্সি অ্যাণ্ড বুক কিপিং।

রজার্স সর্টহ্যাণ্ড স্কুল, কলিকাতা : বৃত্তিশিক্ষা : ইংরাজী ষ্টেনোগ্রাফী, কমার্সিয়াল করেসপণ্ডেন্স, টাইপরাইটিং। এই সব কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকাল ও শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রথমোল্লিখিত কেন্দ্রের অনুরূপ।

কলেজ অব এরোনটিক্যাল সার্ভিসেস, দমদম, কলিকাতা :—গ্র্যাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং। তিন বৎসর। আই, এস-সি, পাস। ট্রেড কোর্স : ফিটিং, কার্পেণ্ট্রি, ইলেকট্রিসিয়ান, সিট মেটাল, টুল মেকিং, হীট ট্রিটমেণ্ট, ওয়েলডিং ও স্প্রে পেণ্টিং। এক বৎসর। ম্যাট্রিক।

কোচবিহার ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল অ্যাণ্ড ওয়ার্কশপ, কোচবিহার : জেনারেল মেকানিক, মোটর মেকানিক দুই বৎসর। অষ্টম শ্রেণী পর্যায়ের শিক্ষা। উইভিং অ্যাণ্ড প্রিণ্টিং। এক বৎসর। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যায়ের শিক্ষা।

ট্রেনিং কাম-প্রডাকশন ওয়ার্কস (বেকার রিলিফ পরিকল্পনার অন্তর্গত) : কাটলারি ওয়ার্কস, নন-ফেরাস মেটাল ওয়ার্কস, আমব্রেলা ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস, সোপ ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস, পটারি ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস, বুট অ্যাণ্ড স্যু ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস, উল উইভিং পার্টি। এক বৎসর। নন-ম্যাটিক।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ লেবরেটরী, ক্যানাল সাউথ রোড, পাগলাডাঙ্গা, কলিকাতা-১৫ : পেণ্ট অ্যাণ্ড ভার্নিস ম্যানুফ্যাকচার। এক বৎসর। ফিজিকস, কেমিষ্ট্রি ও ম্যাথমেটিকস্ সহ বি এস-সি পাস। ইংক্, অ্যাডেসিভ অ্যাণ্ড ডিসইনফেকট্যাণ্টস ম্যানুফ্যাকচার, সোপ ম্যানুফ্যাকচার। ৬ মাস। ম্যাট্রিক পাস অথবা ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়া : আই এস-সি পাসদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

(শেষাংশ ১৮১ পৃষ্ঠায়)

পনেরো বছর পরে ক'লকাতায় ফিরে এসে আমার চোখে ক'লকাতার যে রূপ প্রতিভাত হ'চ্ছে—আপনারা যারা দীর্ঘকাল একাদিক্রমে ক'লকাতায় বাস করছেন,—আপনাদের পক্ষে সম্ভবতঃ সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সহজ হবে না।

পুরাণো বাড়ী ভেঙে নতুন বাড়ী উঠ্‌ছে, পুরাণো রাস্তা ভেঙে নতুন রাস্তা, ফাঁকা জমিতে নতুন-নতুন বাসা, জনতার অস্বাভাবিক আধিক্য,—আমি সে ধরণের পরিবর্তনের ইঙ্গিৎ করছি না,—আমার যেটা সব থেকে বেশী করে চোখে পড়্‌ছে,—সেটা হচ্ছে—সহরের মানুষের মনের দিক্-বিবর্তন!

দেখে-দেখে কী মনে হ'চ্ছে জানেন? আজকের মানুষ মানুষের কাছাকাছি হ'চ্ছে স্থূল স্বার্থের প্রয়োজনে,—হৃদয়ের তাগিদে নয়। পনেরো বছর আগে ঠিক এমনটি ছিল না। উপর্যুপরি আঘাত লেগে লেগে আজকের মহানগরী যেন হারিয়ে ফেলেছে হৃদয়!

যত সহজে পনেরো বছরের আগেকার মানুষ বিচলিত বোধ করত,—আজকের মানুষ তা' করে না। পথের যে-মর্মান্তিক ঘটনা পনেরো বছর আগেকার পথিকের চোখে অশ্রু ঘনিয়ে আন্‌ত,—আজকের মানুষের মনে সে ঘটনা জাগায় যতটা নিছক কৌতূহল, ততটা আর-কিছু নয়। এ আমার অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য। চারমাথার মোড়ে যেখানে ট্রামগুলি উত্তর এবং দক্ষিণ থেকে এসে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে যায়,—সেখানে আমি একটি লোককে অতর্কিতে মোটর-চাপা পড়তে দেখেছিলাম সেদিন। শরীরের ওপর দিয়ে কালো মোটরটা বেরিয়ে গেল যখন, দেহটা একবার স্প্রিংয়ের মতো বেঁকে উঁচু হ'য়ে উঠল,—তারপরেই সব-কিছু নিশ্চল—নিথর! ভীড় ঠেলে কে একটি বিশীর্ণ প্রৌঢ়-লোক এগিয়ে এলেন কাছে,—বল্‌লেন,—'কী হ'য়েছে মশাই?'

তারপরেই চারিদিক লক্ষ্য ক'রে যেন খানিকটা তাচ্ছিল্যের স্বরেই বল্‌লেন,—'ও, গাড়ী-চাপা? তা' পাঠিয়ে দিন না হাসপাতালে! না কী, এর মধ্যেই হ'য়ে গেছে? তা হ'লে ত চুকেই গেল ল্যাঠা!' নির্বিকার-চিত্তে ভীড় থেকে বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক! আমার মনে কিন্তু ভীষণ দাগ কেটে গিয়েছিল ব্যাপারটা। শীর্ণ প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে আমার মনে হ'য়েছিল যেন আজকের ক'লকাতার জীবন্ত প্রতীক! শুধু কৌতূহল, সহানুভূতি নয়। চারটে দেয়াল-ঘেরা ঘরকে শুধু ঘরই বলা,—সামান্য একটু ভাবালুতার স্পর্শও বুঝি নেই,—স্বপ্ন দেখতেও বুঝি ভুলে গেছে আজকের মানুষ!

গম্ভীর ট্রাজেডীর আবেদনও যেখানে সাড়া জাগায় না, সেখানে আমার এ কাহিনী কারুর মনে সামান্য দাগটুকুও কাট্‌তে পারবে কিনা সন্দেহ।

ব্যাপারটা ঘট্‌ল ঠিক একটা অলৌকিক ঘটনা ঘট্‌বার মতো ক'রে। 'মতো' কেন, অলৌকিকই বলা উচিত ঘটনাটাকে। চল্লিশের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছল গিয়ে বয়স, অভিজ্ঞতাও অর্জন করলাম কম নয়; 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' না হোক,—তিনটি সমুদ্র ঘুরে আসবার সৌভাগ্য ত ঘটেছে আমার। প্রচুর লোকের এসেছি সংস্পর্শে,—কতো বিচিত্র লোক! স্নিগ্ধ অবগাহনের সমাপ্তিতে নদীতটের ঘাটে ঘাটে অজস্র ভিজে পায়ের দাগ রেখে তারা চলে গেছে! চলেও গেছে; শুকিয়েও গেছে সেই দাগ। নিজের ফেলে-আসা জীবনটাকেই কী ভালো ক'রে রাখতে পেরেছি মনে?

বিকালের দিকের কথা। শিশুপুত্রের হাত ধ'রে

বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। দুর্গাপুরের উঁচু পোলটা পার হ'য়ে কালো পিচের রাস্তাটা ক্রমশঃ ঢালু হ'য়ে নেমে গেছে ওপারে। আমরা ওপারে পৌঁছে সোজা না গিয়ে ডান-দিক্‌কার রেলিং পেরিয়ে টিলা থেকে নীচে নাম্‌লাম। ডান দিকে নিউ আলিপুরের সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলি ছবির মতো সাজানো। সামন্তরাল ঋজু নীচের পথ সোজা চ'লে গেছে বেহালার মুখে। মাঝেরহাট ষ্টেশনের সেই ছোট-ছোট রেলগাড়ীর লাইনটা ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে বেঁকে গেছে বেহালার দিকে,—নিউ আলিপুরের সেই প্রান্তসীমা পর্যন্ত বেড়িয়ে যখন আবার ফিরে আস্‌ছি,—তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এলো প্রায়। বড়ো রেললাইনের ধারের একটা বাঁকড়া-মাথা শিরীষগাছের ডালে কুলায়-ফিরে-আসা পাখীদের জটলা। একদল কিশোর ফুটবল-খেলা শেষ করে কোলাহল কর্‌তে কর্‌তে চ'লে গেল। নীল জার্সি-পরা একটি যুবক একটি ঝক্‌ঝকে নতুন রেসিং-সাইকেলের ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়ে হুস্ ক'রে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—বোধহয় রেস্-খেলার অনুশীলন কর্‌ছে! দুটি প্রকাণ্ড আল্‌সেসিয়ান্ কুকুর নিয়ে বেড়িয়ে ফির্‌ছেন ফ্রেঞ্চ-কাট্-দাড়ী এক সর্টস্-পরা কেতাদুরস্ত বাঙালী ভদ্রলোক। পেরাম্বুলেটারে ক'রে একটি সুন্দর নিটোল-স্বাস্থ্য শিশুকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মন্থরগতিতে একটি অন্ধ্র দেশীয়া আয়া। হল্‌দে-শাড়ী-পরা বেণীদোলানো একটি তরুণী মেয়ে ধীর পায়ে হেঁটে আস্‌ছে, হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা! একটি সুদৃশ্য বাংলোবাড়ী থেকে ভারী মিষ্টি পিয়ানোর ঝংকার ভেসে আস্‌ছে,—জানা একটি রবীন্দ্র-সংগীতের কোমল সুর।

সুরে সুরে মন ভ'রে গিয়ে হয়ত রীতিমত মন্থর হ'য়ে গিয়েছিল চলার ভঙ্গী,—হল্‌দে রঙের ক্ষুদ্র দোতলাবাড়ীটার ঠিক সামনেই বুঝি গেছি দাঁড়িয়ে,—এমন সময় একেবারে স্পষ্ট কাণে এলো একান্ত পরিচিত বারোবছরের মেয়ের সেই কোমল কণ্ঠস্বর,—'মাষ্টারমশাই?'

একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম তাকে,—দীর্ঘ পনেরো-ষোলো বছর পরের এই অকস্মাৎ ডেকে-ওঠা আমাকে সংগে সংগে মনে পড়িয়ে দিলো সমস্ত-কিছু। চম্‌কে চাইলাম বাড়ীর দিকে। দক্ষিণ-দিকের একটা জানালা খোলা শুধু। দরজা বন্ধ। বাড়ীটার কোনদিক থেকে কোন সাড়াশব্দের আভাষ নেই। কিন্তু, আমাকে ডাকল কে ও ভাবে? ভালো ক'রে দেখলাম বাড়ীটার এদিক-ওদিক, অবশ্য বাইরে থেকে যতটা দেখা যায়। চোখে পড়্‌ল না কোনো মুখ। আর আহ্বানও এলো না কাণে। তবে কী আমার মনের ভ্রম? মনের ভ্রমই হবে।

কিন্তু বাড়ী এসে যতই ভুল্‌তে চেষ্টা করি ঐ তুচ্ছ ব্যাপারটা—ততই গভীর ক'রে মনটাকে জড়িয়ে ধরে। এ যেন আমার সেই পুরাণো ক'লকাতা হঠাৎ আবার আমাকে ডাক দিয়েছে, হঠাৎই খুঁজে বার ক'রেছে আমাকে! মোহমুগ্ধের মতো আমি সাড়া দেবার চেষ্টা কর্‌ছি!

কিন্তু গঙ্গাপদবাবু ও তাঁর স্ত্রী ত গত হ'য়েছেন বহুকাল। শুনেছিলাম ওঁদের সেই পুরাণো বাড়ী গুঁড়িয়ে গেছে ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চাকার তলায়। সেখানে গড়ে উঠেছে নতুন পথ, নতুন পল্লী।

গঙ্গাপদবাবুর দুই মেয়ে। অশ্রুর বিয়ের ব্যাপার ক'লকাতা ছাড়বার আগেই দেখে গিয়েছিলাম। স্মৃতির বয়স তখন চৌদ্দর বেশী নয়। সে-ও কী বসে আছে এখনো? গণনা ক'রে দেখলে আজ সে আঠাশ-উনত্রিশ বছরের মহিলা। শুধু বিবাহিতা নয়, খুব সম্ভবতঃ ছেলে-মেয়ের মা। অথচ, নিউ আলিপুরের পথে যে কণ্ঠস্বর কাণে এসেছিল—তা' অবিকল সেই বারোবছরের স্মৃতিকণার,—এ বিষয়ে কোনো ভুল নেই।

এ কেমন ক'রে হলো? নিজেকে নিজে দু'তিনদিন ধ'রে ক্রমাগত এই প্রশ্ন ক'রে ক'রে হয়রাণ হ'য়ে গেলাম। অথচ, ভুলতে পারি না, একমুহূর্তের জন্যও না। 'মাষ্টার-মশাই'—'মাষ্টারমশাই'—অনবরত কাণে বাজছে সেই ডাক! গঙ্গাপদবাবুর বাড়ীতে আমি ত গৃহশিক্ষক ছিলামই বছর দুয়েক। সে আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের অধ্যাপনা-উদ্যম!

কিন্তু হঠাৎ এভাবে ওদের মনে পড়ে গেল কেন? যে দেবতার নির্দেশে মন-মক্ষিকা অন্তরের অতল গহনে সঞ্চয়

ক'রে রাখে অজস্র স্মৃতির মধু,—একমাত্র তিনিই দিতে পারেন হঠাৎ এ মনে-পড়ার রহস্যের সন্ধান! একমাত্র তিনিই বলতে পারেন,—যাদের একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম,—সেই অশ্রুকণা-স্মৃতিকণারা আজ পনেরো-ষোলো বছর পরে হঠাৎ এভাবে এসে মনের মণিকোঠায় ঘন ঘন করাঘাত করে কেন?.....

সন্ধ্যারাত্রে ভিতর থেকে তাড়া খেয়েই বোধহয় ফ্রকপরা বারোবছরের স্মৃতিকণা এসে টেবিলে পড়তে বসত তার দিদির পাশাপাশি। সারা বিকেলটা পার্কে অত্যধিক ছুটোপাটি করবার ফলে সন্ধ্যা পার হ'তে-না-হ'তেই ঘুম ভ'রে আসত মেয়েটার চোখে,—ওর দিদিকে ভূগোলের পড়া বোঝাতে বোঝাতে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতাম,—রীতিমত ঘুমে ঢুলে পড়ছে মেয়েটা। এক-একদিন বড়ো মায়া হতো। পিঠে হাতখানা রেখে কোমলকণ্ঠে বলতাম, —'স্মৃতি? ও স্মৃতি? যাও, ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি দু'চোখ মেলে সোজা হ'য়ে বসত,—ওর সেই বিব্রত অবস্থা দেখে আমি আর ওর দিদি যখন সমস্বরে হেসে উঠতাম,—ও তখন ভয়ানক লজ্জা পেতো। কিন্তু ভিতরে যেতো না, বলত,—'উঁহু,—মা বকবে।'

কোথায় গেল সেই স্মৃতিকণারা? কার কাছে পাবো ওদের সন্ধান? ওদের বাড়ী গেছে নতুন পথের পেষণে গুঁড়িয়ে। ওদের সেই সাবেকী গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তার মোড়ে পৌঁছে একটা টিম্‌টিমে বাতি-জ্বলা মুদির দোকান চোখে পড়ত। বেশ মনে পড়ে ওদের পুরাণো চাকর কেষ্টচরণের নিয়মিত আড্ডা ছিল ঐ দোকানটায়। বলত, —'মাষ্টারবাবু, রতনমুদি আমারই মতো পাড়ায় চাকরী করত,—দেখুন চেয়ে, চাল-ডাল-মশলা সাজিয়ে কেমন জাঁকিয়ে ব'সেছে! দেখুন না কেন, ফেঁপে উঠল ব'লে। যে-ভাবে ওজনে চুরি করে! পাঁচপোর পয়সা নিয়ে সটান্ আমায় একসের আটা মেপে দেয়,—অথচ দেখুন ধর্ম্ম ওরই ঘরে! মাষ্টারবাবু, জেবনে যদি কিছু করতে হয় ত, ঐ। একখানা মুদির দোকান! ব্যস্, কেষ্টচরণকে আর দেখতে হবে না!'

কেষ্টচরণের উচ্চাশা সাফল্যের ঔজ্জ্বল্য দেখেছে কিনা কে জানে! বিনিদ্র রাত্রে শয্যায় শুয়ে শুয়ে স্মৃতিভারে বিপর্যস্ত হ'য়েই স্থির করলাম,—সেই পুরাণো অঞ্চলটার দিকে নিশ্চয়ই যাব কাল সকালে উঠে। বাড়ীই না হয় গেছে,—পুরাণো কারুর চেহারাও কী চোখে পড়বে না, যে দিতে পারবে স্মৃতিকণাদের সন্ধান? কিন্তু সেই পুরাণো গলির সংগে নিউ আলিপুরের কী সম্বন্ধ, ভেবে পেলাম না। নিউ আলিপুরের হল্‌দে বাড়ীতে কেমন ক'রে শুন্‌লাম সেই পুরাণো স্মৃতিকণার কোমল কণ্ঠস্বর,—'মাষ্টার-মশাই?'.....

'মাষ্টারমশাই, আপনি যখন দিদিকে রোজ সন্ধ্যাবেলা পড়াতে আসতেন,—আপনাদের সামনে বই নিয়ে বসতে-না-বসতেই আমার ঘুম পেতো। মা কতো বকেছে, দিদি কতো ঠাট্টা ক'রেছে,—আপনি নিজে কতো বিরক্ত হ'য়েছেন,—কিন্তু কিছুতেই পারতাম না ঘুমটাকে এড়াতে। পার্কে অত খেল্‌ব না ঠিক করলেও সুধী, নীতা, চম্পাদের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে ঠিক খেলায় মেতে যেতাম! পার্কের সেই দোল্‌নাটা আপনার মনে আছে? সেই যে একবার পূজোর সময় রাত্রে আমাকে আর দিদিকে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন,—পার্কের সেই ফাঁকা অংশটায় সেই দোল্‌নাটা তখনো সেদিন ঝুল্‌ছিল। দিদি গিয়ে বস্‌ল দোল্‌নায়, আপনি দিদির মাথার কাছে দড়ি দুটো ধ'রে আস্তে আস্তে দোলা দেবার চেষ্টা কর্‌ছিলেন,—আর দিদিটা উঠছিল ভয়ে আঁৎকে! দিদি যত ভয় পাচ্ছে, আমি তত হাস্‌ছি! দোল্‌নায় দুল্‌তে আবার ভয়! সেই দোল্‌নাটা আমার কাছে নেশার মতো ছিল! দুটি-দুটি মেয়ে, একজন দাঁড়িয়ে, একজন ব'সে,—আমরা দুল্‌তে দুল্‌তে কতো উঁচুতে উঠতাম, নীচের ছেলেমেয়েরা সব আনন্দে আর উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠত,—আমাদের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা থাকত না!

কিন্তু মাষ্টারমশাই, এক-এক সময়ে আপনাকে আমার ভীষণ ভয় করত। বইয়ের সামনে বসে ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে হঠাৎ কখনো-সখনো চম্‌কে উঠে দেখতে পেতাম,—

আপনার আর দিদির মুখ ভয়ানক গম্ভীর। কোনোদিন এ-ও চোখে পড়েছে,—দিদি মুখ নীচু ক'রে আঁচলের আড়ালে নীরবেই কাঁদছে,—আর আপনি নির্বিকারচিত্তে টেবিলের ওপর ঝুঁকে দিদির একটা আধ-কষা সিঁড়িভাঙ্গার অঙ্কের ওপরে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগই দিচ্ছেন—দাগই দিচ্ছেন! সত্যি বলছি, ভীষণ বুকটা চিপ্ চিপ্ করতো সেই সময়। কী ভয়ই না করত তখন আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে!

'আবার এক-একদিন দেখতাম, কেমন ক'রে যেন আপনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। অপ্রতিভ হ'য়ে চোখ নামাতেই আপনি বল্‌তেন,—'ভিতরে যাও স্মৃতি, চোখে-মুখে জল দিয়ে এসো।'

"ভিতর থেকে ফিরে এসে, আশ্চর্যের বিষয়, দিদিকে দেখতে পেতাম না। আপনি বল্‌তেন,—'ভীষণ মাথা ধ'রেছে ব'লে ছুটী নিয়ে চলে গেছে অশ্রু, শুয়ে পড়েছে।'

'পাঠ্য বইয়ে কিছুদূর এগোবার পর মনে হ'তো, আমারও ভীষণ মাথা ধ'রেছে,—ছুটী নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লে ভালো হয়।

'আপনি ছুটী দিয়ে বিরক্তভরে উঠে দাঁড়াতেন, বল্‌তেন, তোমাদের দু'টি বোনেরই কিচ্ছু হবে না!'

আপনি চ'লে যেতেই বই-পত্র একপাশে সরিয়ে রেখে তর্‌তর্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যেতাম। আর আশ্চর্য, কোথায় তখন চ'লে যেতো ঘুম! বাবার ঘরে বাবা চোখে পুরু চশমাটা এঁটে মোটা খাতায় একমনে হিসাব কষ্‌ছেন,—বাবার ঘরটা পাশ কাটিয়ে ছুটে যেতাম দিদির ঘরে। রাস্তার দিক্‌কার জানালায় দু'হাত শক্ত ক'রে লোহার শিক আঁকড়ে চুপ্‌চাপ্ দাঁড়িয়ে আছে দিদি ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে একরাশ অন্ধকারের মধ্যে ডুবে। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধর্‌তাম দিদিকে। দিদি যে মিথ্যে মাথা-ধরার ভাণ ক'রে আপনাকে ঠকিয়েছে,—এটা বুঝ্‌তে পেরেই আমার এই উল্লাসের ঢেউ! আমিও দিদির মত ক'রেই ঠকালাম আপনাকে, আপনি বুঝ্‌লেন না! এ' একটা খেলার মতো। যেন সেই পার্কের দোলনার ওপর থেকে হুস্ ক'রে নেমে মাটি-ছুঁই-ছুঁই-ভাব দেখিয়ে আবার ওপরে উঠে যাওয়া! আপনার নিরীহ-নিরীহ শান্ত স্বভাবটা আমাকে প্রায়ই অমন দুষ্টবুদ্ধির প্ররোচনা দিত!

দিদি বলল, 'চলে গেছে?'

—'কে?'

—'কে আবার! পড়ানোর নাম ক'রে যে এসে পড়ায় না, শুধু চুপ ক'রে বসে থাকে, সে।'

'মাষ্টার মশাই?'

দিদি বেশ রাগতকণ্ঠেই বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার মাষ্টার মশাই!'

একটু আশ্চর্য হ'য়েই বললাম, 'মাষ্টার মশাই ত তোমার। তোমাকে পড়ানোর জন্যই ত বাবা ও'কে রেখেছে। আমি ত ফাউ। মা ত জোর ক'রে আমাকে তোমাদের কাছে ঠেলে দেয়!'

কী ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ হেসে ফেলল দিদি, বলল, —যাঃ! বলিস না ও'সব কথা কাউকে।'

'বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দিদি আমার থেকে বছর চার-পাঁচেকের বড়ো,—কিন্তু আমি একটু বাড়ন্ত গড়ন ব'লেই ওর মাথায়-মাথায় এসেছি, হয়ত বা একটু ছাড়িয়েও গেছি!

'বছরখানেক পরেই কিন্তু আমার পার্কের খেলা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে কোথাও যাবার বেলাও শুরু হ'লো মায়ের কড়াকড়ি। আমি ফ্রক্ ছেড়ে শাড়ী ধরলাম। মাষ্টার মশাই, আমি তখন কিছুতেই আপনাদের সামনে বার হতে চাইতুম না, মনে পড়ে? ভীষণ লজ্জা করত, একটা অজানা ভয়ও এসে বুকের মধ্যটা কাঁপিয়ে তুলত!

'আপনি কিন্তু আমাকে যত্ন ক'রে পড়াবার চেষ্টা করতেন। বকতেন না, কিছু না, কতো সুন্দরভাবে গল্পের মতো ক'রে বলে যেতাম, দিদি মুখ নীচু করে একমনে ট্রান্‌স্লেশন করতে থাকত। আপনি মাঝে মাঝে গল্প থামিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কী? হলো?'

দিদি মাথা নেড়ে জানাতো, 'না।'

আপনি আবার একটু হেসে ওকে বলতেন,—'পরীক্ষায় পাশ হবার ইচ্ছা আছে?'

দিদিটা অদ্ভুত উত্তর দিতো, বলতো, 'না।'

'না?'

'চাইনা পাশ করতে' বলে সব-কিছু ফেলে রেখে উঠে পালাতো দিদি।

'আপনি যতক্ষণ থাকতেন, দিদির তখন অন্যরূপ। আপনি আমার পড়ার দিকে একটু বেশী মনোযোগ দিলেই ও' যেন ক্ষেপে যেত। আপনার সামনে ভীষণ রুষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ত ও' আমার ওপর। ওটা আপনি হয়ত তত বুঝ্‌তেন না, আমি মেয়ে হ'য়ে সহজেই বুঝতাম! ওর ব্যবহারে মাঝে মাঝে চোখে জল এসে পড়ত আমার। একদিন, আপনি নূরজাহানের কাহিনী বলছিলেন ইতিহাস থেকে,—ও' হঠাৎ বাধা দিয়ে ওর একটা দুরূহ অঙ্ক এনে দিলো আপনার সামনে। আমি কিন্তু ততক্ষণে ডুবে গেছি আপনার গল্পে। বললাম, 'তারপর, মাষ্টার মশাই, তারপর?'

'আপনি কিছু বলবার আগেই মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে উঠ্‌ল দিদিটা, 'তারপরের কথাটা পরে হবে'খন। মেয়ে যেন গল্প পেলে আর কিছু চায় না! গল্প আর গল্প!'

'ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে মাষ্টার মশাই। দিদির এ অভাবিত অকারণ তীরস্কারে আমি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। আপনি যতই সান্ত্বনা দিতে লাগলেন আমাকে, ততই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছিলাম আমি। আপনি উঠে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে লাগলেন। বল্‌লেন, 'চুপ চুপ, মা শুন্‌তে পাবে, বাবা শুন্‌তে পাবে!' আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম কান্না রোধ করতে, আপনি দু'হাতে আমার মুখখানা তুলে ধরলেন, অসীম স্নেহে মুছিয়ে দিলেন অশ্রুর ধারা। দিদি তখন টেবিলে মুখ নামিয়ে খাতায় পেন্‌সিল্ দিয়ে একমনে অঙ্ক না অনুবাদ, কী যেন ক'রে চ'লেছে!

'আপনি পড়িয়ে চলে যাবার পর খেয়ে-দেয়ে যখন আমরা ওপরে উঠে আসতাম, তখন দিদির চেহারা কিন্তু অন্যরকম। এক-একদিন দু'হাতে আমাকে ধরে আমার মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকত দিদি, বলত,—'স্মৃতি, একটা জিনিষ ধার দিবি?'

'কী?'

'তোর গায়ের রঙ!'

'ধাঃ!'—ব'লে লজ্জা পেয়ে মুখ লুকাতাম দিদিরই কাঁধে মাথা রেখে। দিদি শ্যামলী, আমি গৌরী। মা বলতেন, —আমার চোখ-মুখ নাকি দিদির থেকেও সুন্দর! আমার কিন্তু তা' মনে হ'তো না,—দিদির গায়ের রং একটু ময়লা হ'লেও দেখতে ওকে সুন্দরই লাগত। বরং, ঐ বয়সেই আমি একটু মোটা-সোটা-ধরণের ছিলাম,—দিদি ছিল ছিপছিপে। মা কখনো-কখনো বলতেন, 'অঞ্জু যদি তোর স্বাস্থ্যটা পেতো!'

'দূর্!'—বলতাম,—'দিদির গড়ন কতো সুন্দর! আমার মতো টিপ্‌সী হয় না যেন কোন মেয়ে!'

'বাবা বোধহয় মেয়েকে পড়ানোর চেয়ে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন বেশী। যতদিন সেটা না হচ্ছে, ততদিন অগত্যা পড়াটা চলুক,—বাবার মনোভাব সম্ভবতঃ ছিল ওইরকম একটা কিছু। দিদিকে কয়েকবার এসে কেউ-কেউ দেখে গেছে, কিন্তু পছন্দ হয়নি। ভালো ক'রে খোঁপা বেঁধে সেজেগুজে একঘর লোকের সামনে গিয়ে মুখ নীচু ক'রে দাঁড়ানো,—এ যেন একরকম অভ্যাসই হ'য়ে গিয়েছিল দিদির। সংগে সংগে 'পছন্দ হলো না'—শোনাটাও অভ্যাস ছিল ওর। সম্বন্ধ আসত, সম্বন্ধ ভাঙত,—দিদির সেটা মনেও দাগ কাট্‌ত না। বরং সম্বন্ধ ভেঙে গেছে শুন্‌লে ও যেন কিছুটা নিশ্চিতই হতো। কিন্তু অঘটন ঘট্‌ল একসময়। কারা যেন পছন্দ ক'রে একেবারে 'আশীর্বাদ' ক'রে চলে গেল দিদিকে। বিয়ের দিনও স্থির হ'য়ে গেল।

'কিন্তু বেঁকে বস্‌ল দিদি। এ বিয়ে সে করবে না, কিছুতেই না। দিনকয়েক ধ'রে কান্নাকাটি, মান-অভিমান, —সে এক দৃশ্যই দেখা গেছে বটে! কিন্তু বাবাকে কোন প্রকারেই রোধ করা গেল না। উদ্যত হ'য়ে উঠল তাঁর শাসন।

'আমি জানতাম, পড়াতে এসে শূন্যদৃষ্টি মেলে অবসন্নের মতো আপনি এলিয়ে দিতেন নিজেকে,—বই-পত্র নিয়ে ব'সে আছি শুধু আমি,—আপনার মনে কী ঝড় চলেছে—আমি জানতাম। বড়ো মায়া হতো মাষ্টার মশাই—বুকের ভিতরটা কেমন যেন ক'রে উঠ্‌ত। এক-একবার মনে হতো—দিদির শূন্য জায়গাটা কী আমি পূরণ করতে পারি না? ডাকতাম, 'মাষ্টার মশাই—'

'উঁ?'

'কী ভাবছেন, মাষ্টার মশাই?'

হেসে বলতেন—'গরীব মানুষের অনেক-কিছুই ভাবনার থাকে, স্মৃতি। তুমি কী শুনতে চাও?'

সাগ্রহে বল্‌তাম,—'বলুন না?'

বল্‌তেন,—'একটা সংসারের ভার মাথায় চাপানো। চাকুরী খুজ্‌ছি, পাচ্ছি না। আর কী বল্‌ব বলো?'

মনে-মনে বল্‌তাম, 'আহা! এত কষ্ট ওঁর!'

মুখে বল্‌তাম,—'দিদির বিয়ে হচ্ছে, জানেন ত?'

'জানি,'—আপনি বল্‌লেন, 'খুব খুসী দেখাচ্ছে তোমাকে!'

'খুসী!'

'খুসী নয়?'—হেসে বল্‌লেন, 'দিদির হ'লেই এবার তোমার পালা, তাই না?'

লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি উঠে যেতে চাইতাম, বলতাম, 'যাঃ! ভারী দুষ্ট আপনি!'

"কিন্তু আমি জানতাম"—দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দিদি

'উঠতে গিয়ে হাতে টান পড়ত, দেখতাম, আমার হাতের মুঠি আপনার হাতের মধ্যে। বল্‌তেন,—'আরে তুমি যাচ্ছ কোথায়? একজন গেছে, তুমিও যাবে আমাকে একা ফেলে?'

'আপনার চোখে পড়ত না, কিন্তু আমি জান্‌তাম,—দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দিদি। তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিতাম। এই এক ধরণ নিয়েছে দিদি, সামনে আসবে না, কিন্তু আড়াল থেকে স-ব লক্ষ্য করতো ও।

'বিয়ে হ'য়ে গেল। কিন্তু তারপরে কী হ'লো, জানেন মাষ্টারমশাই? আপনার হঠাৎ জবাব হ'য়ে গেল। বাবা বল্‌লেন, আপনাকে আর আসতে হবে না।

আপনি বল্‌লেন, 'কিন্তু, স্মৃতি?'

'ওকে আর পড়াবো না।'

'আপনার অশ্রুকণা শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে মার কাণে কাণে বলে গেল আপনার কথা। বলে গেল, আমাকে যেন আপনার সামনে বেরুতে না দেওয়া হয়! আগুন আর বীর তুলনা দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি অশ্রুকণা, বলেছিল,—আপনার আচরণ যেন কেমন-কেমন! দিদি এতদিন চোখে-চোখে রেখেছিল, তাই কিছু ঘটেনি আপনার-আমার মধ্যে। দিদি রইল না, তাই যে-কোনো দিন যে-কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে!

আমি কী আগে জানতাম! যেদিন জান্‌তে পার্‌লাম দিদির এই অভিযোগ,—তখন অনেকটা দেরী হয়ে গেছে। আপনি আসেন না আমাদের বাড়ীতে। ছট্‌ফট্‌ ক'রে মর্‌ছি ঘরের ভিতরে। আপনার বাড়ী গিয়ে যে দেখা করব, তারও উপায় নেই। কঠোর শাসনে বাইরে একপাও বেরুনো বারণ। কিন্তু আমার যে ভয়ানক প্রয়োজন আপনার সংগে দেখা করার! দিদির এই ঘৃণ্য সন্দেহটার কথা আপনাকে জানিয়ে ওর আসল চেহারাটা আপনাকে অতি অবশ্যই দেখানো দরকার!

কী বলব, রাগে দুঃখে- ক্ষোভে সর্বশরীর যেন জ্বলছিল ক'দিন ধ'রে! এক-একবার ভাবতাম, ওর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শুনিয়ে দিয়ে আসব ওকে কড়া-কড়া কয়েকটা কথা।

শেষ পর্যন্ত এই চিঠি-খানাই চুপি চুপি লিখতে হ'লো আপনাকে, না লিখে পারলাম না।

মাষ্টারমশাই, মা-বাবা বোধ হয় ভয় পেয়ে গেলেন আমার অবস্থা দেখে। নইলে চৌদ্দবছর বয়সে মেয়েদের কেউ বিয়ে দেবার চেষ্টা করে আজকালকার দিনে? হ'লামই বা আমি বাড়ন্ত গড়নের, হ'লামই বা আমি স্বাস্থ্যবতী, হ'লামই বা গৌরী, হ'লামই বা আমি সুন্দরী?

মাষ্টারমশাই, আমার সেই বারোবছর বয়সের ফ্রক-পরা জীবনটাকেই ফিরে পেতে ইচ্ছা করে। সেই পার্কে গিয়ে দোলনায় চ'ড়ে দুঃসাহসিকার মতো নিদারুণ বেগে ওপরে-ওঠা, নীচে-নামা, আবার ওঠা, সে শিহরণের কী তুলনা হয়? দিদি আর আপনার সামনে ব'সে আছি, নিদারুণ শ্রান্তিতে ঘুম ভেঙে আসছে দুই চোখে, আপনারা-দু'জনে মুখোমুখি ব'সে আছেন ছবির মতো—আর আমি ঘুমে ঢুলে-ঢুলে পড়ছি,—সেখানেই যদি থেমে থাকত মহাকাল, খুব ভালো হ'তো মাষ্টারমশাই।'

হাতের মুঠি থেকে আল্‌গা হ'য়ে প'ড়ে গেল, বাক্স-খুঁজে-বার-করা বহু পুরাণোদিনের সেই চিঠিখানা। ঘরে, কেউ আসবার আগেই উঠে পড়ে কুড়িয়ে নিলাম। বেলা ততক্ষণে অনেক, জানালা দিয়ে রৌদ্রের ঝলক এসে পড়েছে ঘরের ভিতরে। শিয়রের কাছে দেয়াল-ঘড়ীটা টিক্‌টিক্ ক'রে বেজে চ'লেছে, বেশ জোরেই কানে এসে বাজ্‌ছে সময়ের হৃদ্‌স্পন্দন!

না, এ ক'লকাতাকে আমি চিনি না। এই নতুন-ওঠা অট্টালিকার ভীড়ে কোথায় খুঁজ্‌ব সেই সাবেকী বাড়ী, সাবেকী ঘর? কিন্তু আশ্চর্য ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে দেখা পেয়ে গেলাম কেষ্টচরণের। সেই রাস্তার মোড়ের মুদির দোকানটা আজো আছে, শুধু কালি-পড়া কেরোসিন বাতিটার বদলে ঝুল্‌ছে বৈদ্যুতিক বাতি। দাঁড়ীপাল্লার সামনে ব'সে আছে কেষ্টচরণ, মাথার চুলগুলি সব সাদা। ক্যাশবাক্সের কাছে ব'সে রতন-মুদি।

কেষ্টর দোকানে তখন তেমন ভীড় ছিল না, উঠে এসে বলল, 'মাষ্টারবাবু! আপনি?'

বললাম, 'পরিচয় দিলাম ব'লে তবেই ত চিনলে!'

একটু অপ্রতিভ হ'লো কেষ্ট, বলল, 'বুড়ো হ'লাম, চোখে তেমন দেখিনে। রতন ছাড়লো না, দুই স্যাঙাতে মিলে-মিশে দোকান চালাচ্ছি। তা' আপনাদের পাঁচজনার আশীর্ব্বাদে…'

বাধা দিয়ে বললাম, 'গঙ্গাপদবাবুদের খবর জানো?'

গম্ভীর হ'য়ে গেল কেষ্টচরণ, তারপরে নতুন-গড়া পরিসর পীচের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল। কান্নাভরা কণ্ঠে বৃদ্ধ বলল, 'সব গেছে।'

(১৭৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দার্জিলিং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল অ্যাণ্ড ওয়ার্কশপ স্কুল, দার্জিলিং : সিনিয়র সার্টিফিকেট কোর্স—মোটর মেকানিকস ইলেকট্রিসিয়ান। তিন বৎসর। ম্যাট্রিক অথবা সমপর্যায়ভুক্ত পরীক্ষা পাস অথবা জুনিয়র সার্টিফিকেটধারী। জুনিয়ার সার্টিফিকেট কোর্স—জেনারেল মেকানিকস। দুই বৎসর। কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পর্যায়ের শিক্ষা। আর্টিজান কোর্স—ব্ল্যাকস্মিথ, মেসিন শপ, কার্পেন্ট্রি। দুই বৎসর। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা।

গবর্ণমেণ্ট উইভিং স্কুল (বাঁকুড়া, মলদহ, বীরভূম) উইভিং, ডাইয়িং ও প্রিন্টিং সম্পর্কে আর্টিজান কোর্স। এক বৎসর। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা।

বেঙ্গল সেরামিক ইনষ্টিটিউট, ৭১ সুরা ফার্ষ্ট লেন, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা—অ্যাডভান্স (সুপারভাইসারি) কোর্স। দুই বৎসর। কেমিষ্ট্রি, ফিজিকস ও ম্যাথমেটিস সহ আই এস-সি পাস। জেনারেল ট্রেড অ্যাপ্রেন্টীস কোর্স দুই বৎসর। ম্যাট্রিক ফ্যাকটরি অপারেটিভ কোর্স। এক বৎসর। ম্যাট্রিক। গার্ল ষ্টুডেণ্টস কোর্স। ৬ মাস। এম-ই স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা।

উক্ত পুস্তিকায় এছাড়াও আরো অন্যান্য বিষয়ে বহু প্রয়োজনীয় খোঁজ খবরের উল্লেখ আছে। শিল্প শিক্ষা সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগ থেকেও পাওয়া যেতে পারে।

'কর্তাগিন্নী গেছেন শুনেছি, বললাম, কিন্তু মেয়েরা?'

মুখ তুলে তাকালো কেষ্টচরণ, 'বড়মেয়ে ত পুণায় জামাইয়ের কাছে। দুটি ছেলে।'

'আর ছোট মেয়ে? স্মৃতি?'

কেষ্ট একটু থেমে বলল, 'চৌদ্দবছর বয়সে সাত তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিয়ে গেল কত্তা। ঐটুকু মেয়ে স্বামীই বা বোঝে কী, সংসারই বা জানে কী?'

'কী, বলতে চাও, কী?'

কেষ্ট বলল, 'ভালো আছে মাষ্টারবাবু। একটি মেয়ে। জামাই ডাক্তারী পড়ত। পাশ ক'রে বেরুল, মা-মরা ছেলের বাপও মারা গেল তখন, জামাই ডিস্‌পেন্‌সারী খুলে না বসে এক জাহাজ-কোম্পানীতে ডাক্তার হ'য়ে জাহাজে-জাহাজে ঘুরে বেড়ায়।'

'কেন বলো ত?'

কেষ্ট বলল, 'ওদের মনের কথা কেমন ক'রে বলি বলুন? 'এই ত সেদিন দেখা ক'রে এলাম। মাঝে সাঝে জামাই আসে ছুটীতে। বাড়ী সেই নিউ আলিপুরে, যাও না মাষ্টারবাবু, একবার দেখাই ক'রে এসো না। খুব খুসী হবে স্মৃতি।'

সেদিনের সেই ঘটনাটা তাহলে ঠিক 'অলৌকিক' নয়? তা-ই বা কী ক'রে হবে? দরজার কড়া ধ'রে নাড়তেই যে-এসে দরজা খুলে দিলো, তাকে দেখে সুকঠিন বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে গেলাম। বারোবছরের ফ্রক্-পরা একেবারে ঠিক সেদিনকার স্মৃতিকণা।

দরজা খুলতে খুলতেই ও' বলছিল, 'দাঁড়ান মাষ্টারমশাই খুলছি।'

কিন্তু খুলে দিয়ে সে-ও অবাক হ'য়ে গেল। আমি শিশুপুত্রের হাত ধরে একটু এগোতেই মেয়েটী বলল অস্ফুটস্বরে, 'কা'কে চাই?'

উত্তর দেওয়া হ'লো না, নিষ্পলক তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। কণ্ঠস্বরেও কোনো তফাৎ নেই! একেবারে সেই গায়ের রঙ, সেই চোখ সেই মুখ! আমাকে অমন ক'রে তাকাতে দেখে ও-ত বিস্মিত কম হয় নি, কিন্তু পর মুহূর্তেই একটু হেসে বলে উঠল, 'ও, বুঝেছি। নীচের তলাটা ভাড়া নিচে চান। দেখতে এসেছেন, তাই না?'

কোনক্রমে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আসুন। আমি মাকে ডাকছি।'

ভিতরে প্রবেশ করলাম আমরা।

শোক-শান্তি

শ্রীনারাণ পাত্র

আকাশ-পাতাল ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই হোলো না থির,
দু' চোখ ভরিয়া নামিয়া আসিল শুধু নয়নের নীর,
কাল ছিল যাহা, আজ তাহা নাই—
কেন, এই কথা ভাবিছি সদাই,
কেন দিবারাতি ঐ কথাটাই হৃদ্‌মাঝে করে ভিড়?
বিগত দিনের ক্ষতির লাগিয়া কেন কাঁদে মন-নীড়?

কালিকে যে জন ছিল আপনার, ছিলো এ ধরণীতলে,
আজিকে সে কেন চলে গেল, মোরে ভাসায়ে চোখের জলে?
কেন তবে হায় দু'দিনের তরে
পুতুল-খেলার এই খেলাঘরে
ভালোবাসা-বাসি, মিছে কাঁদা-হাসি, দিবারাত ধরি' চলে?
কেন তার লাগি' কাঁদিয়া যে আমি ঘুরে মরি পলে পলে?

কালও সে মোর ছিল পাশে পাশে, ছিলো মোর সুখে দুখে,
ছিলো সে আমার হাসি-কান্নায়, ছিল গো জড়ায়ে বুকে।
কার আহ্বানে এত তাড়াতাড়ি
দু'জনের মাঝে হোলো ছাড়াছাড়ি,
কে এমন সেই নিঠুর দেবতা আসিল হেথায় রুখে?
যাহার পরশে ভালবাসাবাসি সবি গেল আজি চুকে?

নহে নহে তাহা, কিছুই যায়নি, আছে পড়ে হেথা সবি'
দেহ গেছে তার, আছে স্মৃতি পড়ে, তাই দিয়ে গড়ি ছবি
নব নব রূপে নানা মহিমায়;
এই ধরণীর লতায় পাতায়
তার যত আশা, হাসি ভালবাসা, আছে গো মূরতি লভি'
আছে গো আমার সকল কাজেতে, সে যে মোর প্রাণ-রবি!

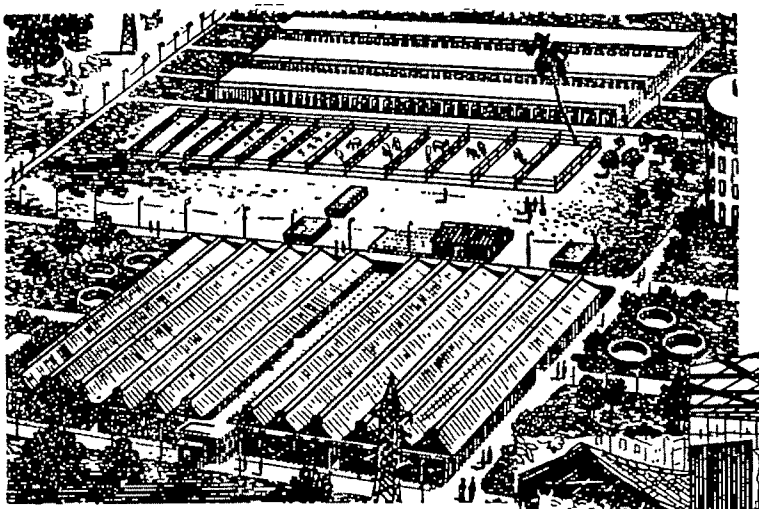

হরিণঘাটা-পরিকল্পনা

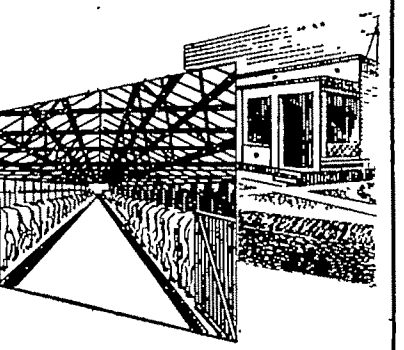

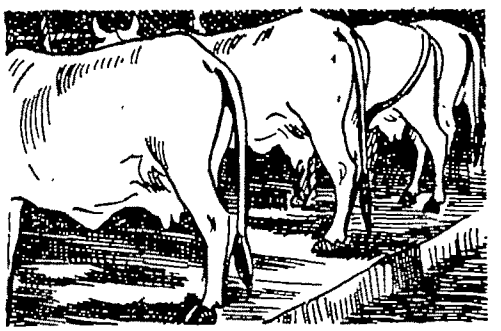

হরিণঘাটায় যে-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হ'তে চলেছে, তার বিভিন্নমুখী কার্য-কলাপই তার পূর্ণ পরিচয় দিতে পারে। হরিণঘাটায় ডেয়ারী, দুগ্ধ-উপনিবেশ, পক্ষী-পালন কেন্দ্র, গো-মহিষ প্রজনন-কেন্দ্র, গোয়ালাদের আবাস, (যার অর্থই হ'লো, ক'লকাতা থেকে খাটাল সরানো) গোশালা আর, নানা বিষয়ে গবেষণার কাজ বেশ ভালো ভাবেই এগিয়ে চলেছে। হরিণঘাটা-পরিকল্পনার সার্থক পথ ধরেই গ'ড়ে উঠবে

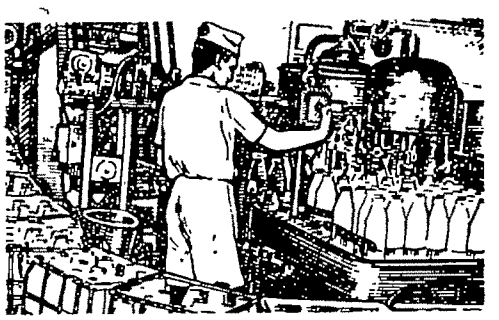

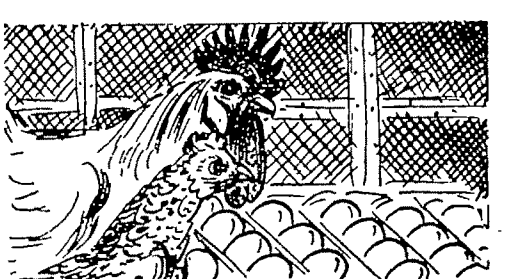

সোনার বাংলা

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক প্রচারিত

বিনামূল্যে 'শিক্ষক' পত্রিকা

শিক্ষক বন্ধুগণের সুবর্ণ সুযোগ

অর্থাভাবে বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে তাঁহাদের নিজস্ব এই শিক্ষক পত্রিকা লইতে পারেন না। নিম্নের নিয়মানুযায়ী তাঁহারা বিনামূল্যে 'শিক্ষক' পত্রিকা পাইবেন :—

১। শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের ৩ খানা বই পাঠ্য করিলে এবং এককালীন বা বিভিন্ন দফায় কমিশন বাদে ৪৲ টাকার বই লইয়া ক্যাসমেমোগুলি পাঠাইলে ৩ মাসের জন্য।

২। ৬ খানি বই পাঠ্য করিলে এবং ঐ ভাবে ৬০৲ টাকার বই কিনিলে ৬ মাসের জন্য।

৩। ৮ খানি বই পাঠ্য করিলে এবং ঐ ভাবে ৮০৲ টাকার বই কিনিলে ১ বৎসরের জন্য।

বলা বাহুল্য উক্ত সুবিধা দেওয়া হইবে বলিয়া বইয়ের কমিশনের হার কমিবে না।

শিক্ষক পাবলিশিং হাউস

৬১, বালিগঞ্জ প্লেস কলিকাতা—১৯

N. B.—অন্যত্র শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখুন।

টসের

স্পেশাল

পূজা কনসেশন

এক পাউণ্ড প্যাকেট চা ৩৷৵০

সর্ব্বত্রই পাবেন।

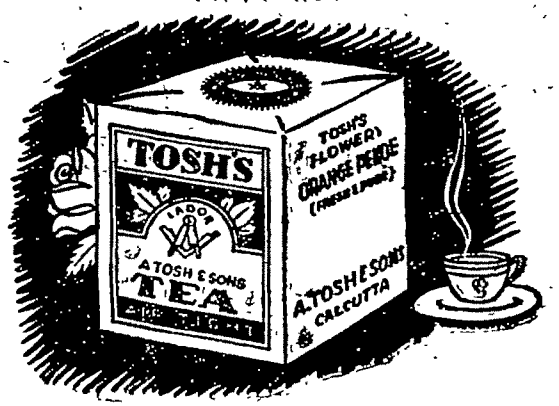

এ, টস এণ্ড সন্স

কলিকাতা-৯

শিক্ষক বন্ধুগণের প্রতি

শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের

সশ্রদ্ধ নমস্কার।

আগামী

১লা ডিসেম্বর হইতে

আমাদের পুস্তকের দোকান

১৮।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে

পূর্ব্বের ন্যায় কাজ হইতে থাকিবে।

শিক্ষকের গ্রাহকগণের প্রতি

- শিক্ষকের বৎসর শ্রাবণ হইতে আরম্ভ হয়। তবে যে কোনও মাস হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়।
- শিক্ষকের বার্ষিক মূল্য ৫।০, ষাণ্মাসিক ২৸৶, ছয় মাসের কমে কাহাকেও গ্রাহক করা হয় না। ভিঃ পিঃতে লইলে আরও ।৶০ করিয়া বেশী খরচ লাগে।
- প্রতিমাসের 'শিক্ষক' পরবর্ত্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির হয়।
- গ্রাহক নম্বর না জানাইলে কোনও অভিযোগের প্রতিকার করা সম্ভবপর নহে।
- রিপ্লাই কার্ডে পত্র না লিখিলে বা টিকিট না পাঠাইলে কোনও পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে।
- প্রদত্ত চাঁদার মেয়াদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুনরায় চাঁদা পাঠাইয়া গ্রাহক হইবেন।
- গ্রাহককাল শেষ হইবার পর চাঁদা পাঠাইলে, আমরা পরবর্ত্তী মাসের পত্রিকা V.P.তে পাঠাই V.P. ফেরৎ দিয়া আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।
- মনি অর্ডার কুপনে পুরা ঠিকানা এবং গ্রাহক নং অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। নূতন গ্রাহকগণ নূতন গ্রাহক লিখিয়া দিবেন।
- যে কোন পত্র লিখিবার সময় (বিশেষতঃ অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য লিখিত পত্রে) গ্রাহক নং অতি অবশ্য দিবেন। নতুবা কোন অভিযোগের প্রতিকার সম্ভব হইবে না।
- পত্রের জবাব পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড দিবেন।
- গল্প, প্রবন্ধ, অভিযোগ অথবা সংবাদাদি প্রেরণের সময় সম্পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলিবেন না।

কার্য্যাধ্যক্ষ শিক্ষক

৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯,

আমাদের মতো
আপনারও শ্রীবৃদ্ধি হোক্

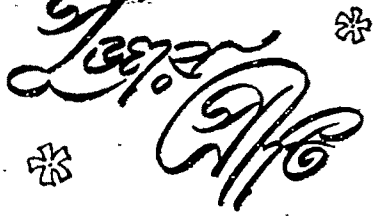

ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দি নিউ ইণ্ডিয়া
এস্যুরেন্স কোং লিঃ
৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

NI162

২ টির যেকোনো একটি

মল্লিক রোটারী ফ্রু মেশিন

সেন্ট্রাল ববিন বাট্‌কো সি.বি. মেশিন

কুটির শিল্পে "মল্লিক" ও "বাটকো" সেলাই কলের দাম বড় কম নহে!

শত শত পরিবার এই দুটি সেলাই কলের সাহায্যে উপার্জ্জন করে ও যাবতীয় নিজেদের প্রয়োজনীয় পোষাক তৈয়ারী করে ঘরের পয়সা বাঁচান। এই কলগুলি বেশ মজবুত, দামও কম এবং সহজ কিস্তিরও ভাল ব্যবস্থা আছে।

অয় মূলধনে ঘরে ঘরে কুটির শিল্পের প্রসার করুন।

মল্লিক এবং বাটকো সেলাই কল

কে. সি. মল্লিক এণ্ড সনস্ লিঃ

অফিস: ১০৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২ ফোন: ৩৩-৩৪৭৬
কারখানা: ৭৭।১৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ফোন: ২৪-১৫৫৮

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পাঠ্য

শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের পুস্তকগুলি

আগামী বৎসর নিজ নিজ বিদ্যালয়ে পাঠ্য করিয়া যুগপৎ শিক্ষার উন্নতি এবং 'শিক্ষক' পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবার ব্যবস্থা করুন।

(অন্যত্র বই এর বিজ্ঞাপন দেখুন)

স্থানীয় বিক্রয় কেন্দ্র :—পি-১৬, বেন্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ভারতের অগ্রণী

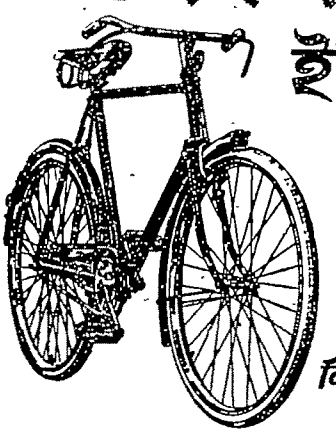

ইণ্ডিয়া সাইকেলের

নবতম অবদান

সুপার ডি-লুক্স

সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদানে

নিখুঁত ভাবে প্রস্তুত

ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, কলিকাতা-১

RUBBER FLOORING.

(Manufactured according to British Standard Specification)

Hard Wearing, Hygienic, Silent, Shock-Proof and washable. Decorative non-slip glazed floor.

Ideal for Homes and Hospitals, Hotels and Offices, Cinemas and Lecture Halls etc.

Installation by National's Own Team of experienced and efficient layers, will guarantee the best standard of laying, finish & workmanship.

NATIONAL RUBBER Mfrrs Ltd.

19, CHOWRINGHEE, CALCUTTA-13.

This is to announce that we have manufactured to British Standard Specification and have laid under expert supervision "Rubber Flooring" covering approximately 55,000 sq. ft. in I.C.I.'s magnificent "New Building".

BATHGATE'S

- **PRICKLY HEAT POWDER.**
- **A. K. LOTION.**
- **LAVENDER SCENTED AMMONIA.**

Are your Strongest defence against Prickly Heat and other skin irritations common in Summer. Their efficacy has been proved beyond doubt by wide use over the past 50 years.

BATHGATE & CO. LTD.

CALCUTTA.

PRECISION PROCESS No. 2

Forks, frames and mudguards are enamelled in a Conveyer Enamelling Plant giving perfect adhesiveness and shine.

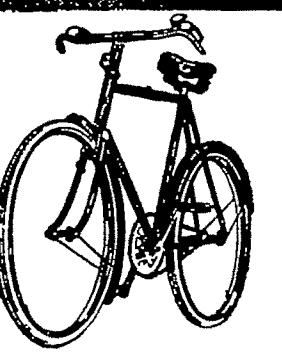

Hind Cycle

India's Own

Precision - built in India's largest and most modern cycle plant, Hind Cycles are a firm favourite with customers in search of top grade machine at a reasonable price.

HIND CYCLES LTD., 250 WORLI, BOMBAY 18.

জীবে প্রেম করে যেইজন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর

ভারতের শাশ্বত বাণীর মূর্ত প্রতীক 'স্বামী বিবেকানন্দ' —এক যুগসন্ধিক্ষণে হল তাঁর মহাআবির্ভাব। শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দুঃখ বেদনায় সমগ্র জাতি ম্রিয়মাণ, নিরাশার ঘন অন্ধকারে পথ তার অবলুপ্ত। সেই সঙ্কট মুহূর্তে এগিয়ে এলেন সন্ন্যাসী-বীর দুর্গত মানবের মুক্তি কামনায়; নিজেকে বিলিয়ে দিলেন রিক্ত, আর্ত, বুভুক্ষ নরনারীর সেবায়। যে অমর মন্ত্রে তিনি মুমূর্ষু জাতিকে সঞ্জীবিত করেছিলেন, সেবা আর প্রেমই তার মর্মকথা।

'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'। জন সেবার বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রে আমরা বেছে নিয়েছি রুগ্ন, আর্ত মানবের চিকিৎসার কাজটি। গত ৬০ বৎসর যাবৎ আমাদের সুচিকিৎসায় হাজার হাজার কুষ্ঠ, ধবল ও চর্মরোগে আক্রান্ত রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হ'য়ে সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন করছে।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

প্রতিষ্ঠাতা ঃ পণ্ডিত রামপ্র

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন ঃ হা

শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯ (পূরবী সিনে

A.D.C

বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড় চাই

যেহেতু ইহা

টেক্‌সই, দামে সস্তা

মোটা মিহি সব রকম

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ

শ্রী রা ম পু র

হেড অফিস ঃ—৭নং চৌরঙ্গী রোড,
কলিকাতা।

শারদোৎসবের শুভলগ্নে দেশবাসীকে জানাই, আমাদের অভিনন্দন, কামনা করি তাঁদের সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা।

আর্য্যস্থানে জীবন বীমা স্বল্প ব্যয়ে নিরাপত্তার প্রতীক।

বর্তমান প্রিমিয়ম হার পূর্বাপেক্ষা কম।

বর্তমান বোনাস
বছরে প্রতি হাজারে ৮৲

১৯৫৪ এর ভ্যালুয়েশেন আরও সুফল আশা করা যায়।

আর্য্যস্থান

ইনসিওরেন্স কোঃ লিঃ

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং

১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল,

SPOTLIGHT
ON OUR PROGRESS DURI
1953

Interest Income	...	Rs. 47,821 -
Premium Income	...	Rs. 4,05,514-1
Life Assurance Funds	...	Rs. 13,96 798 -9
Total Assets	...	Rs. 14,74,357 -

Total Claims Paid Rs. 2,66,568-4-5.

The above achievements have not be equalled by any Departmental Lif Assurance Society so far.

Premium Rates
L O W E S T Mortally Experien Expense Ratio.

Please apply for interesting particulars

Police Co-operative Life Insuran Society Ltd.
4, SAKLAT PLACE, CALCUTTA-1

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে
=বিজয়-বৈজয়ন্তীবাহী=

মোহিনী মিলস লিমিটে

(স্থাপিত—১৯০৮)

১নং মিল

কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা),

২নং মিল

বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা)

ম্যানেজিং এজেন্ট

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

২২ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

'প্যালুড্রিন'

ম্যালেরিয়া দূর করে

নিশ্চিতভাবে—নিরাপদে—নামমাত্র ব্যয়ে

ম্যালেরিয়ার লক্ষণ :

প্রথমে শীত করে ও কম্প দিয়ে জ্বর আসে ; তারপর ঘাম দেয় ও সর্বাঙ্গে ব্যথা বোধ হয়। এই লক্ষণগুলি দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

'প্যালুড্রিন' সব সময় আহারের পর খাবেন এবং 'প্যালুড্রিন'-এর সঙ্গে গ্লাস ভরতি জল খাবেন।

পূর্ণবয়স্ক ও ১২ বছরের বড় ছেলেমেয়েদের : এক বড়ি (0.3 Gm.)
৬ থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের : আধ বড়ি
৬ বছরের ছোট শিশুদের : সিকি বড়ি
যে পর্যন্ত না জ্বর বন্ধ হয় প্রত্যহ এই মাত্রায় খেতে হবে।

ICI

ICP 289

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
প্রস্তুত ম্যানুফ্যাকচারিং অলঙ্কার নির্ম্মাতা ও হীরক ব্যবসায়ী
১৬৭ জি, ১৬৭ সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
টেলিফোন:- ৩৪- ১৭৬১ গ্রাম ব্রিলিয়ান্টন,
২০০/২/জি, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-ফোন-লিকে: ৪৪১৬,
পুরাতন ঠিকানার বিপরীত দিকে
ব্রাঞ্চ- বালিগঞ্জ

ORIENT LONGMANS publish text-books in fifteen sian languages as well as English, and span the entire ducational field from Primary School to University.

We are also the agents for 14 other major publishers, uding the well-known English & American houses of ngmans, Green. We represent UNESCO in India. eir publications for teachers, such as THE TEACHING OF HANDWRITING,—of READING & of NATURAL SCIENCE are based on world-wide surveys of each subject. Books of special importance are COMPULSORY DUCATION IN INDIA, THE USE OF VERNACULAR LANGUAGES IN EDUCATION AND TRAINING OF URAL SCHOOL TEACHERS.

We have just published :

TEACHING ENGLISH—A quarterly devoted to the teaching of the English language in India. India & her eighbours Series—INDIA & BURMA, INDIA & CEYLON, and INDIA & MALAYA. The aim of this ies is to present a concise account of recent develop- nts in the political, economic and cultural relations veen India & her neighbouring countries.

Teachers, Librarians and students are always welcome our Showroom at 17, Chittaranjan Avenue, Calcutta.

ORIENT LONGMANS

17, Chittaranjan Avenue, Calcutta.

কোলে বিস্কুট কোম্পানি